নীলাঞ্জনের খাতা

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৬৬
ফেব্রুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক—শ্রী শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রক—শ্রী গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা-১৩

প্রচ্ছদ
শ্রী নিতাই মল্লিক

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

বুদ্ধদেব বসু

নীলাঞ্জনের খাতা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

'গল্পভারতী'র ১৯৫৬ সালের শারদীয় সংখ্যায় এই উপন্যাসের প্রথম খশড়া প্রকাশিত হয়েছিলো। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে পুরো বইটি নতুন ক'রে লিখেছি।

ডিসেম্বর
১৯৫৯

বু. ব.

ভূমিকা

নন্দিনীতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হ'লো। জায়গাও নতুন; কলকাতার ভিড় কমাবার জন্য সরকারি চেষ্টায় তৈরি। রাস্তা আছে, জলের কল, ইলেকট্রিসিটি, দুটো স্কুল, কয়েকটা সরকারি আপিশ; কিন্তু বসতি এখনো ক্ষীণ। এবার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জ'মে ওঠে। কলকাতার খুব কাছে না হোক দূরেও নয়; শেয়ালদা থেকে ট্রেনে দেড় ঘণ্টা।

আশে-পাশে, রেল-লাইনের দু-পাশে, অনেক মাইল জুড়ে রেফিউজীদের কলোনি। ও-সব উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের সুযোগ দেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা থেকে, চুঁচড়ো থেকে, এমনকি কেষ্টনগর থেকেও কেউ আসতে চায় তো আসতে পারে।

ভরতি হ'তে ছাত্রছাত্রী আসছে। বিদ্যার জন্য ব্যাকুল নয় সকলে, জ্ঞানের বাসনায় দপদপ ক'রে জ্বলছে না। আর-কিছু করবার নেই, তাই পড়া। ছেলেদের চাকরি নেই, মেয়েদের বয়স হ'য়ে যায় বিয়ে হয় না, কিংবা বিয়ে হ'লেও রোজগার করতে হয়। সেইজন্যেই পড়া। কিংবা সময় কাটাবার জন্য, যে-কোনো উপায়ে সময় কাটাবার জন্য, 'কিছু করছি'—নিজেকে ও অন্যকে এ-কথা বলতে পারার জন্য।

বাংলা সাহিত্যে এম. এ. নেবার জন্য যারা আবেদন করেছে, আজ তাদের ইণ্টার্ভিয়্ নিচ্ছেন নীলাঞ্জন দে। নীলাঞ্জন বাংলার অধ্যাপক নন, পেশাদার অধ্যাপকও নন। জীবন ভ'রে নানা রকম কাজ তিনি করেছেন। তাঁর নিজের বিষয় ইতিহাস, প্রথম জীবনে অধ্যাপনাও করেছেন, ইংরেজিতে ও বাংলায় খান দু-চার বইও লিখেছেন যা খুব কম লোকই পড়েছে, কিন্তু যার সুখ্যাতি এখনো কেউ-কেউ ক'রে থাকেন। কিছুদিন ছিলেন সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে, স্বাধীনতার পর নয়াদিল্লির প্রচার-দপ্তরে, রেডিওতে, দু-বার আমেরিকায় ঘুরে ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন, দু-বছর

কাটিয়েছেন প্যারিসের য়ুনেস্কোতে। এক জায়গায় বেশিদিন টিকে থাকেন না, এক কাজ বেশিদিন ভালো লাগে না; অনেক বিষয়ই জানেন কিন্তু কোনোটাতেই ঠিক বিশেষজ্ঞ নন: তাঁর যোগ্যতা ও ব্যর্থতা বিষয়ে এটাই হ'লো প্রধান কথা।

বাংলার অধ্যাপক এখনো এসে পৌঁছননি; তাই নীলাঞ্জনকেই এই ইন্টার্ভিয়ু নিতে হচ্ছে।

আগত ও আসন্ন ছাত্রছাত্রীরা তাঁর বিষয়ে কিছু খবর ইতিমধ্যেই জেনে গেছে। অবিবাহিত, বয়স যদিও অন্তত পঞ্চাশ। খুব গম্ভীর, দেখে মনে হয় কড়া পাকের মানুষ। ছিপছিপে চেহারা, ধূসর চুল, পাৎলা মুখে সরু ফ্রেমের সোনার চশমায় কেমন-একটা ভয় জাগিয়ে দেয়; যেন এক দুর্ভেদ্য দূরত্ব আছে মানুষটাকে ঘিরে। ঠোঁটের হাসি রমণীয়, নিচু গলায় নরম ক'রে কথা বলেন, কিন্তু হৃদ্যতার এমন কোনো বিস্তার নেই যাতে সত্যি কাছে এগোনো যায়; যে-কোনো মুহূর্তে এমন বিচ্ছিন্ন হ'তে পারেন যেন আশে-পাশের কিছুতেই তাঁর এসে যায় না।

সেদিন, জুলাই মাসের সেই সোমবারে, তখনো তৈরি-হ'তে-থাকা বিদ্যা-ভবনের একতলার একটি কোণের ঘরে ব'সে, নীলাঞ্জন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বাংলা বিভাগে একজন মাত্র অধ্যাপক যোগ দিয়েছেন: পরেশ গাঙ্গুলি, সদ্য পাশ ক'রে এই প্রথম চাকরি নিলেন। তিনি পাশে ব'সে জিগেস করলেন, 'অ্যাপ্লিকেশনগুলো আর-একবার দেখবেন নাকি, স্যর?'

'দেখেছি।'

'উনসত্তর অ্যাপ্লিকেশন পড়েছিলো, তা থেকে মাত্র তিরিশ জনকে ডাকলেন?'

'উপায় কী। এঁরা বলছেন পনেরো জনের বেশি নেবেন না।'

'আর এই তিরিশের মধ্যে তেইশ জনই মেয়ে।'

'উনসত্তরের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা ছিলো পঞ্চান্ন। কেন মেয়েরা এত বাংলা পড়েন বলুন তো?'

'ভাবে, এটাই সবচেয়ে সহজ।'

'সত্যি তা-ই ?'

পরেশ কিছুটা গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিলেন, 'পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলায় একটা ফার্স্ট ক্লাশ হয়নি কলকাতায়। তা এই তিরিশ থেকে পনেরো বাছতে হবে ?'

'পনেরো। যাঁদের বয়স বেশি, টিচারি করছেন, তাঁদের প্রথমে নিতে হবে।'

'আর অন্যেরা ? যা দেখছি উনিশ-বিশের তফাৎ। তেমন ভালো কেউই নেই।'

'কথা বললেই বোঝা যাবে। তাহ'লে ডাকা যাক। অনেকক্ষণ ব'সে আছেন এঁরা।'

'হ্যাঁ। আর কত দূর-দূর থেকে ! শ্রীরামপুর, সাঁৎরাগাছি, বাটানগর—'

নীলাঞ্জন সিগারেট ধরিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন। অ্যাপ্লিকেশনের ফাইলে চোখ ফেলে বললেন, 'মানিক ভট্টাচার্য।'

দেড় ঘণ্টার মধ্যে অ্যাশট্রেতে ছাই জ'মে উঠলো। বাইশটি তরুণী এবং মহিলা থেকে দশজনকে আপাতত বাছা হ'লো।

তেইশ নম্বর আবেদনকারিণীর নাম তাপসী দত্ত।

ছিপছিপে একটি ভদ্রমহিলা ঘরে এলেন। হাঁটার ধরন দেখে মনে হ'তে পারে তরুণী, কিন্তু মুখের দিকে তাকালে বয়স বোঝা যায়। ফাইল থেকে চোখ তুলে নীলাঞ্জন বললেন, 'বসুন। আপনি বি. এ. পাশ করেছিলেন উনিশ শো চৌত্রিশে ?'

'উনিশ শো চৌত্রিশে।' খুব ক্ষীণস্বরে জবাব দিলেন মহিলাটি, যেন কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

'ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ?'

মহিলাটি মাথা নাড়লেন।

'তারপর এতদিন ধ'রে কী করলেন ?'

'অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে লিখে দিয়েছি সব।'

ফাইলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে পরেশ বললেন, 'ইনি টিচার। এখনো টিচারি করছেন।'

'তা বুঝেছি। কিন্তু এতদিন পরে—' মহিলাটির মুখে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন নীলাঞ্জন। পাশে ব'সে পরেশ দেখলেন, অধ্যাপকের পাৎলা এবং স্বভাবত একটু ফ্যাকাশে মুখে মুহূর্তের জন্য টকটকে তাজা রক্ত ছড়িয়ে পড়লো, তারপর আগের চেয়েও বেশি ফ্যাকাশে দেখালো তাঁর মুখ। ফুরিয়ে-আসা সিগারেট থেকে নতুন একটি ধরিয়ে নিয়ে নীলাঞ্জন বললেন, 'আপনার নাম—তাপসী দত্ত?'

বাহুল্যবোধে এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন না মহিলা।

এর পরে নীলাঞ্জন অ্যাপ্লিকেশনের অন্যান্য অংশ মন দিয়ে পড়লেন। বাপের নাম, জন্মস্থান, আদি নিবাস, বর্তমান ঠিকানা। শেষেরটা নৈহাটিতে, নেতাজীনগর, তার মানে রেফিউজী-কলোনি। ওখানকারই মেয়ে-স্কুলের টিচার। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে ছোট্ট নিশ্বাস বেরিয়ে এলো।

মুখ তুলে, একটু দেরি ক'রে বললেন, 'তুমি—ভালো আছো?'

'ভালো আছি।'

'এম. এ. পাশ ক'রে কী হবে?'

'হেডমিস্ট্রেস হ'তে পারবো,' মহিলাটির মলিন ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ফুটলো।

'স্কুল থেকে ছুটি দেবে?'

'স্কুল সকালে। চাকরিতে বাধা হবে না।'

'আচ্ছা। ঠিক আছে।'

'তাহ'লে চলি?' তাপসী উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করলেন। 'কবে জানতে পারবো?'

'কাল। আপিশেই নোটিস দেবে। আর আমার সঙ্গেও একবার দেখা কোরো। আমি তিনটে নাগাদ থাকবো। এই করিডরের শেষ ঘরটায়।'

তাপসী চ'লে যাবার পর পরেশ জিগেস করলেন, 'আপনার আত্মীয়া, স্যর?'

উত্তরে নীলাঞ্জন মাথা নাড়লেন। 'এর পর কে ?'

'অবিনাশকুমার মণ্ডল।'

'কিন্তু আমি আর থাকতে পারছি না। একটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কলকাতায়। বাকি ক-জনকে আপনি যদি—'

'নিশ্চয়ই। এ আর বেশি কথা কী। আমি বেছে নিতে পারবো।'

'থ্যাঙ্কিউ। আমি চলি।'

'এই ইনি—তাপসী দত্ত—এঁকে ভরতি করা হবে তো ?'

'হ্যাঁ। কাল এসে দেখবো সব।'

নীলাঞ্জন বেরিয়ে এলেন; কলকাতার দিকে ছুটলো তাঁর ছোট্ট সিট্রোঞে।

রেল-লাইন, ধানখেত, কারখানা, মাঝে-মাঝে উদ্বাস্তু-পল্লী, ছোটো শহরের সিনেমায় বাসি ফিল্মের বিজ্ঞাপন : দৃশ্যটা নীলাঞ্জনের এখনো ঠিক চেনা হ'য়ে যায়নি। তিন মাস আগেও প্যারিসে ছিলেন, দু-মাস আগেও য়োরোপে। কলকাতায় এসেছিলেন থাকতে নয়, দেশে ফেরার জন্যেও নয়, ভ্রমণের পথে কয়েকটা দিন বিশ্রামের আশায়। নিমন্ত্রণ ছিলো অগস্ট মাসে উপ্সালায় যাবার, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক এক সম্মেলনে। ইতিমধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রস্তাব এলো। হঠাৎ রাজি হ'য়ে গেলেন দু-বছরের জন্য কাজ করতে। তার কারণ এতকাল পরে আবার মাষ্টারি করার ইচ্ছে নয়, দেশের প্রতি মমতা নয়, দেহ-মনের কোনো রকম ক্লান্তিও নয়। সত্যি বলতে স্পষ্ট কোনো কারণ নেই তার। কোনো কাজ করা বা না-করা : কোনো পক্ষেই কোনো যুক্তি নেই, কিংবা দু-পক্ষেই সমান যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। কথাটা হচ্ছে, যতদিন বেঁচে আছি, কিছু করতেই হবে; যেমন ছেলেমেয়েরা সময় কাটাবার জন্য পড়তে আসে, তেমনি আমরাও কিছু-না-কিছু কাজের ভার নিই। আর, নেবার পরে, যে-কোনো কাজই হোক না, তাতেই উৎসাহ জাগে, স্বাদ পাওয়া যায়, এমনও একটা মোহ জন্মায় যে এই কাজ ক'রে সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু দান করছি আমরা।

—কিন্তু কী আশ্চর্য, এতদিন পরে তাপসীর সঙ্গে দেখা!

নীলাঞ্জন হঠাৎ লক্ষ করলেন যে এই কথাটা তিনি মনে-মনে বললেন ফরাশি ভাষায়। কথাটাকে, ভাবনাটাকে, আস্তে-আস্তে বাংলায় তর্জমা ক'রে নিলেন। তিরিশ বছর আগে, যখন তাপসীর সঙ্গে দেখা, তার সঙ্গে এক বাড়িতে আছি, তখন আমি ফরাশি জানতুম না, কোনো দেশ দেখিনি, আমি তখন ছেলেমানুষ। আর তাপসী, বয়সে যদিও কিছু ছোটো, আমার চেয়ে জ্ঞান তার বেশি ছিলো, বুদ্ধি বেশি ছিলো, বোধ বেশি ছিলো। অনেক শিখিয়েছিলো সে আমাকে, তার মতো বন্ধু কেউ আমার ছিলো না তখন।

শ্রাবণের আকাশে শাদা আর ছাইরঙের মেঘ ছড়ানো, মাঝে-মাঝে [illegible] জ্ব'লে উঠছে রোদ্দুরে, আবার ছায়া নামে দিগন্তে, স'রে-স'রে যায় ধানখেতের উপর দিয়ে—যেন আকাশে কোনো বিশাল পাখি উড়ে চলেছে। হঠাৎ কয়েক মিনিটের জন্য ছোট্ট বৃষ্টি নামলো, ঠাণ্ডার আমেজ দিলো হাওয়ায়, আকাশে ঘন হ'লো মেঘ, কিন্তু দেখতে-দেখতে কোথায় সব মিলিয়ে গিয়ে জ্ব'লে উঠলো কঠিন আর ঝকঝকে হাসির মতো দুপুর। সব যেন অন্য কোনো দিনের মতো।

—হঠাৎ দেখে চিনতে পারিনি।

কলকাতা, বাংলাদেশ, আমার বাংলা, সোনার বাংলা। সোনার নয় তা তো দেখতে পাচ্ছি, আর কোন অর্থে আমার? যাদের মধ্যে জন্মেছিলাম তারা কেউ নেই, সে-দেশ নেই, পূর্ববঙ্গ নেই। প্যারিস, ফ্র্যাঙ্কফর্ট, মিলান বা লস এঞ্জেলস-এর এয়ার-পোর্টে নামতে যে-রকম, দমদমেও তাই। সবই বিদেশ, সবই স্বদেশ। একটা বাসস্থান চাই, বাংলায় যাকে বলে মাথা-গোঁজার জায়গা: এই তো? জীবন তো সব মনের মধ্যে চলতে থাকে; কোথায় ঘুমুচ্ছি, কী খাচ্ছি, তাতে কী এসে যায়? আমার মুশকিল হয়েছে আমার কোনো আসক্তি নেই, কাউকে ভালোবাসি না। অথচ তখন ভাবতাম মানুষ যে-কোনোভাবেই বাঁচতে পারে, শুধু ভালো না-বেসে বাঁচতে পারে না।

মস্ত সেই জামগাছটা বাড়ির আঙিনায়, গ্রীষ্মের সকালে ছায়া, পাখির

ঠোকরানো হাজার কালোজাম। মানুষ সবচেয়ে [illegible] জীব এই কারণে যে সে কিছু ভোলে না। শুধু মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক থাকে : যেমন 'তাপসী দত্ত' নামটা দেখে কিছুই মনে হয়নি আমার, কিংবা লক্ষই করিনি ভালো ক'রে, আর তাছাড়া কত হাজার তাপসী আছে বাংলাদেশে। যেদিন তাকে প্রথম দেখেছিলাম সেদিন শীত ছিলো। মা-র গোলাপ দেখতে গিয়েছিলাম তার পিছন-পিছন। সেই প্রথম দেখায় আমার হিংসে হয়েছিলো, মিলির জন্য হিংসে হয়েছিলো। আমার মা-র কাছে অমন অন্তরঙ্গ মিলি ছাড়া আর কোনো মেয়ে হবে কেন?

মিলি। তাপসী। বাড়ির সবাই তপু ব'লে ডাকে, আমি তাপসী ছাড়া কিছু ডাকিনি, ভাবিনি। মিলি ডাকতো তপুদি। বয়সে মাত্র বছরখানেকের বড়ো, হাবেভাবে অনেক বেশি। মিলির সঙ্গে তার বন্ধুতা হ'লো না, মিলিকে সে দেখামাত্র স্নেহ করলে।

কাঁচড়াপাড়ার ঘুণ্টি-ঘরের সামনে থামতে হ'লো, নীলাঞ্জন লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরালেন। একটায় গ্র্যাণ্ড হোটেলে লাঞ্চ, চেনা এক মার্কিন কবির নিমন্ত্রণ। বাদ দেয়া যায়? কিন্তু বাদ দেবো কেন? হয়েছে কী, যার জন্য অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট ভাঙতে হবে। আজ তিরিশ বছর পরে তাপসীকে আমি দেখলাম, তাতে পৃথিবীর কী এসে যায়? ঐ যে ট্রেনটাতে লোকেরা চলেছে, আমার অস্তিত্বসুদ্ধ জানে না তারা। আর সেটুকুই শান্তি এই জীবনে। যাক, খুলেছে গেট।

তিরিশ বছর? ঠিক কোন বছর খেলা ভাঙলো বলো তো? তার পরেই অক্সফোর্ডে পড়তে এলাম—না? হ্যাঁ, তা-ই হবে। কিন্তু এটা কেমন ক'রে হ'লো যে ফিরে এসে তাপসীর আর খোঁজ করিনি? প্রথম চাকরি এলাহাবাদে, তারপর অল্পদিন কলকাতায়, আর তারপর···। বাজে কথা রাখো, খোঁজ নিতে চাওনি তুমি, ভুলতে পারোনি মিলিকে।

আশ্চর্য মেয়ে। কোথায় মিলিয়ে গেলো নিঃশব্দে, কোনো চিহ্ন রাখলো না; গভীর জলে ডুবে গেলো যেন, তারপর আজ লতা-পাতা শ্যাওলা সুদ্ধ

ভেসে উঠেছে। 'হেডমিস্ট্রেস হ'তে পারবো'—হাসিতে সেই গভীর জলের ঝাপসা গন্ধ।

কোনো চিহ্ন আমিও রাখিনি। না ফোটো, না চিঠি, না এক টুকরো হাতের লেখা। তাপসী আমাকে চিঠিও লেখেনি কখনো, দরকার হয়নি, এক বাড়িতে থেকে চিঠি-লেখালেখির মতো খেয়াল তার ছিলো না। বরং মিলি···চাকরের হাতে ছোটো-ছোটো চিঠি কত এসেছে। আর যখন হুতোমগঞ্জ থেকে গিরিজাবাবু বদলি হলেন—চিঠি, ছবি, ছড়া, পুষ্ট খামগুলো হাতে নিতেও ভালো লাগতো—আর তার গায়ের সভোষ সুগন্ধি সেই কাগজ।

ছেলেবেলা, ছেলেখেলা।

পুরোনো একটা পুকুর ছিলো বাড়ির পিছনে, শ্যাওলা-পড়া পুরোনো ঘাটলা নেমে গেছে, পাড়ে ঝুঁকে রয়েছে গাছ, জলে খ'সে পড়ে পচা পাতা, সংসার করে পাতিহাঁস। পুকুর, বন, ঝোপঝাড়, ফাঁকে-ফাঁকে মনোমতো এক-একটি জায়গা, হঠাৎ মিলি। ওর চিঠিগুলো কবে হারিয়ে গেলো মনে নেই।

ঘরে নতুন লোক দেখে চ'লে যাচ্ছিলাম, মা ডাকলেন—'আয়। ও আমাদের তপু।' কী সূত্রে 'আমাদের' তা বোঝার জন্য মা-র মুখে তাকালাম, কিন্তু তিনি বললেন, 'আজ একটা মস্ত গোলাপ ফুটেছে, দেখবি চল।' আমি ভাবিনি এই আহ্বানের আমিও অন্তর্গত, কিন্তু তাপসী উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি, যদিও বাগানের বাতিক আমার নেই, সঙ্গে এলাম। ফুল দেখতে-দেখতে তাপসীর সঙ্গে মা যে-সব কথা বললেন তাতে আমার বুঝতে দেরি হ'লো না যে এই মেয়ে এ-বাড়িতে বেড়াতে আসেনি, থাকতে এসেছে।

আজ। আবার দেখা হওয়াটা আশ্চর্য। কিন্তু এতেই বোঝা যায় প্রগতি ব'লে কিছু নেই, সব ফিরে-ফিরে আসে, অতীতকে আমরা কিছুতেই ছাড়াতে পারি না।

কত বয়স হ'লো? তা, তিরিশ···কী কাণ্ড, তিরিশ কেমন ক'রে হয়, আমার চেয়ে বেশি তো ছোটো ছিলো না। মানে···সাতচল্লিশ···সে কী! সাতচল্লিশ বয়স হয়েছে তাপসীর? তাপসীর! সাতচল্লিশ!

নিজেকে এত অবাক হ'তে দেখে নীলাঞ্জন অবাক হলেন। এও সেই মায়ার একটা প্রমাণ, যা আমাদের বেঁচে থাকার শক্তি দেয়, অনবরত বেঁচে থাকার, আশা করার, ইচ্ছে করার শক্তি দেয়। নিজেকে আমরা অন্যের চোখে দেখতে পাই না; তাই সমবয়সী কারো সঙ্গে কুড়ি বছর পরে দেখা হ'লে তার চেহারায় বার্ধক্য দেখে পীড়িত হই। আমিও বুড়ো হয়েছি, কিন্তু নিজে সেটা জানি না। জানি না, তার কারণ আমার মধ্যে ষোলো বছর, আঠারো বছর, পঁচিশ বছরের আমি সব সময় বাসা বেঁধে আছে। যেমন নিজের বিষয়ে সব সময় ভুল হয়, তেমনি তাপসীর বিষয়েও ভুল হ'লো আমার: তার যৌবনকালে দেখেছিলাম তাকে, তাকে যুবতী ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারি না।

—কিন্তু কেন? যে-সর্বজয়ী মায়ার মধ্যে আমরা বাস করছি, তার বিশেষ, এবং অদ্ভুত, একটা ব্যঞ্জনা কি নয় এটা? অন্য কেউ হ'লে স্পষ্ট বুড়ো দেখতাম, কিন্তু ওর বিষয়ে মনে হ'লো বুঝি এখনো তিরিশ পেরোয়নি। তার মানে, আমি ওকে নিজের সঙ্গে এক ক'রে দেখছি।

নীলাঞ্জন, ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে, মনটাকে ভাবনা থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। চাইলেন, মুহূর্তের জন্য, শূন্য হ'য়ে যেতে, নিস্পন্দ, যেমন হয় তিরিশ হাজার ফুট উঁচু আকাশে আধো ঘুমের এরোপ্লেনের রাত্রে। দমদমের এয়ার-পোর্ট পার হলেন, ঘুরে-ঘুরে নামছে বড়ো একটা বিদেশী প্লেন। দূরের টান, অজানার সন্ধান, নতুনের তৃষ্ণা। যে-কোনো সময় এরোপ্লেন দেখলে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে আমার মন। ঐ অপরিসর যানের মধ্যে কাটানো ঘণ্টাগুলি, বই, কফি, তন্দ্রা, আর সসাগরা বসুন্ধরাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে চলার অনুভূতি: ঐ বোধহয় সবচেয়ে সুখের সময় আমার জীবনের। কোনো নতুন শহরে, নতুন দেশে পৌঁচচ্ছি, এই বোধটাই আশ্চর্য, পৌঁছলে পরে

নতুন কিছু নেই। পথ আর ভ্রমণের গতি : সেটাই সব। আসল কথা, কোথাও কোনো শিকড় নেই আমার ; ভেসে-ভেসেই জীবন কেটে যাবে।

সে যখন প্রথম ঘরে এলো, সেই এক মিনিট বা দু-মিনিট সময় যতক্ষণ তাকে তাপসী ব'লে চিনিনি, কেমন দেখেছিলাম তাকে ? একজন বিশুষ্ক প্রৌঢ়াকে দেখেছিলাম কি ? কী জানি। হয়তো দেখিনি তাকে, তাকাইনি তার দিকে। কাজের একটা অংশ ছিলো সে ; আর-কিছু না। কিন্তু চিনতে পারা মাত্র সেই তাপসীকেই দেখতে পেলাম।

অথচ নিশ্চয়ই অনেক বদল হয়েছে তার। আমরা চোখ দিয়ে দেখি না, মন দিয়ে দেখি।

মা কেমন ক'রে মারা গেলেন আমাকে মুক্তি দেবার জন্য ! এলাহাবাদে আমার কাছেই ছিলেন তখন। অক্সফোর্ড থেকে ফিরে বললাম, 'মা, আমি বিলেতে বিয়ে করেছি।' শুনে বললেন, 'বৌ কোথায় ?' 'পরে আসবে।' মাসের পর মাস কাটে, বৌ আসে না, কয়েকবার জিগেস ক'রে মা-ও শেষে চুপ ক'রে গেলেন। অবশেষে হঠাৎ একদিন বললেন, 'আমাকে মিথ্যে বলার দরকার ছিলো না, নীলু ; তুই কি ভাবিস আমি তোকে বিয়ে করার জন্য অস্থির ক'রে তুলতাম ?'

লজ্জা পেয়েছিলাম সেদিন, জবাব দিতে পারিনি।

একটু পরে মা আবার বললেন, 'তোকে একটা কথা বলি, নীলু। শুনলাম, তপু নেত্রকোনায় মাষ্টারি করছে। যদি কখনো তোর ইচ্ছে হয়, ওর একটা খবর নিস।'

আমি ফেরার পর তাপসীর নাম এই প্রথম শুনলাম মা-র মুখে। আর এই শেষ। কয়েক মাস পরে হঠাৎ কলেরা হ'লো তাঁর। জাহ্নবী গ্রহণ করলেন তাঁকে, আর আমাকে ডাক দিলো পৃথিবী।

ফিরে এসে আমিও জিগেস করিনি তার কথা। তাপসী, মিলি : দুটো নামই অনুচ্চার্য হ'য়ে গিয়েছিলো। তারপর কত বছর কাটলো। মা-র কথা

আমি রাখিনি, তাপসীর খোঁজ নিতে চেষ্টা করিনি, বছরের পর বছর ভুলে থেকেছি তাকে। কিন্তু আজ সে আমাকে পিছন থেকে ধ'রে ফললো।

*　　　*　　　*

মার্কিন কবির সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে তিনটে বেজে গেলো। পুরোনো বালিগঞ্জে একতলায় দু-খানা ঘর পেয়েছেন, ফ্ল্যাটের সঙ্গেই মামুলি কিছু আসবাব। নিজের সম্পত্তি ব'লে বেশি কিছু নেই। দরকারি কাপড়, বাছা-বাছা বই, বহু-লেবেল-মারা অপেক্ষমাণ কয়েকটা স্যুটকেস, তার মধ্যে একটাতে কিছু কাগজপত্র। নীলাঞ্জন ঘরে এসে প্রথমেই সেই স্যুটকেসটা খুললেন। একটা খাতা, মসৃণ চামড়ায় বাঁধানো, মলাটে রঙিন ছবিতে বোকাচ্চোর গল্পের এক দৃশ্য। ঐ ছবির জন্যই খাতাটা কিনেছিলেন জেনোয়ায়, প্যারিসে এসে হঠাৎ সেটাতে লিখতে শুরু করেছিলেন। শীত তখন, বেগে বরফ পড়ছে, কয়েক রাত পর-পর লিখেছিলেন। কেন লিখেছিলেন, কেন হঠাৎ থেমেছিলেন, কেমন ক'রে এত ঘোরাঘুরির মধ্যেও এই খাতাটাকে হারাননি, এ-সব প্রশ্ন নীলাঞ্জন নিজেকে কখনো জিগেস করেননি। হয়তো খাতাটার উৎকৃষ্ট কাগজের উপর কুচকুচে কালো কালিতে কিছু অক্ষর আঁকার সুখের জন্য, হয়তো নেহাৎ শীতের জড়তা কাটাবার জন্য, কিংবা হয়তো কোনো স্মৃতি, কোনো ভার, কোনো অপরাধ থেকে মুক্তি পাবার জন্য। লিখেছিলেন, তাও আজ অনেক বছর হ'য়ে গেলো, কিন্তু আর খোলেননি খাতাটা, আর পড়েননি।

কোট ছেড়ে, জুতো ছেড়ে, রোদ ঠেকাবার জন্য জানলায় পরদা টেনে, নীলাঞ্জন সোফায় ব'সে খাতাটা খুললেন। কী লিখেছিলাম—পড়তে হবে : আজ তার সময়।

এক

আমার বয়স যখন সতেরো তখন থেকে আমি জেনেছি মিলি আমার বৌ হবে। মিলি, ঊর্মিলা, বাপের নাম গিরিজা মজুমদার, যিনি উনিশ শো সতেরো বা আঠারো সালে হুতোমগঞ্জে সেকেণ্ড মুন্সেফ ছিলেন। আমার বাবা ছিলেন সেই শহরেই ডেপুটি-কলেক্টর ; পাশাপাশি বাসা ছিলো তাঁদের।

'শহর' বলছি, কিন্তু হুতোমগঞ্জের মতো পাড়াগেঁয়ে মহকুমা সে-কালের বাংলাদেশেও বেশি ছিলো না। জায়গাটা শুধু [illegible] আর মশার ডাকে ভরপুর। একটি বই রাস্তা নেই, সরকারি কাছারি ইত্যাদি ছাড়া পাকা বাড়ি আছে দুটি মাত্র, রেল-স্টেশন নেই। আছে ফুলেশ্বরী নদী, মেঘনার একটা শাখা, চাঁদপুরে যাওয়া-আসার পথে ছোট্ট স্টীমার দাঁড়ায় সেখানে, পিছন দিকে মস্ত খোলা চাকা ঘুরিয়ে চ'লে যায়। সেই স্টীমারে আসে দু-দিনের বাসি হ'য়ে কলকাতার খবর-কাগজ, আত্মীয়দের পোস্টকার্ডের চিঠি, আর মাঝে-মাঝে বদলি-হ'য়ে-আসা চাকুরে। তাঁরা, তাঁদের স্ত্রীরা, প্রথমে নেমে দৃশ্যের অনুমোদন করেন, কিন্তু গোরুর গাড়িতে বাসস্থানে পৌঁছবার পর তাঁদের উৎসাহ উবে যায়।

কেননা হুতোমগঞ্জের একটিমাত্র পাকা শড়ক ঐ নদীরই ধারে, মাইল-খানেক লম্বা ; আর বসতিগুলো ভিতরে ঢুকে, সেখানে কাঁচা পথ, পচা পুকুর, বিস্তর গাছ, আর ফাঁকে-ফাঁকে টিনের ঘর, ছাউনির ঘর, বাঁশের বেড়া। পঞ্চম জর্জকে সাম্রাজ্যচালনায় যাঁরা সহায়তা করছেন, তাঁদের ভাগেও ওর বেশি জোটে না। বড়ো জোর সিমেণ্টের মেঝে।

কিন্তু কিছুই এসে যায়নি। অন্তত আমি, দশ কিংবা এগারো বছরের ছেলে, স্কুলে যাই, খেলা করি, হাতে লিখে মাসিকপত্র চালাই, আমার এমন কোনো প্রয়োজন ছিলো না যা হুতোমগঞ্জ জোগাতে পারেনি। সবচেয়ে

বেণি : ঐ নদী, [illegible] সুরকি-বাঁধানো পথ, অন্ত তীর ছলছল করে দূরে। সেখানে মিনির সঙ্গে মাঝে-মাঝে বেড়িয়েছি, এমনকি হাতে হাত ধ'রে ; কখনো-কখনো ব্যায়ামবীর মণ্টুও এসেছে আমাদের সঙ্গে।

ঐতিহাসিক এই সেন্ নদী, সাঁকোর মালা-পরানো, আলোর মালা-পরানো, সাহিত্যে আর ছবিতে বিখ্যাত, শীতে বরফের তলায় লুপ্ত হ'য়ে থাকে, গ্রীষ্মে তন্বী হ'য়ে ব'য়ে যায়। মনোরম, মধুর, আন্তর্জাতিক, চিরতরুণ প্যারিসের প্রাণ ; তার তীরে দাঁড়িয়ে কোনো ব্যক্তিগত প্রেতকে আহ্বান করাটা অসৌজন্য। কিন্তু তা-ই কি ? গেলো বছর নিউইয়র্কে গিয়ে অন্য একটা কথা আমার মনে হয়েছিলো। ছিলাম কলম্বিয়া পাড়ায়, হাডসন নদী দেখা যায় জানলা দিয়ে। জুলাই মাস, দীর্ঘায়িত সন্ধ্যা ; অফুরান গোধূলিতে ব'সে-ব'সে নদীর দিকে তাকিয়ে থেকেছি। বুঝেছি, পৃথিবীর এই সবচেয়ে অগ্রসর দেশেও নদীগুলো এখনো আদিম ; কোনো উজ্জ্বল ইতিহাস তাদের বেঁধে ফেলেনি, আর তাদের বিরাট বিস্তারের সামনে, সব সত্ত্বেও, মানুষের ক্ষুদ্রতা যেন অনুভব না-ক'রে পারা যায় না। তারই তীরে স্কাইস্ক্রেপারের পুঞ্জ উঠেছে, তারই তলা দিয়ে ছুটে চলেছে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে ট্রেন ; তবু তার জলের ভাষায় সভ্যতার প্রলেপ পড়েনি, এত জাহাজ আর বাণিজ্য নিয়েও সে ভুলে যায়নি দিগন্তের টান, সমুদ্রের অণুতে-অণুতে দূরতমকে স্পর্শ ক'রে আছে। এর নামটা যেন উপসর্গ, নদীর নদীত্বের তাতে অংশ নেই ; আমি যদি ব'সে-ব'সে একে ফুলেশ্বরী ব'লে কল্পনা করি তাহ'লে এর আপত্তি হবে না।

এই নদীর ধারেই জীবন কেটে গেছে হুতোমগঞ্জে। কদম গাছ, বকুল গাছ, মেয়েলি কি পুরুষালি খেলা, সাহিত্যচর্চাও বাদ যায়নি। গিরিজাবাবু, এখানে বলা দরকার, হুতোমগঞ্জের অন্য কারো মতো নন ; তাঁর বাড়িতে কিছু-কিছু লক্ষণ দেখা যায়, যা আমি (সেই অল্প বয়সেই) মাঝে-মাঝে শুধু গল্পে নভেলে পড়েছি। তিনি ব্রাহ্ম ব'লে গুজব শুনি, অন্তত ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন। বাড়িতে অর্গ্যান আছে ; তাঁর স্ত্রী ভ[illegible]লে উঠে নিচু গলায় ব্রহ্মসংগীত গান করেন ; তিনখানা মাসিকপত্র আসে তাঁর নামে, বাড়িতে ফিটফাট হ'য়ে

থাকেন—এমনকি, কখনো কোনো চাঁদের রাত্রে, পাড়া নিঝুম হ'লে, স্বামীর সঙ্গেও নদীর ধারে বেড়াতে বেরোন। শেষের ব্যাপারটা আমি চোখে দেখিনি, কিন্তু এ নিয়ে ফিশফাশ শুনেছি—এমনকি আমার স্কুলে পর্যন্ত। পর-পর তিন রাত্রে ঢিল পড়লো তাঁদের ঘরের চালে; সেটা যে-সব ভূতের উপদ্রব তাদের শান্ত করার জন্য জ্যোছনা-রাত্রে বেড়ানো বন্ধ হ'লো, থামাতে হ'লো নারীকণ্ঠে ঈশ্বর-বন্দনা।

হুতোমগঞ্জ, আকারে ছোটো হ'লেও—কিংবা ছোটো ব'লেই—কয়েকটা খুব কঠিন [illegible] বশবর্তী ছিলো। মেয়েরা ঠিক অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন না—কেননা প্রত্যেক বাড়িতেই উঠোন আছে, কাপড় শুকোবার তার আছে—কিন্তু দিনের আলোয় কোনো বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীজাতীয় ভদ্র মনুষ্য পথে বেরোবে, এ-কথা কারো পক্ষে স্বপ্নেও মনে আনা অসম্ভব ছিলো। বেরোবার অনুমতি ছিলো সন্ধের পরে, এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়িতে দুই গিন্নির গালগল্পের জন্য—পিছন-পিছন চাকর যাবে লণ্ঠন হাতে নিয়ে, কি বাড়ির ছেলে, কিন্তু মহিলাটি যাঁর স্ত্রী সে-ভদ্রলোক সঙ্গে থাকা মহাদোষ। সেই দু-জন, স্বামী আর স্ত্রী, তাদের কখনো একসঙ্গে দেখা যাবে না, আর চাঁদের আলোয় নদীর ধারে যদি কখনো দেখা যায়, তাহ'লে তো বুঝে নিতে হবে যে প্রলয়ের আর দেরি নেই।

বাবা সব সময় বলেন, 'বিশ্রী! বিশ্রী এই জায়গাটা! গিরিজাবাবুর মতো ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢিল ছোঁড়ে! বদলি হ'লে বাঁচেন উনি।'

আর বাবার মুখে এই কথাটা শুনে আমার মন-খারাপ হ'য়ে যায়।

আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই অতি অসভ্য হুতোমগঞ্জ আমার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। আট বছরের মেয়ের বিষয়ে কোনো বাঁধাবাঁধি নেই; সে চুলে রিবন বাঁধে, যখন খুশি বেরোয়, চেঁচিয়েও হাসে, ঘরকন্না খেলার পরিশ্রমে লাল হ'য়ে যায়। অথচ, নিজেদের জন্যও তত বেশি নয়, যত বেশি তার জন্য, তার মা-বাবার বদলি হবার গরজ। এই পোড়া জায়গায় মেয়ে-ইস্কুল নেই, থাকলেও সেখানে তাঁরা মেয়ে পাঠাতেন না—এদিকে [illegible] পড়াশুনো করার বয়স হ'লো। মা তাকে রোজ সকালে

নিয়ম ক'রে ছু-ঘণ্টা পড়ান, ছুপুরে তাকে টাস্ক করতে হয়, মাসে-মাসে কলকাতা থেকে বই আসে তার জন্ম। গল্পের বই, ছবির বই, বড়ো অক্ষরে ছাপা ইংরেজি বই। রঙের বাক্স আছে তার, রঙের পেনসিল, অ্যাটলাস, কথা বানানো খেলা, রোববারে গিরিজাবাবু নিজে ওর সঙ্গে ব'সে ওকে PAT থেকে PART আর PART থেকে PARTY বানাতে শেখান ; মা মুখস্থ করান 'একটি মেয়ে আছে জানি, পল্লীটি তার দখলে'—তার মুখে আবৃত্তি শুনে আমি মুগ্ধ হ'য়ে যাই।

এমন ভাবে লিখছি যেন মিলি আর আমি সব সময়ই একসঙ্গে থাকি। কিন্তু সত্যি কথাটা তা নয়। আমি স্কুলে যাই, ছেলেদের সঙ্গেও খেলা করি, কিন্তু প্রায় রোজই, কোনো-না-কোনো সময়ে, মিলির সঙ্গে দেখা হয় একবার। শুধু পাশাপাশি বাসা ব'লে নয়, আমাদের মা-বাবাদের মধ্যে বন্ধুতাও তার কারণ। রোজ সন্ধেবেলা বাবা আর গিরিজাবাবু ব'সে খবর-কাগজ খুলে দেশের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন ; মায়েরাও গল্প করেন তাঁদের মনোমতো ; ছু-বাড়িতে যাওয়া-আসার কোনো বিরাম নেই, বিশেষ-কিছু রান্না হ'লেই বাটিতে ক'রে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে, হঠাৎ কিছু দরকার হ'লে চেয়ে পাঠাতেও সংকোচ নেই। এই সাধারণ আর পারিবারিক সম্প্রীতির মধ্যে ছোটো ছুটি ছেলেমেয়েকে আলাদা ক'রে না-দেখলেও চলে, কিন্তু আমার মন তার দিকে টেনেছিলো প্রথমে তার গুণপনার জন্য, তারপর তার বইগুলোর জন্ম। বই জিনিশটাকে, সত্যি বলতে, তখন পর্যন্ত বেশি ভালোবাসিনি আমি ; কিন্তু মিলি, যে আমার চেয়ে অন্তত ছু-বছরের ছোটো, তার মুখে পরিষ্কার উচ্চারণে ইংরেজি ছড়া যখন শুনলাম, দেখলাম রুল-টানা খাতায় নীল কালিতে তার ফুলের মতো হাতের লেখা, রঙিন পেনসিলে আঁকা গাছের ফাঁকে সূর্যাস্তের ছবি—তখনই এই পড়াশুনো ব্যাপারটা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোযোগের যোগ্য হ'য়ে উঠলো। তার বইগুলো প'ড়ে ফেলতে দেরি করলাম না, তার উপর তার মাসিকপত্রেও লুকিয়ে ভাগ বসালাম। তার পরেই বুদ্ধি এলো হাতে-লেখা পত্রিকা বের করার, যার সম্পাদক আমি, শ্রী নীলাঞ্জন দে, সহকারী সম্পাদক শ্রী অমৃত মজুমদার, অর্থাৎ

মন্টু, আর যার প্রধান ভক্ত পাঠিকা—মিলি। দেখতে-দেখতে দু-জনের পার্ট উল্টে গেলো, মিলিই এখন ভক্তি করে আমাকে, গুরু ব'লে মানে, আমি তাকে 'উষা'র সঙ্গে 'ভূষা' আর 'হৃদয়'-এর সঙ্গে 'নির্দয়' মেলাতে শেখাই।

চেষ্টা ক'রেও মন্টুকে পুরোপুরি দলে টানতে পারিনি, না কি তেমন মন দিয়ে চেষ্টাই করিনি, তা বলতে পারি না। কিন্তু মন্টু শেষ পর্যন্ত আধখানা বাইরেই থেকে গেলো। সে ভালোবাসে শরীর খাটাতে, ফুটবলে হাফ-ব্যাক খেলে, স্পোর্টস-এ মেডেল পায়, শূন্যে পা তুলে দিয়ে মাথার উপর সোজা হ'য়ে তে পারে। তার এ-সব আশ্চর্য ক্ষমতার কথা স্কুলের মধ্যে কারোরই জানতে বাকি নেই, কিন্তু তার বাড়িতে বই, ছবি, গানের চর্চাটা যেন তার বাবা, মা আর বোনের মধ্যেই ঘুরে-ফিরে বেড়ায়, তার বড়ো উৎসাহ দেখা যায় না। অথচ পড়াশুনোয় সে ভালো নয় তা নয়; অঙ্কে প্রত্যেকবার ফার্স্ট হয়, আমার পত্রিকার পাতায় ছবিও এঁকেছে গল্পও লিখেছে, কিন্তু ছোটো ছেলের পক্ষে যেগুলোকে বলা হয় 'স্বাস্থ্যকর' কাজ, সে-সব দিকেই তার ঝোঁক বেশি।

আইনত, মন্টুর সঙ্গেই আমার বন্ধুতা হওয়া উচিত ছিলো। ছোটো ছেলের সঙ্গে ছোটো মেয়ের সহজে ভাব জমে না; দু-জনে দুই আলাদা জগতের অধিবাসী, দু-জনের খেলা আলাদা, চলা আলাদা, দিবাস্বপ্নও এক নয়। কিন্তু মন্টুর শৌর্য আমাকে আকর্ষণ করলো না, ওর বিষয়ে কেমন-একটা সহনশীল উদারতার ভাব পোষণ করেছি মনে-মনে, আমার পত্রিকায় ওর সহযোগে কৃতার্থ বোধ করেছি—কেননা মনের কোনো গভীর স্তরে জেনেছি যে এ-সব ওর সত্যিকার কাজ নয়।

সন্দেহ হয়, আমার স্বভাবের মধ্যে মেয়েলি অংশ অনেকটা ছিলো—মানে, আছে। নয় তো কেন, এগারো বা দশ ব-রের ছেলে, বাড়ন্ত হাত-পায়ের চঞ্চলতা ভুলে গিয়ে, মিলির সঙ্গে আস্তে-আস্তে [illegible] বিকেলবেলায়, রোদ্দুরে ভরা রোববারে গাছের ছায়ায় হাঁড়ি-[illegible]ড়ি পেতে ঘরকন্না খেলতেও রাজি হয়েছি? সবই খেলা হ'য়ে উঠেছে, তার সঙ্গে থেকেছি যখন; নদীতে

জলের, আকাশে মেঘের, আর গাছের পাতায়-পাতায় হাওয়ার খেলা দেখেছি; মা-বাবাদের বিরুদ্ধ মত সত্ত্বেও বিশ্বাস করিনি যে পৃথিবীর মধ্যে হুতোমগঞ্জ নিকৃষ্ট জায়গা।

কিন্তু অবশেষে একদিন গিরিজাবাবু বদলি হলেন।

শেষদিনের বিকেলে আমরা তিনজন একসঙ্গে শেষবার ফুলেশ্বরীর ধারে বেড়ালাম। মধ্যিখানে মিলি, দু-পাশে মণ্টু আর আমি। আমি এই বিদায় উপলক্ষে দুটো পদ্য বানিয়ে উপহার দিয়েছিলাম; তাতে প্রত্যেক লাইনের শুরুতে ওদের নামের এক-একটি অক্ষর বসানো—যাতে কিনা উপর থেকে নিচে পড়লে পুরো নামটা পাওয়া যায়। সেই রচনার তারিফ করলে মণ্টু, মিলি বললে আর-একটু বড়ো হ'য়ে সেও কবিতা লিখবে। সন্ধে হ'লো, শরতের আকাশে চাঁদ উঠলো, আমরা ছোটো-ছোটো ছায়া ফেলে আমাদের বাড়িতে ফিরে এলাম—রাত্রে গিরিজাবাবুদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন বাবা।

দু-তিন মাস চিঠি চলেছিলো। ওরা ছবি এঁকে পাঠায়, আমার পত্রিকার জন্য চট্টগ্রামের বর্ণনা, মিলি জানায় শিগগিরই সে স্কুলে ভরতি হবে। কবে চিঠি থেমে গেলো মনে নেই।

দুই

মনোরম সেই ভ্রমণ, আজ পর্যন্ত মনোরম, স্মৃতি হ'য়ে গিয়ে আরো বেশি মনোরম, ঢাকা-বরিশালের জলপথের সেই ছত্রিশ ঘণ্টা। আশ্চর্য, অদ্ভুত, উপকথার মতো, যে দু-শো বা আড়াই-শো মাইল পেরোবার জন্য অপেক্ষা করতে হয় ভোর থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল, আবার সেই সকাল থেকে আর-এক সন্ধ্যা। ছত্রিশ ঘণ্টা: তিন মহাদেশ, তিন মহাসাগর পার হবার পক্ষে যথেষ্ট সময়। কিন্তু সময়ের গতি মন্থর ছিলো সেই সময়ে, তখনকার পাঁচ বছর আজকালকার এক বছরের সমান ছিলো, না কি এক বছর পাঁচ বছরের সমান? বোধহয় শেষেরটাই ঠিক: কেননা প্রথম যৌবনের সেই কয়েকটা বছরকে কী দীর্ঘ ও ভরপুর মনে হয় আজ—মনে হয় যেন সারা জীবন—আর তার পরের বছরগুলিকে—যদিও তারা সংখ্যায় অনেক বেশি আর ঐতিহাসিক অর্থে অনেক বেশি ঘটনাবহুল—ভালো ক'রে মনেই পড়ে না। তরুণ ছিলো তখন জীবন, আর সময় ছিলো লোকশানের অতীত—কেননা এই ভ্রম তখনও উপস্থিত হয়নি যে আমি জগতের কোনো 'কাজে লাগি'।

এক ভাগনির বিয়েতে বরিশালে এসেছিলাম। যাবার সময় দলবল ছিলো, কিন্তু সঙ্গীরা বেড়াবার জন্যে কয়েকদিন থেকে গেলো। আমাকে একা ফিরতে হ'লো দু-দিন পরে, আমার কলেজ খুলে যাচ্ছে। সেই বরিশালেই তাপসীকে প্রথম দেখেছিলাম, এটা তথ্য হিশেবে জানি, কিন্তু স্মৃতিতে স্পষ্ট হ'য়ে নেই।

নেই?...একবার চলেছিলাম সান ফ্রান্সিস্কো থেকে টোকিও, মস্ত প্লেন পঞ্চাশ জন যাত্রীতে বোঝাই, বাইরে অন্ধকার মহাশূন্য, অনেক, অনেক নিচে প্যাসিফিকের বিস্তার। খানিক আগে তিন রকম মদের সঙ্গে পাঁচ-কোর্স ডিনারের প্রতি যাঁরা সুবিচার করেছিলেন তাঁরা আস্তে-আস্তে চেয়ারে এলিয়ে,

পা ছড়িয়ে দিচ্ছেন, বই, পত্রিকা খ'সে পড়ছে হাত থেকে, নতুন সিগারেট আর ধরানো হচ্ছে না, এইমাত্র রাত-বাতিও জ্বেলে দিলে। এঞ্জিনের একঘেয়ে শব্দে ব্রহ্মাণ্ড ডুবে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ সেই শব্দের সুরে বিকট ছন্দপতন হ'লো, মাতালের মতো কাৎ হ'য়ে পড়লো প্লেনটা, একজন বৃদ্ধা মহিলা আসন থেকে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে গেলেন, অনেকে সেই সাধের ডিনার বমি ক'রে ফেললে, নানা ভাষার আর্তস্বর একটা ভীত জন্তুর মতো চকিতে ছুটে গেলো। এক মিনিট, এক মিনিটও নয়—আধ মিনিট—কয়েক সেকেণ্ড—একটা মুহূর্ত : মুহূর্তের জন্য দামি-দামি পোশাকের তলায় মৃত্যুভয়ে দুলে উঠলো একসঙ্গে অনেকগুলো হৃৎপিণ্ড, প্রিয়তম প্রাণটিকে অত্যন্ত মৃদু আঙুলে স্পর্শ ক'রে ঈশ্বর একটি ছুঁচের মতো সকলের মাংসে প্রবেশ ক'রে বেরিয়ে গেলেন। পরের মুহূর্তে মাইক্রোফোনে শোনা গেলো একটি নরম, আত্মস্থ কণ্ঠস্বর : 'ভয় পাবেন না, বিপদ কিছু ঘটেনি। ভয় পাবেন না, বিপদ কিছু ঘটেনি। একটা অ্যালবাট্রস পাখির সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিলো আমাদের, তার ফলে একটা এঞ্জিন বিগড়ে গেছে, কিন্তু অন্যগুলো ঠিক চলছে, আমরা এক ঘণ্টা পরে হনলুলুতে নামবো, সেখানে এঞ্জিন সারানো হবে।'

এই খবরটা যখন বলা হচ্ছে তখন আমি সম্পূর্ণ জেগে উঠেছি, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা ধারণা ক'রে নিতে আরো একটু সময় লাগলো। একটু আগে আধো ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম ; সেই ভয়ের ও বিশৃঙ্খলার মুহূর্তেও স্বপ্নটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারিনি মন থেকে। আছি বরিশালে ; রাইন নদীর তীরে ছোটো শহর, কিন্তু সেটাই বরিশাল। একটা চালাঘরে নিকোনো মেঝেতে পিঁড়ি পেতে আমরা কুড়ি-পঁচিশজন খেতে বসেছি। আমার উল্টো দিকের সারিতে আমার বাবা বসেছেন, তাঁর গাল-ভরা দাড়ি, পিঁড়ির বদলে কুশাসন দেয়া হয়েছে তাঁকে। আমিও কুশাসনে বসেছি, আমার খুব কান্না পাচ্ছে, মাঝে-মাঝে জল পড়ছে চোখের কোণ বেয়ে, অথচ লক্ষ না-ক'রে পারছি না যে অন্য সবাই তিন রকমের মাছ খাচ্ছে, কিন্তু বাবাকে আর আমাকে দেয়া হয়েছে শুধু আতপ চালের ভাত, ঘিয়ের

সঙ্গে সোনামুগের ডাল, আর উচ্ছে, বরবটি আর আলুসেদ্ধ। কেন এইরকম তফাৎ করা হ'লো সে-বিষয়ে ভাবতে-ভাবতে আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলাম যে আমার মা কয়েকদিন আগে মারা গেছেন আর সেইজন্যেই আমার কান্না পাচ্ছে। কিন্তু বাবা তো মা-র আগে মারা গিয়েছিলেন—তক্ষুনি, স্বপ্নের মধ্যেই মনের এক অংশে ঝিলিক দিলো আমার—অথচ চোখের সামনে যা দেখছি সেটাকেও অবিশ্বাস করতে পারছি না : বাবা ব'সে আছেন গাল-ভরা দাড়ি নিয়ে, মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে আতপ চালের সুগন্ধি ভাত খাচ্ছেন, কী বিষণ্ণ তাঁর মুখ, আমার দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না। মা—আমার মা আর নেই ; মারা গেছেন। আর সেইজন্যে কেউ তাকাচ্ছে না আমার দিকে, পাছে কারো চোখে চোখ পড়লেই কেঁদে ফেলি, ছেলেমানুষ আছি তো আমি এখনো, সবেমাত্র কলেজে ভরতি হয়েছি। পাঁচটি-ছ'টি তরুণী মেয়ে পরিবেশন করছে আমাদের, তাদের সকলেরই মুখ সুন্দর আর বিষণ্ণ, আমার খুব ইচ্ছে ওরা কেউ এসে কথা বলে আমার সঙ্গে, কিন্তু সকলেই কেমন এড়িয়ে চলছে আমাকে, আর কান্না ঠেলে-ঠেলে উঠছে আমার বুক থেকে, গলা দিয়ে ভাত নামছে না। আমার মনে পড়লো (সেই স্বপ্নের মধ্যেই) মা-কে কেমন লম্বা হ'য়ে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম, কাঠির মতো টান, হাত দুটো দুই পাশে এমন অনড় হ'য়ে প'ড়ে আছে যেন ওরা তাঁর দেহের অংশ আর নয়, চাদরের তলা থেকে পায়ের আঙুলগুলো অসহায়ভাবে বেরিয়ে আছে যেন ওরা মস্ত শহরে পথ-হারিয়ে-যাওয়া ছোটো-ছোটো ছেলে—কিন্তু তারই একটি আঙুল আমি ছুঁতে যাওয়া মাত্র যেন সাপের মতো কামড়ে দিলে আমাকে, কী কঠিন, আর এমন মৃত, এমন ঠাণ্ডা। আমার খাবার সব ইচ্ছে চ'লে গেলো, কান্নাকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না ; শাদা, মসৃণ ও অস্পৃষ্ট আলুসেদ্ধর স্তূপের উপর আমার চোখের জল ফোঁটা-ফোঁটা পড়তে লাগলো, বৃষ্টি হ'য়ে যাওয়ার পরে গাছের পাতা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টির মতো, আর আলুসেদ্ধর গোল পিণ্ডটি গ'লে-গ'লে গড়িয়ে যেতে লাগলো কাদার মতো পাথরের থালার উপর দিয়ে। সর্বনাশ—ওরা দেখলে ভাববে

কী? এত বড়ো ছেলে, কলেজে পড়ি—এ-রকম কাঁদছি! আমি মনস্থির করলাম আর কাঁদবো না, কাছাকাছি কেউ কোনো হাসির কথা বললে হেসে উঠতেও প্রস্তুত হলাম মনে-মনে; ঢোঁক গিলে, চোখের জল মুছে, মুখ তুলে তাকালাম। তাকিয়েই দেখি—সে। হাতে জলের জগ, নিচু হ'য়ে আছে আমার সামনে, ঝুঁকে আছে আমার মুখের উপর—কী কাণ্ড! কতক্ষণ ধ'রে? দেখেছে নাকি আমার কান্না, কী ভাবছিলো আমাকে কাঁদতে দেখে? তার চোখের উপর চোখ পড়লো আমার। কালো চোখ, গভীর, স্থির হ'য়ে থাকলে বিষণ্ণ দেখায়, কিন্তু একটু মাথা নাড়লেই সেই গভীরে আনন্দের একটি ছোট্ট ফুল ফুটে ওঠে। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'একটু জল দিই তোমাকে? জল খাও, তাহ'লে ভালো লাগবে।' ঢেলে দিলে জল; আর সত্যি, একটু জল খাওয়ামাত্র সব দুঃখ মিলিয়ে গেলো আমার, বৈশাখের বিকেলে মেঘের মতো শান্তিতে ছেয়ে গেলো মন, আমার শরীর হ'য়ে উঠলো যেন মায়ের পুজোর ঘরের মতো স্নিগ্ধ আর সুগন্ধি আর নির্মল। ঘরে যে আরো অনেক লোক আছে, কাছেই আমার বাবা ব'সে আছেন—সব ভুলে গিয়ে আমি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলাম, 'তাপসী, তুমি আমাকে এত ভালোবাসো!' আর তক্ষুনি, প্লেনের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে আমার ঘুম ভেঙে গেলো।

কিন্তু জেগে উঠেও, আর ঐ এক মুহূর্তের হৈ-চৈয়ের মধ্যেও, আমি যেন স্বপ্নটাকেই দেখছিলাম, কিংবা সেই স্বপ্নের কথাই ভাবছিলাম, খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম কোথায় তার উৎস। খুব যে গভীরভাবে ঘুমিয়েছিলাম তা নয়—এরোপ্লেনের রাতগুলি সাধারণত আধো-ঘুমের মধ্যে আমার কেটে যায়, কিন্তু স্বপ্নটি সে-রাতে এসেছিলো এমন স্পষ্ট ও জীবন্ত হ'য়ে যে আজ পর্যন্ত তার সব বিবরণ মনে করতে পারি। এও মনে পড়ে যে হাওয়াই দ্বীপে পৌঁছবার অনেক আগেই স্বপ্নের সুড়ঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে-দিয়ে এক ফোঁটা বাস্তবে আমি পৌঁছতে পেরেছিলাম। বরিশালের বিয়ে-বাড়িতে অনেকগুলি তরুণী ছিলো, আর আমার ছিলো নবযৌবন; বার-বার তাদের দেখা যেতো ও শোনা যেতো, তারাই চা নিয়ে আসছে, দু-বেলা খাবার সময় পরিবেশন

করছে, আর তাদের মধ্যে একজন আমাকে একদিন জিগেস করেছিলো, 'আপনাকে আর-একটু জল দেবো?' অতি সাধারণ কথা—শুনে আমি সে-মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হইনি ; কিন্তু পরে আমার বার-বার মনে পড়েছে ; তার চোখের আভায় আর ছুটি ভরা ঠোঁটের লাবণ্যে মিশে কথাটাকে যেন ছোট্ট একটি মণির মতো লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম—সেই বরিশালের দলবলের মধ্যে আড্ডার উত্তেজনা থেকে। সেই মেয়েটি তাপসী।

গোপন ভাবনায় ডুবে যেতে হ'লে এরোপ্লেনের মতো স্থবিধের জায়গা আর নেই। সংকীর্ণ পরিসরে সামাজিক জীবনের অবকাশ নেই, শব্দের প্রবলতায় পাশের লোকটির সঙ্গেও বেশিক্ষণ আলাপ চালানো যায় না, আর ভ্রমণের মেয়াদ এত অল্প যে তা সময়-কাটানো বন্ধুতাকে বাহুল্যে পরিণত করে। আ—কী আশ্চর্য এই স্বপ্ন ব্যাপারটা, যখন তা এইরকম স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, দিনের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তবকে সেলাম ক'রে মিলিয়ে যায় না, ছিনিয়ে নেয় আমাদের অভিনিবেশ, ফিরিয়ে দেয় আমাদের—আমাদের নিজেদেরকে, আমাদের অন্য এক নৈশ অস্তিত্ব, যাকে ভুলে থাকি ব'লেই আমরা যুগে-যুগে নব্য জগতে নবযুগের চালক হ'তে পারি। 'দৈনন্দিন' ব'লে একটা শব্দ প্রায় সব সভ্য ভাষাতেই প্রচলিত আছে, কিন্তু 'রাত্রি' থেকে ও-রকম কোনো বিশেষণ রচিত হয়নি ; কেননা দিন, যা কাজের সময়, তা প্রতিদিন এবং সকলের পক্ষেই প্রায় একরকম ; আর রাত্রি, যা স্বপ্নের সময়, তা প্রতি বারেই নতুন, অভাবনীয়, সদ্যোজাত। কেন স্বপ্নেরা সাধারণত এত ভিতু, কেন ছেঁড়াখোঁড়া ভিখিরির মতো বা আধপেটা বেশ্যাদের মতো অন্ধকার গলির মোড়ে-মোড়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকে—পুলিশের বুটের শব্দে কিলকিল ক'রে ঢুকে পড়ে যে যার বিবরে, এদিকে রাজপথে নিশেন উড়িয়ে চলে মাসের শেষে মাইনে, পটল কিনতে গিয়ে দরদস্তুর ক'রে তিন পয়সা বাঁচানো? কেন তারা সাহস ক'রে চুলের ঝুঁটি ধ'রে টেনে নেয় না আমাদের, যেমন আমাকে নিয়েছিলো সেই রাত্রে, প্যাসিফিক-পেরোনো এরোপ্লেনের তন্দ্রার মধ্যে? কী আশ্চর্যই না হ'তো, যদি ঐরকম ছবি দিয়ে-দিয়ে সচেতনভাবেও ভাবতে

পারতুম আমরা, ভাবতে পারতুম রক্ত দিয়ে, বিনা চেষ্টায়, আমাদের অস্থিমাংসমজ্জার পরতে-পরতে! অন্ততপক্ষে ঘুমের মধ্যেও আরো বেশি ক'রে পাওয়া যেতো যদি ছবিগুলোকে!...কিন্তু ও-রকম স্বপ্ন, নব্বুই বছর বেঁচে থাকলেও, এক জীবনে তিন বার কি চার বারের বেশি আসে না। যাদের ভালোবাসি তাদের আমরা খুবই কম স্বপ্নে দেখি; যাদের ভালোবাসতাম আর যারা ম'রে গেছে, তাদের প্রায় কখনোই স্বপ্নে দেখি না।

কিন্তু সে-রাতে আমি তিনজনকে একসঙ্গে দেখেছিলাম: আমার বাবা, আমার মা—আর তাপসী। দু-জন মৃত; তাদের বিষয়ে আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই—কিন্তু অন্যজন? প্লেন যখন চলেছে হনলুলুর দিকে, যাত্রীদের নিশ্চিন্ত মাথাগুলো আবার এলিয়ে পড়ছে চেয়ারের পিঠে, আমি নিজের সঙ্গে ছোট্ট একটি তর্ক শুরু ক'রে দিলাম, মনে পড়ে। একদিকে আমি, নীলাঞ্জন দে, য়ুনেস্কোর প্রতিনিধি, নিউ ইয়র্কে কেনা ঢিলেঢালা আরামদায়ক জামা-কাপড় পরা—আর অন্যদিকে নীলু, নীলাঞ্জন, বেদনা, বিবেক ও অনুভূতিতে ভরা একটা মানুষ। নীলাঞ্জন দে বললেন, 'হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখে ফেলেছি, এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। স্বপ্নের কি কোনো মানে হয়?' নীলু জবাব দিলে, 'কিন্তু তুমি তাকে ভালোবাসতে—এ-কথা কি সত্য নয়?' 'কিন্তু তাই ব'লে তাকেই তো জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে রাখিনি। অন্য নারীর সংসর্গ আমি জেনেছি—যাকে বলে ঘনিষ্ঠ সংসর্গ, বিদেশে প্রণয়িনীর অভাব হয়নি আমার—তা জানো তো?' শেষের কথাটা একটু নির্লজ্জভাবে শুনিয়ে দিলাম, প্রতিপক্ষকে আহত করার জন্য, ঠোঁটে একটি ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে তার উত্তরের অপেক্ষা করলাম। কিন্তু অপ্রস্তুত হওয়া দূরে থাক, সে নির্ভয়ে জবাব দিলে, 'জানি, তুমি অনেক প্রণয়িনী পেয়েছো, কিন্তু সে? তুমি কি এমন কোনো খবর পেয়েছো যে সে স্বামী পুত্র সংসার পেয়েছে, পেয়েছে নারীর পক্ষে উপযোগী জীবন। না কি এমন কোনো খবরই পেয়েছো যে সে তোমার মতো বিদ্বান ইত্যাদি হ'য়ে হেলসিঙ্কিতে ভারতের অ্যাম্বাসেডর হয়েছে?...চুপ ক'রে আছো যে?' 'চুপ ক'রে আছি এইজন্যে যে তার

বিষয়ে কোনো খবরই পাইনি।' 'কখনো খবর নিতে চেষ্টা করেছো কি?' 'ন্‌না। সময় ছিলো না।'—'তার কথা ভাববার আমার সময় নেই—' এ-কথা বলতে গিয়েও চেপে গেলাম। 'তুমি প্রথম যখন বিলেত থেকে দেশে ফিরলে—তোমার মা যখন বলেছিলেন তার কথা—তখনও কি সময় ছিলো না? এমনকি তখন মা-র সঙ্গে শঠতা করলে, মিথ্যে ক'রে বললে মেম বিয়ে ক'রে এসেছো পাছে তোমার মা চেষ্টা করেন তাকে উদ্ধার করতে!' এ-কথা শুনে আমি একটুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলাম, তারপর আস্তে-আস্তে বললাম, 'কেন আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছো? অন্য একজনকে কি ভুলে গিয়েছো তুমি? মিলিকে মনে নেই? মিলির মৃত্যু আমি ক্ষমা করতে পারিনি, আর তা পারিনি ব'লেই—' 'মিলির মৃত্যু!' আমার কথা শেষ হবার আগেই ছোরার মতো আমার বুকে বিঁধলো জবাব: 'তার মৃত্যুর জন্য কি তাপসী দায়ী যে সেজন্য তুমি তাপসীকে ক্ষমা করতে পারলে না? তাপসীকে ক্ষমা করার কথা ওঠে কিসে? সে তোমাকে ভালোবেসেছিলো, সেইজন্যে তুমি শাস্তি দেবে তাকে? বুকে হাত দিয়ে বলো তো, মিলির মৃত্যুর জন্য তুমি ছাড়া আর কে দায়ী?' 'হ্যাঁ—মানছি, মানছি আমারই দোষ, আমিই দায়ী—কিন্তু তুমি এখন দয়া ক'রে চুপ করো তো! এ-সব কতকালের পুরোনো কথা—কী হবে আর বলাবলি ক'রে—কেউ তো ফিরে আসবে না।' 'মানছো তা হ'লে?' যেন প্রতিহিংসার স্বরে দাঁতের ফাঁকে চেঁচিয়ে উঠলো আর-একজন, 'মানছো যে তাপসীর জীবন তুমিই নষ্ট করেছো—তার জীবন—তার সারা জীবন! হত্যা করলে তুমি, আর ফাঁসি হ'লো আর-একজনের—একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে না কি?' এ-কথা শুনে আমি গম্ভীর হলাম—জগতের উপকার করার জন্য যে-মানুষ জগতের খরচে জগৎ ভ'রে ঘুরে বেড়ায় তার পক্ষে উপযোগী গাম্ভীর্য ধারণ ক'রে বললাম, 'নাটুকেপনা কোরো না তো! কেউ কাউকে হত্যাও করেনি, ফাঁসিও হয়নি কারো। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তুমি তর্কের ঝোঁকে ভব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো। চুপ করো এখন!' একটু যেন কাবু হ'লো আমার ধমক খেয়ে, কিন্তু গোঁয়ারের মতো তবু বললে, 'কিন্তু এখনো তোমার

প্রায়শ্চিত্ত করার সময় আছে। দেশে ফিরে যাও, তাকে খুঁজে বের করো। বিয়ে করতে পারো না এমন বুড়ো তো তুমি হওনি এখনো।' শুনে আমি কপাল কুঁচকে ইংরেজিতে জবাব দিলাম, 'অ্যাবসার্ড।' 'অ্যাবসার্ড কেন?' এবার সত্যি আমার মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেলো, রাগি গলায় গরগর ক'রে বলতে লাগলাম, 'ধ'রে নেয়া যাক সে এখনো বিয়ে করেনি, ধ'রে নেয়া যাক ফিরে গেলেই ভারতের মতো মস্ত দেশে তাকে খুঁজে পাবো, কিন্তু দেখা হওয়া মাত্রই কি দম-দেয়া স্প্রিঙের পুতুলের মতো ভালোবাসা লাফিয়ে উঠে মাথা দোলাতে থাকবে?' 'কিন্তু তুমি কি মনে-মনে তাকে এখনো ভালোবাসো না?' 'কী বলছো মাথামুণ্ডু তার মানে হয় না!' 'সত্যি বলছো?' 'সে-কথা ওঠে কিসে? মিলি ম'রে গেলো, তারপর নীলাঞ্জন আর তাপসী বিয়ে ক'রে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগলেন, কুড়ি বছর পরে তাঁদের তেতলা বাড়ি উঠলো কলকাতায় নিউ আলিপুরে, ছেলে কেমিস্ট্রি পড়তে বার্লিনে গেলো, মেয়ের বিয়ে হ'লো চোদ্দশো-টাকা-মাইনে-পাওয়া আমেরিকা-ফেরৎ এঞ্জিনিয়রের সঙ্গে—বরের বাপ পার্টি দিলেন ক্যালকাটা ক্লবে—তুমি কি এত বড়ো নির্বোধ যে এই গল্পের এ-রকম উপসংহার কল্পনা করতে পারো?···কী, জবাব নেই যে এবার?' বুঝলাম, এতক্ষণে তাকে রীতিমতো জব্দ করা গেছে, বেশ খুশি লাগলো মনের ভিতরটা, কিন্তু এর পরেও সে চিঁচিঁ ক'রে হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'কিন্তু তাপসী তোমাকে মনে-মনে ভালোবাসে এখনো।' আমার ধৈর্যের বাঁধ এবার সত্যিই ভাঙলো, ইংরেজিতে প্রচণ্ড ধমক দিলাম, 'Shut up, fool!'

অন্য লোকটাকে হারিয়ে দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম হনলুলু পৌছবার আগে কয়েক মিনিট ঘুমিয়ে নিতে। কিন্তু ঘুম আসেনি; স্বপ্নের জের টেনে আরো অনেক ছবি আমার ঘুমের সুতোকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে দিচ্ছিলো। ছবি, স্মৃতি, কথা, স্বর, ভঙ্গি। হাতের ন'ড়ে-ওঠা, চোখের ঝলকানি, আঁচলের দোলা। ক্লান্ত, ম্লান, দুধের মতো শাদা একটি মুখ; শামলা রঙের সজল স্নিগ্ধ আর-একটি মুখ; এক দেহে দুই মুখ, এক মুখের দুই দিকে দুই চেহারা।

আমার ভিতর থেকে প্রার্থনা উঠছিলো : 'কেন তোমরা এতদিন পরে আবার ? ফিরে যাও, অতৃপ্ত আত্মারা, আমাকে ক্ষমা করো, আমার হাতে আর-কিছু নেই, ঈশ্বর তোমাদের শাস্তি দেবেন।' কিন্তু মেঘের মতো বার-বার ওরা গ'লে যায়, মেঘের মতো বার-বার ফিরে আসে, নানা রূপে, নানা গড়নে, নানা ভঙ্গিতে। আর তখনই আস্তে-আস্তে—বছর পাঁচেক আগেকার কথা হবে—এই লেখাটার একটা আভাস ধরা দিয়েছিলো আমার মনে। যদি শুধু বলতে পারি কখনো কারো কাছে, সব কথা বলতে পারি, কিছু না-লুকিয়ে, কোনো সাজগোজ না-পরিয়ে—তাহ'লেই মুক্তি হবে ওদের, আর আমার হবে প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক নই, কোলরিজের বুড়ো নাবিকের মতো খ্যাপা হ'য়েও যাইনি—কার কাছে বলবো ?…এই খাতার কাছে, এই খাতার কাছে।

তিন

যে-দিদির মেয়ের বিয়ে তাঁর নাম বিনোদিনী, ছেলেবেলায় তাঁকে বড়দি ব'লে ডাকতুম। আমার সহোদরা নন, জ্যাঠতুতো বোন, প্রায় আমার মায়েরই বয়সী ; মা-র সঙ্গে তাঁর সখিত্ব ছিলো দু-জনেই যখন নববিবাহিত। এই দিদির দেওরের মেয়ে তাপসী, তার মা অল্প বয়সে মারা যান, বাপ নতুন সংসার পেতে প্রথম পক্ষের মেয়েকে স'পে দিয়ে গেলেন বৌদির হাতে।

পরে, একটু-একটু ক'রে, তাপসী যখন আমাদের ঢাকার বাড়িতে এলো, মা-র কাছে এ-সব কথা শুনেছিলাম। বরিশালে ছিলেন ওঁরা তখন—বা আমরা ছিলাম—বাবা স্কুলমাষ্টারি ছেড়ে সবেমাত্র সরকারি চাকরিতে ঢুকেছেন, আমার বয়স তিন, কিন্তু তিন বছরেই নাকি 'হাসিখুশি' মুখস্থ ক'রে ফেলেছি, এমনকি মুখে-মুখে 'টুইংকিল টুইংকিল লিটিল স্টার' আউড়িয়েও তুষ্ট ক'রে থাকি গুরুজনদের। সোমেশ্বরবাবু, মানে, বড়দির স্বামী—তিনি জজকোর্টের উকিল, কিন্তু ওকালতিটা যাকে বলে হাতের পাঁচ, আসলে তাঁরা বরিশালের বনেদি লোক, শহরে খানতিনেক বাড়ি আছে, গ্রামে বিস্তর জমিজমা ; বালাম চাল, মুসুরির ডাল, নারকোল আর সুপুরি বেচে বছরে যা পাওয়া যায়, তা চার ভাইয়ের মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু চার ভাই মানে তো আর চার ভাই নয়, প্রত্যেকের একটি ক'রে পত্নী আছেন ; এবং জীবনের এই একটি ব্যাপারে একে আর একে যোগ করলে দুই হয় না, প্রথমে হয় এক ('দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া বসো হে জীবননাথ'), তারপর ক্রমে-ক্রমে তিন, চার, পাঁচ, আট, দশ, বারো হবারও বাধা নেই। অতএব সোমেশ্বর (চার ভাইয়ের মধ্যে বড়ো তিনি), বি. এল. পাশ ক'রে সনদ নিলেন, অন্যেরাও বি. এম. কলেজ থেকে বি. এ.টা পাশ ক'রে নিয়ে কিছু একটা চাকরি-বাকরির যোগ্য ক'রে নিলেন নিজেদের, শুধু ছোটো ভাই

রাধাকান্ত একবার আই. এ. ফেল ক'রে সেই যে ঘরে এসে বসলো, তারপরে আর নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখালে না।

এঁদের পরিবারকে একেবারে দশাচল অর্থাৎ সাধারণ ভাবলে ভুল হবে ; পূর্বপুরুষ কোম্পানির আমলেই ইংরেজি শিখে, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করেছিলেন, কলকাতায় আনাগোনা ও চব্বিশ পরগনার টাকির সঙ্গে ক্রিয়াকর্ম ছিলো ; খাঁটি বরিশালের স্বরে কেউই কথা বলেন না। তার উপর সেই বিশ শতকের প্রথম দিকে, স্বদেশীর হাওয়া জোর বইছিলো বরিশালে, ছিলো অশ্বিনীকুমার দত্তের আদর্শ ও প্রতিপত্তি, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী অথবা ভক্তির গান গাইতে পারে এমন মানুষও বিরল ছিলো না—কোনোরকমে পরীক্ষা পাশ ক'রে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করাই যে জীবনের শেষ কথা নয়, এই কথাটা উচ্চারিত না-হ'লেও অনুভূত হচ্ছিলো। তাই, বাড়ির এক ছেলে যখন মধ্যপথেই কলেজ থেকে বিদায় নিলে তখন কেউ অত্যন্ত বেশি উদ্বিগ্ন বা উত্তপ্ত হ'লেন না—তখনকার সচ্ছলতাও তার একটা কারণ—ভগবান যখন হাতের পাঁচ আঙুলকে সমান ক'রে গড়েননি, তখন বাড়ির একটা ছেলে যদি 'অন্য রকম' হয় তাতে এমন অবাক হবার কী আছে, এই রকম তাঁদের মনের ভাবখানা। হাতের পাঁচ আঙুল সমান হ'লে মানুষ তার হাতের দ্বারা চিমটি কাটা থেকে কবিতা লেখা বা কামান ছোঁড়া পর্যন্ত এত ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের কাজ নিশ্চয়ই ক'রে উঠতে পারতো না ; অতএব মানুষদের মধ্যেও এক-এক জন যে এক-এক রকমের হয়, তার পিছনেও ভগবানের কোনো অভিপ্রায় আছে বইকি, জটিল কাটাকুটির অঙ্ক নিশ্চয়ই অসীমে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে।

এই উদার মনোভাব রাধাকান্তর চরিত্রগঠন করতে কতদূর সাহায্য করেছিলো জানি না, কিন্তু নিজেকে নিয়ে আপাতত তাঁর কিছুই ভাবনা নেই ; তাঁর শখ অভিনয়ে, তাঁর শখ দাবাখেলায়, মাঝে-মাঝে উচ্চভাবাপন্ন ধ্রুপদসংগীতের চর্চা ক'রে থাকেন, সাঁতারে তিনি অদ্বিতীয়, আর এক-এক দিন পুকুরে ছিপ ফেলে তিনি যে-বিপুল ধৈর্যের পরিচয় দেন তার সাহায্যে

যে-কোনো পরীক্ষা সাতবার ক'রে পাশ করা যেতো। বাড়ির ছোটো ছেলে ব'লে তাঁর আব্দারও কিছু বেশি, আর সেই আব্দার সবচেয়ে বেশি পালন ক'রে চলেন আমার বড়দি। বাড়ির প্রথম বৌ এবং বড়ো বৌ হিশেবে বড়দি তখন গৌরবের তুঙ্গ শিখরে অবস্থান করছেন; তাঁর বাক্স বোঝাই স্নো ক্রীম এসেন্স পাউডর আর নানা রঙের বিলেতি চিঠির কাগজ সবই দেওরের সেবায় সার্থক হচ্ছে, সিকি আধুলি থেকে পাঁচ টাকার নোট পর্যন্ত হস্তান্তরিত হচ্ছে মাঝে-মাঝে, আর যদিও বাড়িতে ঠাকুর-চাকরের অভাব নেই বড়দি প্রায় রোজই নিজের হাতে কিছু-না-কিছু রান্না করছেন যা দেবর-রত্নের রসনার পক্ষে রুচিকর। আমার মা যখন এসে পৌঁছলেন তখন থেকে আমাদের বাড়িতে রাধাকান্তর আর-একটি আস্তানা হ'লো; দুই বোঠানের তত্ত্বাবধানে তাঁর জীবন হেলে-দুলে ব'য়ে চললো শরতের দিনে মৃদু হাওয়ায় ছিপছিপে একটি ডিঙিনৌকোর মতো।

কারো-কারো ভাগ্যে একাধিক জুটে যায়, কিন্তু আমি যে বাংলাদেশে জ'ন্মেও একটিও বৌদি পাইনি, এ থেকেই আমার বোঝা উচিত ছিলো যে বঙ্গলক্ষ্মী আমাকে জন্ম দিয়ে থাকলেও কোলে রাখতে উৎসুক নন। বাঙালি সমাজের এই একটি প্রতিষ্ঠান বিষয়ে (এখনো কি তার অস্তিত্ব আছে?) আমি শুধু গল্প শুনেছি ও গল্প পড়েছি: বৌদি—প্রথম যৌবনে প্রথম নারীর আবির্ভাব, সমবয়সী কোনো নারী, যে স্নেহে, কৌতুকে, আহ্বানে ও আঘাতে জাগিয়ে তোলে পৌরুষ ও প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, দেয় এমন এক প্রেম যাতে প্রণয়ের আমোদ আছে কিন্তু বিপদ নেই, দৈহিক উদ্দীপনা আছে কিন্তু তৃপ্তির সম্ভাবনা নেই, আছে মান, অভিমান ও অনুরাগের বিস্তীর্ণ বীথিকা, কিন্তু সেই বীথিকার শেষে কোনো গোপন ছায়াঘন নিকুঞ্জ নেই। বাঙালির জীবনে বৌদিরাই ছিলেন প্রেমের প্রথম শিক্ষয়িত্রী, নাটক শুরু হবার আগে রিহার্সেল চালাতেন তাঁরা; আর তারই ফলে, বিদ্যার্থীর দ্রুত উন্নতি লক্ষ ক'রে, তাঁরাই সবচেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়তেন দেবরদুলালকে জীবনসঙ্গিনী জুটিয়ে দেবার জন্য। রাধাকান্তর বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হ'লো না; ছিপছিপে ডিঙিটিকে

মালবোঝাই ঘাসি নৌকোয় পরিণত করার চেষ্টায় আমার বড়দির উদ্যম প্রখর হ'য়ে উঠলো।

স্বাধীন উপার্জন না-করা পর্যন্ত পুরুষ বিয়ে করার অযোগ্য থাকে, এমন কথা সে-কালে কেউ ভাবতেন না। বরং চলতি ধারণা ছিলো তার উল্টো; বিয়ে ক'রে, দু-একটি সন্তানের পিতা হ'লে, আপ্‌সে আসবে উপার্জনের তাগিদ, এবং তাগিদ এলেই কিছু-না-কিছু উপায় জুটে যাবে। জীবনটা যে ছেলেখেলা নয়, মৎস্যনিধন বা ধ্রুপদসাধনের চেয়েও গুরুতর বিষয়কে যে তা ধারণ করে, এই সহজ সত্যটি বোঝাবার পক্ষে স্ত্রীর মতো বাচস্পতি আর কোথায় পাওয়া যাবে? নিজের পকেটে দুটো-চারটে টাকা থাকা যে কত জরুরি, তা এমন ক'রে কে বোঝাতে পারে যেমন পারে আপন সন্তানকে আদরে-যত্নে মানুষ করার আকাঙ্ক্ষা? এই ধারণাকে একেবারে ভুল বললে ভুল হবে, অনেক সময়ই রীতিমতো কাজ হয়েছে এতে; ছেলে কোনোদিক দিয়ে একটু 'বিগড়ে গেলেই' গুরুজনেরা এই সর্বজ্বরগজসিংহটি প্রয়োগ করতেন। যথাসময়ে ধুমধাম ক'রে রাধাকান্তরও বিয়ে হ'য়ে গেলো।

রাধাকান্তর বয়স তখন কুড়ি; সাঁতার এবং অন্যান্য ব্যায়ামের দ্বারা স্বাস্থ্যটি খুব জোরালো ক'রে তুলেছিলেন ব'লে একটি যোলো বছরের 'বাড়ন্ত গড়নে'র মেয়ে বেছে নেয়া হয়েছিলো তাঁর জন্য। নববধূ স্বর্ণলতাকে নিয়ে বড়দি, আমার মা এবং অন্যান্য মহিলারা আমোদে মেতে উঠলেন, কিন্তু তাঁদের সকলকে নিরাশ ক'রে নতুন বৌ দেড় মাসের মধ্যেই শয্যা নিলেন। তাঁর বেজায় মাথা ঘোরে, কিছু খাবার কথা ভাবলেই নিষ্ঠুরভাবে বমি পায়, এবং জোর ক'রে কিছু খেলে অম্বলের জ্বালায় সারা রাত তিনি ঘুমোতে পারেন না। ব্যাপারটা কী, তা বুঝে নিতে মহিলাদের তিন সেকেণ্ড সময় লাগলো না; যাঁরা সাত-আটবার অবলীলাক্রমে প্রকৃতির অভিসন্ধি পূরণ ক'রেও ক্লান্ত হননি এমন কোনো-কোনো বর্ষীয়সী রীতিমতো ক্ষুব্ধ হলেন এই ব্যাপারে: বৌটি তো দেখতে-শুনতে স্বাস্থ্যবতী, অথচ নারীর এই প্রধানতম কর্মসাধনে যথোচিত সক্ষম নয় কেন—কেউ ঠোঁট উল্টিয়ে বললেন, 'ন্যাকামি', কেউ বা

রাধাকান্তর দুর্ভাগ্যে সমবেদনা প্রকাশ করলেন। প্রণয়ের ভালোমতো সূত্রপাত হবার আগেই তাতে বাধা পড়লো ব'লে রাধাকান্ত কতদূর ব্যথিত হলেন ঠিক বোঝা গেলো না, পিতৃত্বের সম্ভাবনায় পুলকিতও দেখা গেলো না তাঁকে; ঠিক আগের মতোই নানা ব্যসনে সময় কেটে যাচ্ছে তাঁর, উপরন্তু হঠাৎ কর্নেট বাজানো শিখছেন। স্বর্ণলতাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন আমার বড়দি; মা ঝাল, টক, মিষ্টি মিশিয়ে নানাবিধ আচার ইত্যাদি তৈরি ক'রে পাঠান, রোজ একবার ফুরসৎ ক'রে দেখে আসেন তাকে, খুঁটে-খুঁটে জিগেস করেন কেমন লাগছে, কিছু খেতে ইচ্ছে করে কিনা। তিন মাসে প'ড়ে একটু সামলে উঠলো স্বর্ণলতা, উঠে-হেঁটে বেড়াতে পারে; কিন্তু দেহে একটু বল পাওয়ামাত্র নিজের মা-র কথা দুঃসহভাবে মনে পড়ছে তার; একটু নিরিবিলি পেলেই ব'সে-ব'সে পড়ে মায়ের চিঠিগুলো, আর ঝরঝর ক'রে ছেলেমানুষের মতো কাঁদে।

আগেই বলেছি, বড়দির শ্বশুরবাড়ি অনগ্রসর নয়; কিছুদিনের জন্য বৌকে বাপের বাড়ি পাঠানো স্থির হ'লো। বাপের বাড়ি থেকে সাড়ম্বরে কেউ নিতে আসবে, এ-সব লৌকিকতারও অপেক্ষা করলেন না তাঁরা; রাধাকান্তই স্ত্রীকে পৌঁছিয়ে দিতে চাঁদপুর পর্যন্ত গেলেন, এবং শ্বশুরবাড়িতে হপ্তাখানেক কাটিয়ে যখন ফিরে এলেন, সকলেই তাঁর মধ্যে একটু পরিবর্তন লক্ষ করলে। কেমন আনমনা ভাব, নাটক করায় তেমন আর উৎসাহ নেই; মাছ ধরার বদলে এমনি চুপচাপ ব'সে থাকে পুকুর-পাড়ে গাছের ছায়ায়, দুপুরবেলায় শুয়ে-শুয়ে উপন্যাস পড়ে, আর অনেক রাত পর্যন্ত আলো জেলে ব'সে চিঠি লেখে। বিরহাবস্থার চিরাচরিত এ-সব লক্ষণ দেখে বড়দি মনে-মনে খুব খুশি হলেন—এবার ফাঁদে পা দিয়েছে বাছাধন, আর বেশিদিন হেসে-খেলে বেড়াতে হচ্ছে না।

মায়ের কাছে মাসতিনেক কাটিয়ে, স্বামীর হৃদয়ে ভালোবাসার সমুদ্র উথলে তুলে, স্বর্ণলতা বরিশালে ফিরে এলো। আর এবার রাধাকান্তর এমন অবস্থা যে বৌকে পলকে চোখে হারায়, লজ্জা-শরম কাটিয়ে প্রায় সব সময়

ঘুরঘুর করে অন্তঃপুরে। আর এই সময়ে স্বর্ণলতারও চেহারাতে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটছিলো; দিনে-দিনে রীতিমতো রূপসী হ'য়ে উঠছিলো সে। 'স্বামী তো স্বামী, আমরা মেয়েরাই তার প্রেমে প'ড়ে যাচ্ছি।'

'গায়ের রং ফর্শা ছিলো ব'লে স্বর্ণলতা নাম হয়েছিলো তার,' মা-র মুখের কথা আরো কিছু উদ্ধৃত করছি। 'তাপসী তার মায়ের রং পায়নি, কিন্তু মুখের আদল কিছুটা পেয়েছে। ভারি মাসে আরো ফর্শা দেখাতো স্বর্ণকে, রীতিমতো ফুটফুটে ফর্শা, মুখের চামড়া এত পাৎলা যে বালিশে গাল রেখে শুলে লাল হ'য়ে ওঠে—আর এই রংটিকে আরো বেশি ফুটিয়ে তোলে তার চুল, পৌষের কাকের মতো কালো আর চিকচিকে, ঢেউ খেলিয়ে পিঠ বেয়ে নেমে বেচারাকে বিব্রত ক'রে তোলে—কিন্তু বিনু আর আমি রোজ বিকেলে সাড়ম্বরে তার খোঁপা বেঁধে দিয়ে তার "চুলের বোঝা" হালকা ক'রে দিই। দেহটি আরো ভ'রে উঠেছিলো এই সময়ে, অন্য কেউ হ'লে মোটা দেখাতো—কিন্তু স্বর্ণকে বেমানান লাগেনি কখনো, আমরা মেয়েরা বলাবলি করতুম যে ওর শিশুটি ছোটো হবে, আগে যতই কষ্ট পেয়ে থাক প্রসবের সময় ভয় নেই। অথচ মাঝে-মাঝে তার চোখে ভয় ফুটে ওঠে, কোনো মেয়েই প্রথম বারে ঐ ভাবটি এড়াতে পারে না—আবার কখনো তাতে দেখতে পাই এক নতুন রকমের স্নিগ্ধতা, যখন ছোটো-ছোটো কাঁথা সেলাই করে ব'সে-ব'সে, শান্ত হ'য়ে, চুপচাপ দুপুরবেলায়। ঠিক চোখে নয়, সারা মুখে, এমনকি সারা শরীরে এক স্নিগ্ধতা—ওর চোখ তেমন সুন্দর ছিলো না, একটু ছোটো, দূরে-দূরে বসানো চোখ—সে-চোখে যেন তার মনের ভাবটি পুরোপুরি ভেসে উঠতে পারতো না। কিন্তু এই অভাবটুকু পুষিয়ে দিতো তার হাসি, যে-হাসি শুধু ঠোঁটের ছিলো না, ছিলো তার সারা মুখের, যার প্রকাশ ছিলো ঠোঁটের কোনো রেখাতে নয়, ওর মুখের নিজস্ব কমনীয় ভাবটুকুতে, যা ঠিক চোখে না-দেখেও মনে-মনে বোঝা যেতো। তপু তার বাবার চোখ পেয়েছে, ঐ রকমই কাজলের মতো কালো আর ভাসা-ভাসা চোখ ছিলো রাধাকান্তর।'

যা লেখা হ'লো তা হুবহু মা-র মুখের কথা নিশ্চয়ই নয়, একসঙ্গে

একটানাও তিনি এতগুলো কথা হয়তো বলেননি। নানা সময়ে, একটু-একটু ক'রে, তাপসীর পূর্ব ইতিহাস তিনি আমাকে বলেছিলেন, তখন খুব মন দিয়ে শুনিওনি, কিন্তু এখন দেখছি সবই মনে আছে।

এক শীতের সন্ধ্যায়, মাত্র ছ-ঘণ্টার প্রসববেদনার পর, স্বর্ণলতা একটি কন্যা-সন্তানের জন্ম দিলে। সুস্থ, সবল, সুন্দর সন্তান, মা-রও উঠে দাঁড়াতে বেশি দেরি হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ কী যে হ'লো, পনেরো দিনের আঁতুড়ে ধুম জ্বর এলো তার। সোমেশ্বররা অনগ্রসর না-হ'লেও তখন পর্যন্ত এত বেশি অগ্রসর হননি যে বাড়ির বৌ-ঝিদের প্রসবের জন্য পুরুষ-ডাক্তার ডাকবেন, বা তার ব্যবস্থা করাবেন কোঠাবাড়ির অন্দরমহলে। তখনকার নিয়মমাফিক আলাদা আঁতুড়-ঘর ছিলো তাঁদের, বাড়িতে বাঁধা ছিলো অভিজ্ঞ বুড়ি দাই—যে অন্তত একশো মেয়েকে প্রসব করিয়েছে। গোলপাতার কুঁড়েঘর নয়, প্রসূতিকে স্যাঁৎসেঁতে মেঝেতে শুইয়ে রাখা হয় না; মজবুত টিনের ঘরে তক্তাপোশে ভালো বিছানা পাতা; প্রসূতিকে পচা পুকুরে ডুবিয়ে আনার চল নেই সে-বাড়িতে, দরজা-বন্ধ ঘরে গরম জলে স্নান করানো হয়, খাবারের থালায় মাছের পেটি দুধের বাটির অভাব ঘটে না। অথচ কী ক'রে ও-রকম হ'লো? হয়তো দাইয়ের কোনো অসতর্কতা, হয়তো কাঁচা নাড়িতে স্নানটাই সহ্য হয়নি, যে-নারী সন্তানের জন্ম দিচ্ছে সে 'অপবিত্র', এই পাপিষ্ঠ ধারণার জন্যেই শাস্তি হয়তো। শাস্তিটা কেন স্বর্ণলতাকেই পেতে হ'লো সে-কথা তুলে লাভ নেই; ঠিক কী কারণে তার স্বাস্থ্যের উপর বীভৎস রাহাজানি ঘ'টে গেলো সে-প্রশ্নও অবান্তর; কথাটা এই যে দেড় মাস পরেও সে যখন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলে না তখন বোঝা গেলো তাকে সূতিকায় ধরেছে।

'রাক্ষসী সূতিকা'। মা-র মুখে, কি আমাদের ঢাকার বাড়িতে মাঝে-মাঝে বেড়াতে-আসা কোনো-কোনো বর্ষীয়সীর মুখে, কথাটা উচ্চারিত হ'তে শুনেছি। কথাটা চাপা গলায় বেরোতো তাঁদের মুখ থেকে, আতঙ্কের সুরে, মৃত্যুর কথা উঠলে যেমন হয় তেমনি গম্ভীর সম্ভ্রমের গলায়। সূতিকার রোগিণী চার-

পাঁচজন পর্যন্ত দেখেছেন কেউ-কেউ, কিন্তু কী দেখেছেন তা যেন স্মরণে আনতেও ইচ্ছুক নন।

আমি, নীলাঞ্জন দে, পঁচিশ বছরের প্রবাসী, এই খাঁটি বাঙালি ও খাঁটি মেয়েলি যমদূতটিকে চাক্ষুষ দেখিনি কখনো, শুধু মা-র মুখে স্বর্ণলতার কথা একদিন শুনেছিলাম। দৈবাৎ উঠেছিলো কথাটা, একেবারে অপ্রাসঙ্গিকভাবে, এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিলো না, কিন্তু কী জানি কেন মা একটা ছোট্ট বর্ণনা দিয়েছিলেন আমাকে, স্বর্ণলতার শেষ অবস্থা তা-ই থেকে আমার মনে আঁকা হ'য়ে গেছে। সেদিন ঘরে আর-কেউ ছিলো না, বলতে মা-র মিনিট পাঁচেকের বেশি সময় লাগেনি, এবং এর আগে কিংবা পরে এ-বিষয়ে দূরতম উল্লেখও শুনিনি মা-র মুখে। অথচ আমার এত স্পষ্ট মনে আছে যেন আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম।

সূতিকা বড়ো দীর্ঘসূত্রী অসুখ; এক বছর দেড় বছর পর্যন্ত জীইয়ে রেখে তিলে-তিলে ধ্বংস করে। গ'লে যায় মেদ, ঝ'রে যায় মাংস, মজ্জা শুকিয়ে যায়, দেহে একতিল বল থাকে না, তবু প্রাণটুকু ধুকধুক করে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, চুপ ক'রে প'ড়ে থাকতে হয়,—শুধু অপেক্ষায়, মৃত্যুর অপেক্ষায়, যে-মৃত্যু নিশ্চিতই আসবে অথচ কবে আসবে তা নিশ্চিত ব'লে দেয় না। বলা যেতে পারে যে মানুষের সাধারণ অবস্থাই এই; কিন্তু সাধারণত মানুষ আরো কুড়ি, তিরিশ, পঞ্চাশ বছরের মেয়াদ আশা করতে পারে—যার অর্থ প্রায় এই দাঁড়ায় যে মৃত্যুকে ভুলে থাকা সম্ভব; সত্তর বছরের বৃদ্ধও তাকাতে পারে আরো দশ বছরের দিকে—দ শ ব ছ র, প্রায় অনন্তকাল, ছেলের বাড়ি তেতলা হবে ততদিনে, নাৎনির বিয়ে দেখে যেতে পারবো। আছে কোনো আশা বা ইচ্ছা, যার জন্য বেঁচে থাকার অর্থ হয়, সর্বদাই কিছু-না-কিছু আছে। কিন্তু ডাক্তার যাকে জবাব দিয়েছে, যার পক্ষে ব্যাপারটা আর [illegible]নের, তার পক্ষে কী এসে যায় সেই [illegible]য়েকদিন টেনে-টুনে কয়েক মাসে [illegible] হ'লে, কোনো আশা নেই তার, দাঁড়াবার জায়গা নেই কোথাও; কী এসে যায় তার

যদি এখনো তাকে ভালোবেসে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে পৃথিবীর কোনো-কোনো মানুষ ; কী এসে যায়, যদি তার শিশু কন্যার সরল আর উজ্জ্বল চোখ মাঝে-মাঝে চুম্বকের মতো টানে তাকে ?—মৃত্যুকে অত কাছাকাছি জেনেও কেমন ক'রে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে দিনের পর দিন ? আশ্চর্য—জীবনের পক্ষে সবই সম্ভব।

ইতিমধ্যে বাবা বদলি হলেন পটুয়াখালিতে, রুগ্ন স্বর্ণলতাকে ত্যাগ ক'রে মা-কে স্টীমারে উঠতে হ'লো। মাস পাঁচেক পরে বড়দির চিঠি পেলেন—'ওকে শেষ একবার দেখতে চাও তো এখনই এসো।' বাবার ছুটি ছিলো না, একটি বিশ্বাসী লোক সঙ্গে নিয়ে মা পরের দিনই বরিশালে পৌঁছলেন। পাঁচ মাস আগে স্বর্ণলতাকে শেষ যখন দেখেছিলেন, তখনও সে মানুষ ছিলো—রোগা, ফ্যাকাশে, দুর্বল, অক্ষম, কিন্তু নির্ভুলভাবে মানুষ ; কিন্তু এখন—মা-র মনে হ'লো—সে ইট কাঠ পাথরের মতো একটা জিনিশ হ'য়ে গেছে—নেহাৎই একটা জিনিশ, কিন্তু জীবন্ত। ও-রকম দৃশ্য মা-কে কখনো দেখতে হবে তা তিনি কল্পনাও করেননি।

ছোট্ট একটি কঙ্কালকে শুইয়ে রাখা হয়েছে বিছানায়। মাংসের শেষ কণাটুকু পর্যন্ত ক্ষ'য়ে গেছে, হাড়ের উপর চামড়ার আবরণ ঢলঢল ক'রে ঝুলছে, বয়স বোঝার উপায় নেই, পুরুষ না নারী তাও বোঝা অসম্ভব। মাথা ন্যাড়া, তক্তার মতো সমতল বুক, উলঙ্গ দেহে গলা থেকে পেট পর্যন্ত গঙ্গামাটির প্রলেপ লাগানো, শুধু বুকে আর কোমরের কাছে (নেহাৎই শোভনতার খাতিরে) দুই টুকরো ন্যাকড়া আঁটা রয়েছে। এই জিনিশটি নিশ্বাস নিচ্ছে, তাকিয়ে আছে, এমনকি কলের পুতুলের মতো চিঁচিঁ ক'রে আওয়াজও দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। পেটের খাঁজটা ডুবে গেছে গভীরে, যেখানে গাল ছিলো সেখানে গর্ত মনে হয়, দাঁতের সারি উঁচু আর হলদে হ'য়ে বেরিয়ে আছে, মুখটা কুঁকড়ে গেছে ব'লে চোখ দুটি আগের চেয়ে বড়ো দেখায়। আর—সবচেয়ে যা আশ্চর্য ও ভয়ানক—সেই চোখ বুজে নেই, অর্থহীন বা নিষ্প্রভ হ'য়েও নেই ; হাসপাতালে শিশুদের ওয়ার্ডে কোনো-কোনো মরণাপন্ন, মা-বাবার-

সান্নিধ্য-ছাড়ানো শিশুর চোখ রাত বারোটার ঝিমোনো আলোয় যেমন একাগ্র আর অ[illegible]ভাবে শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, তেমনি দৃষ্টি সেই চোখ দুটিতে। সর্বশেষ প্রাণশক্তিটুকু সারা শরীর থেকে বিতাড়িত হ'য়ে শেষ মুহূর্তে চোখের মধ্যে সংহত হ'য়ে আছে যেন। জ্ঞান তার পুরোপুরি আছে, কী হচ্ছে তার নিজের মধ্যে এবং চারদিকে সব বুঝতে পারছে, এক-এক সময় কাঠির মতো একটি পা নাড়ছে একটু, কপালে মাছি বসলে কঞ্চির মতো হাত তুলে তাড়াবারও চেষ্টা করছে। বড়দি পাশে ব'সে সলতে ভিজিয়ে-ভিজিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল দিচ্ছেন তার মুখে, তার মা হাওয়া দিচ্ছেন মাথায় আর মাঝে-মাঝে নিঃশব্দে কাঁদছেন। আপাতত যেন শান্তিতেই আছে স্বর্ণলতা, কোনো উদ্বেগ নেই।

আমার মা-কে দেখে চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিলে যে চিনতে পেরেছে। কিসের একটা চেষ্টা শুরু হ'লো তার গলার কাছে, ঠোঁট দুটি ক্ষীণভাবে কেঁপে উঠলো, ছুঁচের মতো সরু একটা আওয়াজ হ'লো। বড়দি তার কথা বুঝতে পেরে উঠে গেলেন, একটু পরে এক বছরের তাপসীকে কোলে ক'রে ফিরে এলেন।

অসুখের এই এক বছর ধ'রে সন্তানের বিষয়ে স্বর্ণলতার উৎসাহ কখনো ঝিমিয়ে পড়েনি। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে নাম রেখেছে মেয়ের, তাকে পাশে শুইয়ে সেই সব আবোলতাবোল বিশ্বজনীন ভাষায় আদর করেছে যা জগতের মায়েরা ছাড়া আর-কেউ জানে না, কলকাতার বিলেতি দোকানের ক্যাটালগ আনিয়ে পঞ্চাশ রকম পেনি-ফ্রকের ছাঁটকাট দেখেছে। হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছিলো শেলাইয়ের কল কিনবে, স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'লেই তার ঐ কথাটা তোলা চাই—'দেখেছো, কী-রকম সব নতুন ছাঁটকাট, আমি সব শিখে নিতে পারবো—আমাকে একটা শেলাইয়ের কল কিনে দেবে? ...কত দাম? ...বাবাকে লিখি? না, এক কাজ করো, আমার তো অনেক গয়না আছে—একটা, ছোট্ট একটা বেচে দিলে কী হয়, তপুর তাতে কম পড়বে না, আর তপু বড়ো হ'তে-হ'তে আরো কত হবে আমাদের—হবে না? অনেক দাম কি

শেলাইয়ের কলের ?' ...অবশেষে কিস্তিবন্দী ব্যবস্থায় রাধাকান্ত কিনে দিলেন এক শেলাইয়ের কল, কিন্তু সেই কল যখন ঘরে এলো তখন স্বর্ণলতা অনেক দূরে স'রে গেছে।

যতদিন তার ধারণা ছিলো সে সেরে উঠবে ততদিন মেয়েকে কাছে রেখেছে অনেক সময়, কিন্তু যেদিন তার নিজের মনে সত্যটি ধরা পড়লো সেদিন থেকে নিজেই দূরে স'রে গেলো। মেয়েকে খুব কাছে পাবার এমনিও উপায় ছিলো না তার, সে তার খাদ্যের জোগানদার নয়, তার পরিচর্যা কিছুই সে পারে না। আর-এক কথা : অসুখে শুয়ে-শুয়ে সে নিজেকে অলক্ষুনে ব'লে ভাবতে শিখেছিলো—নয়তো কেন এমন হবে যে নিজের সন্তানকে তার বঞ্চিত করতে হ'লো সন্তানের সব-কিছু পাওনা থেকে, সে অলক্ষুনে না-হ'লে তপু কেন তার মা-কে হারাবে ? 'ওকে আসতে দিয়ো না, আসতে দিয়ো না আমার কাছে—আমার গায়ের বাতাস ভালো নয়, ওর তা কিছুতেই সইবে না।' ...অথচ, যখন সে প্রায় 'মানুষের বাইরে' চ'লে গেছে তখনও দিনের মধ্যে তিন-চার বার মেয়েকে তার চোখে দেখা চাই ; বড়দি কোলে নিয়ে এসে দাঁড়ান, সে তাকিয়ে থাকে, এক মিনিট, দু-মিনিট তাকিয়ে থাকে, তারপরেই বলে, 'নিয়ে যাও।' এমনি, দিনের মধ্যে তিন বার কি চার বার।

কিন্তু সেদিন—হয়তো আমার মা-কে দেখার উত্তেজনায়, কি হয়তো মৃত্যুর আগে শেষবারের মতো জীবনকে আঁকড়ে ধরার অদম্য আকাঙ্ক্ষা থেকে, মেয়ের দিকে তার অস্থিসার হাত দুটি সে বাড়িয়ে দিলে। একবার মেয়ের দিকে তাকালো, একবার আমার মা-র দিকে, একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো তার চোখে, যেন প্রায় ফুর্তির মতো, যেন বলতে চায়, 'আমি অবশ্য মরছি, কিছুতেই আর বাঁচবো না, কিন্তু আমার মেয়ে কী সুস্থ আর সুন্দর, দেখেছো !' বড়দি তপুকে তার মা-র কাছে বিছানায় বসিয়ে দিলেন, কিন্তু বিছানায় শুইয়ে-রাখা সেই জিনিশটির দিকে গম্ভীর মুখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তপু হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বড়দির কোলে, বড়দির কাঁধে মুখ গুঁজে এমন শক্ত হ'য়ে থাকলো যে কিছুতেই তাকে আর নড়ানো গেলো না।

তা'র বাড়িয়ে-রাখা হাত দুটি অবশ হ'য়ে প'ড়ে গেলো বিছানায়, তার মুখের যেটুকু বা অবশিষ্ট ছিলো তাও যেন ভেঙে-চুরে দুমড়ে গেলো হঠাৎ, বেড়ালের বাচ্চার মতো মিহি অথচ তীব্র আওয়াজ ক'রে ককিয়ে উঠলো সে, চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জলও পড়লো। কী আশ্চর্য যে তখনও কয়েক ফোঁটা চোখের জল ছিলো তার মধ্যে। দু-মিনিট বা তিন মিনিট ধ'রে কাঁদলো সে—তার পক্ষে অমানুষিক শক্তির কাজ—কিন্তু তার পরে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়ে একবার তাকালো বড়দির মুখে, আর-একবার আমার মা-র মুখের দিকে, হয়তো তার নিজের মা-কেও খুঁজলো, তিনি তক্ষুনি তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়লেন। অমনি তিন-চার বার ঘুরে-ঘুরে তাকিয়ে তার শেষ কথাটি জানিয়ে দিলে সে। পরের দিন উষাকালে তার মৃত্যু হ'লো।

বরিশালে যখন গিয়েছিলাম তখন এ-সব কথা কিছুই জানতাম না। পরে, তাপসী যখন ঢাকায় আমাদের কাছে থাকতে এলো, আর মা আমাকে অল্প-অল্প ক'রে তার মা-র কথা অনেক বললেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে তাপসী সেই মেয়েটি, যে আমাকে জিগেস করেছিলো যে আমার আরো জল চাই কিনা। টাক-পড়া, শামলা রং, বড়ো-বড়ো টলটলে চোখের এক ভদ্রলোককে আমি লক্ষ করেছিলাম বিয়ে-বাড়িতে, তাঁর সঙ্গে বড়দির কিছু কথাবার্তার মধ্যে তাপসীর আর আমার মা-র নাম উচ্চারিত হ'তেও শুনেছিলাম, কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারিনি যে ভদ্রলোকটি তাপসীর বাবা এবং তাকে আমার মা-র কাছে ঢাকায় পাঠাবার কথা হচ্ছে। অন্যমনস্ক ছিলাম, অমনোযোগী ছিলাম, বন্ধুদের সঙ্গে অসার আড্ডা আর সাহিত্যচর্চায় সময় কাটিয়েছি—তাই বুঝতে পারিনি। কত দেরিতে জীবনকে মূল্য দিতে শিখি আমরা, যৌবনের স্পর্ধায় কত অবহেলা করি জগৎকে, কত বছর কেটে যায় শুধু এই কথাটি বুঝতে যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের চেয়ে কিছুই বড়ো নয়—কিছু না, কিছুই না!—কিন্তু আক্ষেপ ক'রেও লাভ নেই, এ-ই জীবনের নিয়ম।—কিন্তু যখন মূল্য দিতে শিখি, তখন কি আরো বেশি ক'রে

সেই একবারই তাপসীর বাবাকে আমি চোখে দেখে৷ [illegible]। জীবন ভ'রে আমি চেষ্টা করেছি অনুশোচনাকে প্রশ্রয় না-দিতে, কিন্তু এই খাতাটায় লিখতে-লিখতে একটি ছোট্ট অনুশোচনা আমার মনে উঁকি দিচ্ছে—রাধাকান্তর বিষয়ে আর-একটু অনুসন্ধিৎসা সেই সময়ে আমার জাগেনি কেন। কী-রকম কথা হ'তো পিতার সঙ্গে কন্যার—যদি আদৌ কোনো বাক্যবিনিময় করতেন তাঁরা—কেমন ক'রে কথা হ'তো, কী বিষয়ে, কী ভঙ্গিতে? বাবা—অথচ মেয়ের প্রায় অপরিচিত; মেয়ে—অথচ রাস্তায় তাকে দেখলে বাবা চিনতে পারতেন না। প্রায় পনেরো বছর পরে, প্রথম ভাইঝির বিয়ে উপলক্ষে, রাধাকান্ত সেবার বরিশালে এসেছিলেন। স্বর্ণলতার সোনার কান্তির কল্পনাতীত পরিণাম দেখে তাঁর মনে গভীর বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিলো। আমি একে 'শ্মশান-বৈরাগ্য' নাম দিয়ে উপহাস করতে রাজি নই; কেননা মৃত্যুর যদি এটুকু দাবি না থাকে জীবনের উপর যে একবার তার সান্নিধ্যে এলে, অন্তত কিছুদিনের জন্য, চেতনার কোনো গভীরতর আহ্বান আমরা শুনতে পাবো, কোনো পাতালের কলরোল, কোনো স্তবগানের প্রতিধ্বনি—মৃত্যুর যদি এটুকুও দাবি না থাকে আমাদের উপর তাহ'লে তো মানুষের আর পশুর জীবনে তফাৎ থাকে না। রাধাকান্ত, তাঁর আগে আরো অনেকের মতো, স্ত্রীর মৃত্যুর পরে বিবাগি হলেন, সত্য সাধুর খোঁজ ক'রে-ক'রে ঘুরে বেড়ালেন হরিদ্বার থেকে শ্রীহট্ট পর্যন্ত; একবার, শোনা যায়, উড়িষ্যার অরণ্যে সত্যি দেখা পেয়েছিলেন এক পরাক্রান্ত ভীমদর্শন তা৷ [illegible]কের, ছ-মাস ধ'রে তাঁর সেবা ক'রে, বিবিধ তীব্র নেশার প্রভাবে কখনো অজ্ঞান কখনো প্রায় পাগল হ'য়ে গিয়ে, গুরুর জন্য পা[illegible]গাঁয়ের শ্মশান থেকে অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ পর্যন্ত সংগ্রহ ক'রে এনে—[illegible] নাকি এক গুহার মধ্যে গোধূলি-লগ্নে সাধনায় ব'সে উষার প্রাক্কালে 'প্রায়' দেখা পেয়ে[illegible]লেন তাঁর মৃতা স্ত্রীর, যেমন সে ছিলো বিয়ের রাত্রে, তেমনি সুস্থ, সম্পূর্ণ, সলজ্জ ও সুন্দর। কিন্তু এই ব্যাপারে 'প্রায়' কথাটার আসল অর্থ 'শূন্য'—অস্তিত্ব এমনি নিষ্ঠুর যে তা হয় আছে নয়তো নেই, [illegible] যদি বা কিছু থাকে তা [illegible] পক্ষে

সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অতএব বছর দুয়েকের পরিব্রজ্যার পরে রাধাকান্ত এক মাথা ঝাঁকড়া চুল নিয়ে দাদাদের আশ্রয়ে ফিরে এলেন, বৌদিরা আবার হৈ-চৈ শুরু করলেন তাঁকে নিয়ে, কিন্তু বোঠানদের মমতা আর তাঁকে বাঁধতে পারলে না। দাদাদের কাছে প্রস্তাব করলেন তাঁর অংশের জমিজমা আর বাড়ি-ঘরদোর তাঁরা কিনে নিন; তিনি টাকা নিয়ে কিছু-একটা ব্যবসা করবেন। সোমেশ্বর খুব আপত্তি করলেন এতে, কিন্তু অন্য দুই দাদা লুব্ধ হলেন। টাকা নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন রাধাকান্ত, সিলেটে এসে মনোহারি দোকান খুলে বসলেন।

হঠাৎ সিলেটে কেন? কারণ: সিলেটে আছে বরিশালের মতোই মস্ত নদী, নিবিড় গাছপালা সবুজ, এদিকে এক শিক্ষিত সমাজ, যারা স্বদেশী ক'রে জেলে গেছে বা যেতে চাচ্ছে আর যারা রবীন্দ্র-সংগীতের মোহে প'ড়ে ধ্রুবপদ বিস্মৃত হয়নি। আসল কথা, রাধাকান্তর ভালো লেগেছিলো জায়গাটা, ভালো লাগার আরো একটু সূত্রও হয়তো ছিলো। সিলেটে তিনি প্রথম গিয়েছিলেন এক সন্ন্যাসীর চেলা হ'য়ে; নানা গৃহে এবং গৃহের অন্দরে ডাক পড়েছিলো তখন; এক বাড়িতে এক ভক্তিমতী বৃদ্ধা তাঁকে আড়ালে ডেকে আলাপ করেছিলেন। স্বামী-পুত্র কেউ নেই; আছে গলার কাঁটা আর চোখের মণি এক মা-বাপ-মরা নাৎনি, আর অল্প কিছু টাকা, যা ঐ নাৎনির বিয়েতেই তিনি খরচ করবেন। 'তারপর নাৎ-জামাই আমাকে দু-মুঠো খেতে দেয় তো ভালো, নয়তো কোনো তীর্থে গিয়ে পথের ধারে প'ড়ে থাকবো, কিন্তু মেয়েটার গতি না-ক'রে তো মরতে পারিনে, বাবা।' এই তরুণ গেরুয়াধারীর পূর্ব-ইতিহাস খুঁটে-খুঁটে জেনে নিয়ে বললেন (রাধাকান্ত, ধ'রে নিতে হবে, খুব অনিচ্ছায় উত্তর দেননি)—'বাবা, এই কি তোমার সন্নেসি হবার বয়স? আবার সংসার করো, যা খুঁজে বেড়াচ্ছো তা সেখানেই পাবে, ভগবান যদি শুধু সন্নেসিদের হতেন তাহ'লে অন্য সবাই কী ক'রে বেঁচে থাকতো বলো তো?' এই সরল জ্ঞানের বাণী হঠাৎ খুব নাড়া দিলে রাধাকান্তর মনে; উপরন্তু—তিনি সন্ন্যাসীর চেলা ব'লে—সদ্যবিকশিত নাৎনিটিও তাঁর পক্ষে অদৃশ্য ছিলেন না। প্রকৃতির

প্রতারণা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েও, দ্বিতীয়বার তার ফাঁদে তিনি ধরা দিলেন ; গেরুয়াহীন অবস্থায় সিলেটে ফিরে আসার দু-মাসের মধ্যে শুভকর্ম সমাধা হ'য়ে গেলো। স্ত্রীর ভাগ্যে মনোহারি দোকান ফেঁপে উঠলো, পাঁচ বছর পরে—দিদিশাশুড়ি যেবার নাৎজামাইয়ের প্রচুর আপ্যায়ন ভোগ করার পর সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করলেন—একটা বিলেতি মদের দোকান কিনে নিলেন খদ্দেরবহুল চা-বাগানের পাড়ায়, এখন তাঁর চারখানা লরি চলে সিলেট-শিলঙের রাস্তায়, ভাইঝির বিয়েতে কম-সে-কম হাজার টাকা সাহায্য করেছেন।

এ-সব কথা মা-র মুখেই আমি শুনেছিলাম, এবং তিনি শুনেছিলেন অন্যদের মুখে। হয়তো এর মধ্যে কিছু কাল্পনিক, আর অতিরঞ্জন খানিকটা তো থাকতেই পারে। রাধাকান্ত ছিলেন প্রথম থেকেই বাড়ির মধ্যে একটু খাপছাড়া, ঠিক 'অন্যদের মতো' নন তিনি, তাঁর বিষয়ে যে-কোনো গল্পই যেন মানিয়ে যায়। এই যে তিনি পনেরো বছরের মধ্যে একবারও আর দেশে আসেননি—যেখানে আছে তাঁর পারিবারিক শাখা-প্রশাখা আর সর্বোপরি তাঁর আত্মজা কন্যা—এটা কি একটু অদ্ভুত নয় ? আর পনেরো বছর যদি না-এসে কাটানো গেলো তাহ'লে বাকি জীবনও কি না-এসে পারা যেতো না, ঐ সমস্ত সংস্রব থেকে একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যাবার বাধা ছিলো কী ?—কিন্তু না—সবচেয়ে মজার কথাটা এই যে মানুষ চ'লে যায় কিন্তু ফিরে আসে, হয়তো অনেক, অনেকদিন পরে, কোনো-না-কোনো এক সময়ে, ফিরে তাকেই আসতেই হবে, হয়তো বা মুহূর্তের জন্যই, কিন্তু সেই মুহূর্তটিতেই কোনো-এক পূর্ণতা প্রচ্ছন্ন থাকে। জীবনটা জ্যামিতিক সরল রেখায় চলে না, এঁকে-বেঁকে ঘুরে-ঘুরে চলে, হঠাৎ কোন মোড় ঘুরে আবার কোন পিছনে-ফেলে-আসাকে আমরা দেখতে পাবো, তা কি আমরা নিজেরাই জানি ? অপরাধ-বিজ্ঞানীরা ব'লে থাকেন যে-মানুষ হত্যা করে সে তার হত্যার ঘটনাস্থলটি আর-একবার দেখতে চায়—আর-একবার দেখতে না-এসেই নাকি পারে না ; তেমনি প্রত্যেক মানুষই চায় তার শৈশব-যৌবনের লীলাস্থলে আর-একবার ফিরে যেতে—যতই সে 'বড়ো' হ'য়ে থাক ইতিমধ্যে, যত বিরাট হোক তার 'ব্যস্ততা'—

আর-একবার না-এসে সে পারে না—আর অমনি ক'রে, হত্যাকারীর মতো, সে-ও 'ধরা প'ড়ে' যায়। হয়তো আমিও একবার ফিরে যাবো, বাংলাদেশে আর-একবার আমাকে যেতেই হবে।

(কিন্তু এমনি ভবঘুরে হ'য়েই কি সারা জীবন তুমি কাটিয়ে দেবে, নীলাঞ্জন? বিবিধ যানে, এক নগর থেকে অন্য নগরে, চলতে-চলতে হঠাৎ এক সঙ্গিনীকে কুড়িয়ে এবং ছেড়ে দিয়ে, কমিটিতে ব'সে, রিপোর্ট লিখে, তিনটে বিদেশী ভাষায় বড়ো-বড়ো বুলি আউড়িয়ে—আর 'পৃথিবীর উপকার' ক'রে—হায় রে উপকার! চারটে স্যুট, আধ-ডজন ওজনহীন নাইলন শার্ট, স্যুটকেস তৈরি, হাতব্যাগে আনকোরা দু-খানা বই। বেশি কথা কী, এতদিনের জীবনে কয়েক শো বই পর্যন্ত জমেনি তোমার—কেনো, পড়ো আর যেখানে-সেখানে বিলিয়ে দাও, কেননা ভারি বই নিয়ে ভ্রমণ চলে না! মূর্খের মতো নতুন বই পড়ছো সব সময়, নতুন বই, নানা 'বিষয়ে'র বই—যাতে দরকার হ'লে অ্যাটমিক এনার্জি নিয়েও বক্তৃতা করতে পারো—ভেবে গ্যাখো, কত নিচে তুমি নেমেছো, কত নিচে, নীলাঞ্জন! কোনো পাতাল পর্যন্ত হাঁ ক'রে নেই তোমার জন্য, কোনো পাপ করার গৌরবটুকু পর্যন্ত নেই তোমার—তুমি হ'য়ে উঠেছো ছিপছিপে, চকচকে, পালিশ-করা, সবজান্তা, বিশ-শতকের আনকোরা কুৎসিত আধুনিক—কোথাও এক ফোঁটা শ্যাওলা নেই তোমার দেহে-মনে, নেই পাথরের তলায় জমিয়ে-রাখা কোনো ঠাণ্ডা গন্ধ, নেই পাথরের তলায় তিরতির-ক'রে-ব'য়ে-চলা কোনো ফোঁটা-ফোঁটা জল। ছেলেবেলায় যাকে তুমি ঘৃণা করতে, সেই মনোতোষ মিত্রের একটি রাজ-সংস্করণ হ'য়ে উঠেছো তুমি!…নেই? শ্যাওলা নেই? জ'মে-থাকা ঠাণ্ডা, পুরোনো গন্ধ নেই? তাহ'লে এই পাতাগুলো আজ লিখছি কেন? না—নিজের উপর অবিচার করা অন্যের উপর অবিচারের মতোই অন্যায়; অন্তত এটুকু স্বীকৃত হোক যে মনোতোষ জানতো না সে জন্ম থেকেই পচা, আর আমি প্রতি মুহূর্তে জানি আমি আস্তে-আস্তে প'চে যাচ্ছি।)

আর, অবশ্য, আর-একটা কারণ অনুমান করা যায়—সেবারে রাধাকান্তর

বরিশালে আসার কথা বলছি। হাজার হোক, মেয়ে তো নিজেরই, এতদিনে বড়ো হয়েছে, একবার চোখে দেখতে কি ইচ্ছে করে না? মমতা না থাক মমত্ববোধ থাকতে বাধা কী, আসক্তি না থাক কৌতূহল, স্নেহ না থাক দায়িত্বজ্ঞান? পিতার স্নেহ কোনো স্বাভাবিক বা জৈব পদার্থ নয়, তা জ্ঞানের ফল, অভ্যাসের ফল, একসঙ্গে বসবাস থেকে তার জন্ম ও ক্রমবিকাশ; যে-পিতা দৈবদোষে প্রায় সন্তানের জন্মকাল থেকেই তার সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তাঁর কাছে তা আশা করাই অন্যায়। কিন্তু তবু, বাংলায় যাকে বলে 'রক্তের টান', সেই আদিম, গ্রাম্য ও বর্বর অনুভূতিটিও কম জোরালো নয়; কত দেখা যায় সারা যৌবন ছড়িয়ে-পুড়িয়ে খাক ক'রে দেবার পর পড়তি বয়সে দুর্দান্ত পুরুষ কোনো-এক ভাইঝির চিত্তবিনোদনের জন্য হামা দিয়ে হেট-হেট ঘোড়া ব'নে গেছে, বা আমারই মতো কোনো বাউণ্ডুলে বুড়ো বয়সে করুণভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় কোন 'আত্মীয়' আছে তার। 'আত্মীয় ব'লে আলাদা কিছু মানি না, যাকে ভালো লাগে সেই আমার আত্মীয়—' এই কথাটা যৌবনের তেজে সকলেই বলতে পারে, কিন্তু বার্ধক্যে কোনো মেয়েকে ভালো লাগলে মনে হয়—'আহা, আমার যদি একটা ছেলে থাকতো এই মেয়েটিকে বৌ ক'রে আনতুম!' এমনি সূক্ষ্ম সমাজের শাসন, এমনি দুর্মর মানুষের অধিকারবোধ।

হয়তো সবই পুরোনো দিনের কথা বলছি, ভারতের কথা, আধুনিক বড়ো জগৎ এ-সব 'ছেলেমানুষি' কাটিয়ে উঠেছে; 'নতুন' ভারতও বদলে যাবে আশা করা যায়। তবু, অন্তত, দায়িত্বজ্ঞানের জন্য পাশ-নম্বর দেয়া যাক রাধাকান্তকে; কেননা বড়দির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা, যাতে আমার মা-র নাম উচ্চারিত হ'তো, তার সারাংশ, পরে বুঝেছিলাম, তাপসীর বিবাহের ব্যবস্থা। এ-সব বিষয়ে আমার মা-র হাতযশ ছিলো, ঢাকার মতো বড়ো শহরে যোগ্য পাত্র খুব বেশি বিরল হবে না—মেয়ের গায়ের রং দেখে বরপক্ষ যদি পেছিয়ে যায় রাধাকান্ত টাকার দ্বারা তাঁদের উৎসাহিত করবেন। খুব আবছা, ভাসা-ভাসাভাবে কথাটা আমার কানে এসেছিলো; পরে ভেবে অবাক হয়েছি যে

তাপসীকে কেউ 'কালো' ব'লে নিন্দে করতে পারে—কিংবা এমন চিন্তাও কারো মনে উদয় হ'তে পারে যে সে ফর্শা, না শ্যামল, না অন্য কিছু। গায়ের রঙের উপর যে-সব মেয়েদের জীবনের কিছুমাত্র নির্ভর করে, কেউ যে তাপসীকেও তাদের দলে ফেলতে পারে, এই চিন্তা আমার কাছে অসহ্য ছিলো। সে ঠিক যা, সেটাই ঠিক; তার বেলায় 'আরো ভালো'র কোনো কথাই ওঠে না।—কিন্তু তাপসী বলেছিলো তার গায়ের রং দেখে তার বাবা খুব নিরাশ হয়েছিলেন।

একদিন—শুধু একদিনই, ঢাকার বাড়ির বারান্দার শানে ব'সে-ব'সে তাপসী তার বাবার কথা বলেছিলো আমাকে, প্রসঙ্গত তার মা-র কথা। মা-কে অবশ্য সে চোখেই দ্যাখেনি, আর বাবাকে সেবার বরিশালে যে-ক'দিন দেখেছিলো, তা থেকেই অনেক-কিছু বুঝে নিয়েছিলো। বুঝেছিলো, তার মধ্যে তার মৃতা মায়ের ছবিকেই খুঁজেছিলেন তার বাবা; চেহারায়, আর বিশেষত গায়ের রঙে—মস্ত গরমিল দেখে রীতিমতো আহত হয়েছিলেন। একদিন দুপুরবেলা তাপসী হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলো; চোখ মেলে দেখলে, খাটের পাশে নিচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে তার মুখের উপর ঝুঁকে আছেন তার বাবা, তাকে নড়তে দেখে হঠাৎ যেন লজ্জা পেয়ে স'রে গেলেন, যেন ধরা প'ড়ে গেছেন চুরি করতে এসে—সেই মুহূর্তে কিছু-একটা বানিয়ে বলার মতো উপস্থিতবুদ্ধিও জোগালো না তাঁর, দ্রুত পিছন ফিরে নিষ্ক্রান্ত হলেন ঘর থেকে। ঘরে আর-কেউ ছিলো না, কতক্ষণ ধ'রে ও-রকম ক'রে দেখছিলেন কে জানে। সে-দিনের বাকি অংশটুকুতে, আর তার পরের দিনও, মেয়েকে কেমন এড়িয়ে-এড়িয়ে চলেছিলেন তিনি; খুব সাধারণ কথাও সহজে বলতে পারেননি। 'এত কাল পরেও আমার মা-কে উনি ভুলতে পারেননি,' এই কথাটা ভেবে তাপসী সেদিন খুশি হয়েছিলো, আবার একটু দুঃখও হয়েছিলো তার চেহারা মায়ের মতো হয়নি ব'লে। 'কালো মেয়ে,' 'কালো মেয়ে'—অনেকবার, প্রায় নিজেরই অজান্তে, রাধাকান্তর মুখ দিয়ে এই কথাটা বেরিয়েছিলো সেবার।

তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী অথবা সন্তানদের রাধাকান্ত সেবার সঙ্গে এনেছিলেন কিনা, তা ঠিক মনে পড়ছে না আমার। কিছুই ঠিকমতো লক্ষ করিনি, সবই খুব ঝাপসা হ'য়ে আছে আমার মনে—এখানে যা-কিছু লিখলাম, সবই পরবর্তী শোনা কথা অবলম্ব- ক'রে। কোন মেয়েটি তাপসী, কে বা তার বাবা—তাও আমি পরে মিলিয়ে-মিলিয়ে চিনে নিয়েছিলাম। অত্যন্ত হেলাফেলায় কেটেছিলো বিয়ে-বাড়িতে সেই দু-তিনটি দিন, কিন্তু ফিরতি পথে স্টীমারে উঠেই ভবিতব্যের দুয়ার খুলে গেলো।

চার

স্টীমার ছাড়ে ভোর চারটেতে, ইংরেজি বাংলা উভয় অর্থেই সেটা অপার্থিব সময়। আমি কিছুটা আগে এসে উঠলাম। দোতলার ডেক্-এ সারি-সারি বিছানা পেতে ঘুমোচ্ছে লোকেরা—অনেকেই আগের রাত থেকে এসে শুয়ে আছে—আমি খুঁজে-খুঁজে স্টীমারের একেবারে পিছন দিকে এক ফালি ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। বাংলার নদীপথের সেই স্টীমারগুলোতে আবিষ্কারের সুযোগ ছিলো প্রচুর। বিলাসে ভরা স্টেট-রুম নেই, লাউঞ্জ নেই, নেই চিঠি লেখার ঘর, সাঁতারের পুকুর, রোদ্দুরের ডেক, ইন্দ্রপুরীর মতো ভোজনশালার কাচের দরজা খুলে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে না দেবদূতের মতো কান্তিমান কিশোর। বাঁধা-বরাদ্দ কিছুই নেই, কিন্তু অভাবনীয়ের সম্ভাবনা আছে। কোথাও একটু কোণ ফাঁকা প'ড়ে আছে যা অন্য কেউ লক্ষ করেনি, এদিকে খালাসিদের ঘর থেকে আসছে রান্নার খিদে-পাওয়া গন্ধ, ওখানে প'ড়ে আছে অজগরের মতো পাকানো দড়ি, ভেজা তক্তা, একতলার সামনের ডেক্-এ একটা রহস্যময় চাকা ঘোরানো হচ্ছে আর তার তলা থেকে অতি ধীরে অফুরন্তভাবে স'রে-স'রে যাচ্ছে দাঁতালো, মোটা লোহার একটা শেকল। আরো : ছোটো ছেলেকে স্বর্গের স্বাদ দেবার জন্য, একেবারে জল ঘেঁষে ছোট্ট একটা পোস্টাপিশ ; সেখানে একটি লোক নদীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে ব'সে ক্ষিপ্র হাতে খোপে-খোপে ছুঁড়ে ফেলছে চিঠিগুলোকে—তার দরজার বাইরে ঠিক ততটুকু জায়গা আছে, একজন মুগ্ধ মানুষ যাতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে পারে এই বিস্ময়। আর তারপর, যখন জলের ছিটে আর জোরালো হাওয়া আর ভালো লাগে না, হয়তো একটু শীত-শীত করে, তখন কয়েক পা হাঁটলেই গরম বাষ্পময় এঞ্জিন-ঘর পাওয়া যায়, লোহার রেলিঙে ঘেরা, পায়ের তলায় লোহার পাতগুলো জোরে চললে সশব্দে ন'ড়ে ওঠে, আর পাশেই, কাঠের খাঁচার ফাঁক দিয়ে, স্টীমারের লাল-রং করা চাকা দেখা যায়, ঘুরে-ঘুরে ঘুলিয়ে তুলছে

নদীকে—ঘুলঘুলির মতো ফাঁক দিয়ে, বালকের চোখে, অতি অপরূপ, এবং প্রায় ভয়ংকর।

ইচ্ছে করলে 'কুইন মেরী'র এঞ্জিন-ঘরও অবশ্য দেখা যায়। একখানা চিঠি লিখবেন চীফ এঞ্জিনিয়রকে, পরের দিনই জবাব পাবেন। বাঁধা সময়ে গাইড আসবে, যন্ত্রপুরীতে ঢোকার আগে একখানা খসখসে তোয়ালে দেবে আপনার হাতে। বড্ড গরম, ঘাম মুছবেন। এক গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে মাইল দু-তিন হাঁটবেন, তারপর আপনাকে নিজের রাজত্বে পৌঁছে দিয়ে 'গুড-বাই' ব'লে বিদায় দেবে গাইড। হয়তো আপনি ঈভান বুনিন-এর গল্পের কথা ভাবছিলেন, আশা করছিলেন বিশাল সব কয়লার চুল্লি দেখতে; নরকের পাপীদের মতো মনুষ্যমূর্তি কয়লা ঠেলছে সেই দারুণ আগুনে। কিন্তু না;—টার্বাইন এঞ্জিন বদলে দিয়েছে ও-সব; যন্ত্র হ'য়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, নির্বস্তুক, মূর্তিহীন—গণিতের মতো, বা মালার্মের কবিতার মতো। সরু মোটা অসংখ্য নল, ইস্পাতের বিচিত্র, সক্ষম ও নিঃশব্দ ছন্দ—চিহ্নের এক জটিল ব্যূহরচনা করা হয়েছে, শুধু চিহ্ন, রক্তমাংসবর্জিত প্রতীক। আর-কিছু দেখবার নেই, কিছুই দেখবার নেই—কিংবা যদি-বা কোথাও শব্দ থাকে, গতি থাকে, মানুষ থাকে, সেই সবই সরিয়ে দেয়া হয়েছে অন্য কোনো পাতালে, চোখের বাইরে। আপনি চেষ্টা করলেও যেতে পারেন না সেখানে, পথ খুঁজে পাবেন না, আর ঘণ্টায়-ঘণ্টায় খাদ্য-পানীয় আমোদ-প্রমোদের আতিশয্যের চাপে সময়ও পাবেন না কোনো মৌলিক চেষ্টার।

কিন্তু ছেলেবেলার ঐ ছোটো-ছোটো স্টীমারগুলো—অবাক হ'য়ে ভাবি—এখনো কি তারা বাংলাদেশের নদীতে পাড়ি দেয়? দেয় বইকি, কেননা আমার পরে পৃথিবীতে আর ছেলেমানুষ জন্মায়নি তা তো নয়। আর সেই ছেলেমানুষদের পক্ষে এমন চমৎকার খেলনা আর কী হ'তে পারে, সেই 'অস্‌প্রে' বা 'কণ্ডর' বা 'ব্রিস্টল' নামাঙ্কিত ক্ষুদ্র তরণীর মতো? ক্ষুদ্র, খেলনা-জাহাজ, আগাগোড়াই খেলা তার, এবং আগাগোড়াই খোলা; যদিও কোথাও-কোথাও আবছা অক্ষরে 'যাত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ' ব'লে

লেখা আছে, তবু—সকলেই জানে—সেই নিষেধাজ্ঞা মানে নিয়মরক্ষা মাত্র ; যে ইচ্ছে করে তার কোথাও যাবার বাধা নেই। থাকো না দাঁড়িয়ে এঞ্জিনের সামনে এক ঘণ্টা, বিশাল কোনো হৃৎস্পন্দনের মতো ধকধক শব্দ শোনো, ছাখো তাকিয়ে তিনটে প্রতিযোগী অক্লান্ত সিংহের মতো তিনটে প্রপেলারের ঘূর্ণন—যতক্ষণ না ঐ একঘেয়ে শব্দে আর দৃশ্যে মাথার মধ্যে ঝিমঝিম ক'রে ওঠে। ঘণ্টা বাজছে মিনিটে-মিনিটে, চুল্লির দরজা খুলে গিয়ে ঝিলিক দিচ্ছে এক পৈশাচিক আভা—মাথায় নীল রুমাল বাঁধা স্টোকার, দুর্গাপ্রতিমার তৈলাক্ত অসুরের মতো ঘামে চিকচিক করছে তার শরীর—আর মাঝে-মাঝে, সাপের গর্জনের মতো ফোঁশফোঁশ শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে, একটা স্যাৎসেঁতে আর গরম গন্ধের ঝাপট দিচ্ছে।

এই সব ছিলো, তার উপর নদী, নদীর হাওয়া, রাত্রে সার্চ-লাইটের পরি-মহল—একতলায় সেই খালাসির ডেক থেকে এত কাছে নদী যে হাত বাড়ালে প্রায় ছোঁয়া যায়।

বাবার বদলির সূত্রে, ছুটিতে যাওয়া-আসার সূত্রে, আমার সমস্তটা ছেলেবেলা এই রকম সব স্টীমারের সঙ্গেই জড়িয়ে ছিলো। কিন্তু অভিভাবকহীন, একেবারে একলা, এ-ই আমার প্রথম ভ্রমণ। যাবার সময় সঙ্গীরা ছিলো, একা আসছি ব'লে দিদি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন—আমি মনে-মনে হেসেছিলাম। বাঃ, বড়ো হয়েছি না? কলেজে পড়ি।

তবু এ-কথা সত্য যে আমার ছেলেবেলাটাকে তখনও আমি একেবারেই পিছনে ফেলে আসিনি। (কখনোই কি তা আসি আমরা? এই যে আমি আজ এই কথাগুলো লিখছি, উৎসবে ভরা প্যারিসের শীতের রাত্রে নির্জনে ব'সে এই যে কথা বলছি মনে-মনে—এ কি নয় সেই ছেলেবেলাকেই ফিরে পাবার জন্য, ম্লান, বিষণ্ণ, অপেক্ষমাণ কতিপয় প্রেতের পুনরুজ্জীবনের জন্য? মিলিকে আমি কেমন ক'রে ভুলতে পারি?)

অভিভাবকহীন সেই আমার প্রথম-ভ্রমণ: তার প্রথম মুহূর্ত থেকেই উত্তেজনা অনুভব করেছি। কিন্তু এখনো অন্ধকার নামেনি, স্টীমার ছাড়েনি ;

দোতলার পিছনের ডেক-এ সেই ছোট্ট জায়গাটুকু বেছে নিয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। এক অলৌকিক চাঁদ ছিলো আকাশে। ক্ষীণ, স্বচ্ছ, অবিশ্বাস্য, অমাবস্যার ঠিক আগের তিথিতে ভোরবেলায় ক্ষণিকের জন্য দেখা-দেয়া চাঁদ; মনে পড়ে না চাঁদের ঠিক ঐ রূপটিকে আবার কখনো দেখেছি কিনা জীবনে। গ্রীষ্মের রাতে, পুবের আকাশে যখন নদীর কালো জলের উপর দিগন্ত এরই মধ্যে রঙিন হ'য়ে উঠলো, যখন শেষ তারাটি দপদপ ক'রে ম'রে যাচ্ছে চোখের সামনে—ঠিক সেই সময়ে মুমূর্ষুর হাসির মতো চাঁদটিকে দেখলাম। আবির্ভাবের মতো মনে হ'লো তাকে, করুণাময় কোনো প্রেতের মতো; যেন ভোরের আগে দেখা দিয়ে অনাগতের ইঙ্গিত রেখে মিলিয়ে গেলো।

আলো ফুটলো, স্টীমার চলতে শুরু করলো, আমি পুলকিত হ'য়ে আবিষ্কার করলাম যে আসবার সময় যেটা পেয়েছিলাম এটা সে-স্টীমার নয়। নিশ্চয়ই এটার গড়নে কোনো সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য আছে, কোনো নতুন জিনিশ আবিষ্কার করা যাবে—প্রথমে একবার ঘুরে আসা দরকার।

তিন-চারবার টহল দিলাম দোতলা একতলা, কাঠের বেঞ্চিতে ব'সে চা বিস্কুট খেলাম, তারপর নিচে, পাকানো দড়ির স্তূপের উপর ব'সে নদী দেখে-দেখে বাজিয়ে দিলাম দশটা। কিন্তু, আমি যে সত্যি আর ছোটো ছেলে নেই, তা বুঝতেও দেরি হ'লো না। বাক্স-বিছানা ফেলে এসেছি উপরে; দিদি বলেছিলেন বরিশালের স্টীমারে বড়ো চুরি হয়: একবার দেখে আসতে হয়।

হয়তো স্টীমারের মুখ ঘুরেছিলো, তার উপর যাত্রীরা সবাই জেগে উঠে নানান ধরনের লোকেরা চলাফেরা করছে: আমার জায়গাটা খুঁজে বের করতে একটু দেরি হ'লো, কাছে এসেও হঠাৎ চিনতে পারলাম না। একটু পরে বুঝলাম আমার ভুল হয়েছিলো; আমি যেখানে জিনিশ রেখেছিলাম, যেখানে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণপক্ষের শেষ চাঁদ দেখেছিলাম, সেটা কোনো ফাঁকা জায়গা নয়, এই স্টীমারের ইণ্টার-ক্লাশ কামরা, জালের বেড়া দিয়ে ঘেরা, দরজায় পরিষ্কার লেখা আছে। আমি [illegible]রে বুঝতে পারিনি।

কামরাটি মেয়ে-পুরুষের জন্য দু-ভাগে ভাগ করা। মেয়েদের দিকটা খালি; পুরুষের অংশে এক ভদ্রলোক সপরিবারে চলেছেন। আর-কোনো যাত্রী নেই ব'লে বেশ ঘরোয়াভাবে গুছিয়ে বসেছেন তাঁরা, ভদ্রলোকের স্ত্রী আর কন্যা—আর তাঁদেরই জিনিশের মধ্যে আমার ছোট্ট বাক্স-বিছানাও দেখতে পাচ্ছি।

বয়ঃসন্ধিকালে ব্যবহারিক সমস্যা অসংখ্য; আমি তারই একটির দ্বারা আক্রান্ত হলাম সেই মুহূর্তে। এখন আমার কী করা উচিত? আমি ইণ্টার-ক্লাশের যাত্রী নই, আমার জিনিশ অন্য কোথাও সরাতে হবে—কিন্তু হঠাৎ ঐ কামরায় ঢুকে পড়লে ওঁরাই বা কী মনে করবেন, আর আমিই বা কী বলবো। অবশ্য ওটা মেয়েদের কামরা নয়, আর ওঁরা তো জানেন না আমার কোন ক্লাশের টিকিট—আর আমি তো বেআইনি কিছু করতে যাচ্ছি না, শুধু আমার জিনিশগুলোকে সরিয়ে নিয়ে চ'লে আসবো। কিন্তু তারই বা কী দরকার? থাক না জিনিশ ওখানে; এখন তো জানলাম যে জিনিশ চুরি হয়নি, বা হবেও না।

মনস্থির করতে না-পেরে পাইচারি করতে লাগলাম কামরার বাইরে। ভদ্রলোক একবার বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখটা আমার চেনা মনে হ'লো। আর-একবার তাকাতেই আমার দৃঢ় ধারণা হ'লো ইনি সেই ছুতোমগঞ্জের গিরিজা মজুমদার।

নবযৌবনের সবটুকু ঔদ্ধত্য একত্র ক'রে কামরার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ভদ্রমহিলা মেঝেতে ব'সে পান সাজছিলেন, আমাকে দেখে সংকুচিত হলেন।

—'আমি—মানে—কিছু মনে করবেন না—আমার দুটো জিনিশ আছে এখানে।'

এবার ভদ্রলোকটি খবর-কাগজ থেকে চোখ তুললেন। আমার দিবে তাকিয়ে রইলেন মুহূর্তের জন্য, যেন বুঝতে পারছেন না 'তুমি' বলবেন ন 'আপনি'। অবশেষে বললেন, 'ও। আপনার জিনিশ ওগুলো?'

'আমি সরিয়ে নিচ্ছি।'

'না, না, সরাতে হবে না। আপনি বসুন। অনেক জায়গা আছে।'

আমি আমার ছোট্ট স্যুটকেস থেকে একখানা বই বের ক'রে নিলাম। 'আমি ভুল করেছিলাম। এটা ইণ্টার-ক্লাশ, বুঝিনি।' বাক্স বন্ধ ক'রে তক্ষুনি আবার বললাম, 'আপনি—আপনি কি কখনো হুতোমগঞ্জে ছিলেন?'

খাপছাড়া প্রশ্ন, সন্দেহ নেই, ষোলো বছরের ছেলের মুখে অচেনা একজন বাপের বয়সী রাশভারি মানুষকে ও-রকম জিগেস করাটা—অন্তত আমার ছেলেবেলার বাংলাদেশে—রীতিমতো বেয়াদপি। কথাটা উচ্চারণ করতে ভিতরে-ভিতরে বেশ পরিশ্রম হ'লো আমার, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিলো না। তিলতম সম্ভাবনা ছিলো না যে ভদ্রলোক আমাকে চিনতে পারবেন। যে ছিলো বালক, তাকে হঠাৎ যুবক অবস্থায় দেখলে বাপই কি ছেলেকে চিনতে পারে সব সময়? আমি কি মিলিকে দেখে কখনোই চিনতে পারতাম, ভুলেও ঐ তরুণীটিকে কল্পনা করতাম হুতোমগঞ্জের ফ্রক-পরা মিলি ব'লে—যদি সঙ্গে তার মা-বাবা না থাকতেন? অতএব আমাকেই বলতে হবে, যে-কোনো উপায়ে নিজের পরিচয় দিতেই হবে আমাকে।

এখন ভেবে অবাক লাগে যে ঐ বয়সে অতখানি ধূর্ত বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছিলো। কিন্তু দেবতারা এমনি ক'রেই মানুষকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেন। আমার যৌবন তখন জাগ্রত হয়েছে, সামনে একটি তরুণী নারীকে দেখতে পাচ্ছি, যার উপর কিছু দাবি জানানো আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। এ-অবস্থায় আমি যদি চুপ ক'রে থাকি, প্রজাপতি তা সহ্য করবেন কেন?

—'অ্যাঁ? হুতোমগঞ্জ? হ্যাঁ, ছিলাম সেখানে।'

এটুকু স্বীকারোক্তি ক'রেই গিরিজাবাবু প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি আবার বললাম, 'আমার বাবাও ছিলেন সেখানে।'

এবার গিরিজাবাবুর মুখে কৌতূহল ফুটলো।—'কী নাম তাঁর?'

বাবার নাম শুনে ভদ্রলোক তাঁর সহৃদয়তা বিস্তার ক'রে দিলেন আমার দিকে। 'ও! তুমি—নীলু! তা বেশ, বেশ। বোসো।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'কত বড়ো হয়েছো! চেনবার উপায় নেই!'

আর মিলি হঠাৎ ছোট্ট হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলো, 'নীলু! কী মজা! তার মা-বাবা একসঙ্গে তার দিকে তাকালেন, কিছুটা স্নেহের, কিছুটা শাসনের ভঙ্গিতে।

'তুমি একা চলেছো?'

'হ্যাঁ, একাই,' জবাব দিতে গর্ব হ'লো আমার। 'আজকাল ঢাকায় থাকি আমরা।'

'বরিশালে বেড়াতে এসেছিলে?'

'ঠিক বেড়াতে নয়—মানে—' আমি, মিলির উপস্থিতি বিষয়ে পূর্ণসচেতন, আমার বরিশাল-প্রবাসের একটা ছোট্ট বিবরণ দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মিলির বাবা তক্ষুনি আবার ব'লে উঠলেন, 'তোমার বাবা এখন ঢাকায় পোস্টেড? বাঃ, আমিও যে সেখানে। ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে এসেছিলাম। তা পৃ[illegible] নতুন এসেছেন বোধ হয় ঢাকায়—নয়তো আমি কি আর না জানতাম!'

এর উত্তরে আমাকে একটা বিশ্রী কথা উচ্চারণ করতে হ'লো: 'আমার বাবা মারা গেছেন।'

'অ্যাঁ? সে কী!' একসঙ্গে সরু মোটা গলা শুনতে পেলাম। একটু চুপ ক'রে থেকে সংবৃত হ'য়ে গিরিজাবাবু নিচু গলায় বললেন, 'কবে?'

'ছ-মাস হ'লো।'

'কী হয়েছিলো?'

'সন্ন্যাস-রোগ।'

'এত অল্প বয়সে—' গিরিজাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তাঁর স্ত্রীর মমতা-ভরা চোখ অনুভব করলাম আমার মুখের উপর। তাঁদের করুণা এড়াবার জন্য আমি আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলাম—বাবার কথা উঠলে তখনও আমার কান্না পায়। নিচে এসে খানিকক্ষণ এঞ্জিন দেখলাম, তারপর পোস্টাপিশের নির্জন কোণটিতে ব'সে গল্পের বইয়ে মগ্ন হলাম।

আবার উপরে গেলাম বেলা দুটো নাগাদ। গিরিজাবাবু বেঞ্চির কোণে

বালিশ নিয়ে, আর তাঁর স্ত্রী মেঝের বিছানায় ঘুমোচ্ছেন। আমাকে দেখে মিলি উঠে এলো দরজার ধারে।

'এই যে।'

আমিও বললুম, 'এই যে।'

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

'নিচে।'

'নিচে কেন ?'

'খুব হাওয়া ওখানে। আর স্টীমারে উঠলে ঘুরে বেড়াতেই আমি ভালোবাসি।'

'স্টীমারে আমার বিশ্রী লাগে। ট্রেন কত ভালো। দাদাকে তোমার মনে আছে ?'

'নিশ্চয়ই !'

'দাদা কলকাতায় পড়ছে। আই. এস-সি. নিয়েছে, এর পরে এঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। দাদা বলে কী—রেলের এঞ্জিন তৈরি করতে শিখবে।'

'ভালো তো,' আমার উত্তর নিরুত্তাপ।

'আমি ঢাকায় এসেই ইডেন স্কুলে ভরতি হয়েছি—ক্লাশ নাইন এবার।'

'এত পড়ো তুমি ?'

'ও মা, বয়েস কি কম নাকি আমার, চোদ্দ পেরিয়ে গেছি জানো ? আরো এক ক্লাশ উঁচুতে যেতে পারতাম, কিন্তু অঙ্কে কাঁচা আছি তো। দাদার খুব অঙ্কে মাথা।'

'তা না-হ'লে কি এঞ্জিনিয়র হওয়া যায় ?'

'তা-ই তো! অঙ্ক না-জানলে বৈজ্ঞানিকও হওয়া যায় না। অথচ আমি ভাবি—কেন যে ঐ অঙ্ক জিনিশটার সৃষ্টি হয়েছিলো !'

তার কথার ভঙ্গিতে আমার হাসি পেলো। মিলির মা জেগে উঠে বসলেন। হাত-পাখা নেড়ে বললেন, 'কী গরম! নীলু, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ? ভিতরে এসো।'

'আমি যাই।'

'কেন, এসো না। খেয়েছিলে দুপুরে ?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

'কোথায় খেলে ?'

'খালাসিরা খেতে দেয় তো। ওদের ঘরে ব'সেই খেলাম।'

'সত্যি ? কী মজা!' মিলির চোখ উজ্জ্বল হ'লো।

'গরম ভাত, চমৎকার মুর্গির মাংস, আবার একটা ডিমভাজাও দিলে। আর জানলা দিয়ে কেমন ফুরফুরে হাওয়া আসছিলো। বেশ থাকে খালাসিরা!'

'শোনো কথা!' মিলির মা আমার ছেলেমানুষিতে হাসলেন। কিন্তু একটু পরেই মুখের ভাব বদলে গেলো, বোধহয় মনে পড়লো আমার বাবা মারা গেছেন। পুরোনো কথা জিগেস করলেন, 'তোমরা হুতোমগঞ্জ ছাড়লে কবে ?'

'আপনারা চ'লে যাবার বছরখানেক পরে।'

'ঢাকায় কবে থেকে আছো ?'

'বছর দুই হবে।'

'আমরা যে কত জায়গায় ঘুরলাম এর মধ্যে! এতদিনে একটা শহরে এসে বেঁচেছি। তোমার মা ভালো আছেন ?'

'ভালো আছেন।' পাছে বাবার কথা আবার উঠে পড়ে, আমি একটু উশখুশ ক'রে বললাম, 'আমি যাই নিচে।'

'তুমি এখানে থাকলে আমাদের কিছু অসুবিধে নেই। বোসো।'

'পরে আসবো।'

'আচ্ছা, ঘুরে বেড়াবে তো ? কিন্তু বিকেলে এসে চা খাবে আমাদের সঙ্গে।'

মিলির মা সঙ্গে স্টোভ এনেছেন, চায়ের সরঞ্জাম, টিফিন-কেরিয়ারে নানারকম খাবার। ঐ কামরাটিতে আর যাত্রী ওঠেনি, একেবারে সংসার পেতে চলেছেন তাঁরা। আর আমিও সেই সংসারের অন্তর্ভূর্ত হয়েছি।

'কোথায় থাকো তোমরা ঢাকায় ?'

'টিকাটুলিতে।'

'সত্যি ?—ও মা, শুনেছো, নীলুরাও টিকাটুলিতে থাকে! আমাদের কাছেই হবে—না ?'

'মিলি, ওকে তুই নীলু বলিস না তো, নীলুদা ব'লে ডাক। বড়ো না তোর!'

'কত আর বড়ো ? আর হুতোমগঞ্জে তো নীলুই ডাকতাম।'

'তখনকার কথা আলাদা—ছোটো ছিলি। এখন কি আর মানায় তাই ব'লে!'

'না, মা, ওকে আমার দাদা বলতে ইচ্ছে করে না। ও তো একেবারেই দাদার মতো নয়। দাদা কত লম্বা, কত ভালো টেনিস খেলে, আর অঙ্কে দু-শোর মধ্যে একশো-সাতানব্বুই পায়!'

'কী ক'রে জানিস নীলু ও-সব পারে না ?'

'পারো নাকি তুমি ? বলো! অঙ্কে কত পেয়েছিলে ম্যাট্রিকে ?'

'মাত্র একশো-সত্তর। আর, টেনিস-র‍্যাকেট ছুঁয়েও দেখিনি কোনোদিন।'

'হ'লো তো ? তবেই ছাখো আমার দাদা হবার কোনো যোগ্যতাই নেই ওর। ডাকি, মা, ওকে নীলু ব'লে ?'

সূর্য ডুবলো, অন্ধকার হ'লো, সার্চলাইটের তীব্র সবুজ আলোয় সাপের মতো কাৎরে উঠলো নদী। আমি নিচে এসে আলোর খেলা দেখলাম, কালো জলে লক্ষ-লক্ষ নিশেনের মতো ফেনা, তারায় ভরা অমাবস্যার রাত্রি। এঞ্জিনের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আমার বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগলো।

মিলির মা প্রস্তাব করেছিলেন অন্তত রাত্রে যেন আমি ইণ্টার-ক্লাশে এসে ঘুমোই, কিন্তু আমি, বিবেকবুদ্ধির অধিকারী সাবালক পুরুষ, কিছুতেই তাতে রাজি হলাম না। ডেক্-এ বিছানা পেতে নিলাম কাছাকাছি; মনে নেই কোন মধুর ছবি দেখতে-দেখতে স্নিগ্ধ হাওয়ায় স্বর্গীয় ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

পরের দিন সকালে :

—'কোথায় বলো তো তোমাদের বাড়িটা ? গোলাপবাগিচার কাছে ?'

'না, ওদিকে না। রামকৃষ্ণ মিশন চেনো ?'

'তা আর কে না চেনে।'

'সেটা ছাড়িয়ে একটা আমবাগান আছে। তার পরে।'

'তাহ'লে আর এমন দূর কী। আমাদের বাড়ির নাম গগন-কুটির।'

'লাল রঙের ?'

'ঠিক! লাল রঙের। তুমি চেনো তাহ'লে! রেল-লাইনের ধারে। দোতলায় মস্ত বারান্দা আছে। আর ছাদে মন্দিরের মতো চমৎকার চিলেকোঠা।'

'আমি জানি। মাঝে-মাঝে যাই ওদিকে। ভাবতেও পারিনি তোমরা ওখানে আছো।'

'আমাদের কথা কত যেন ভেবেছো তুমি!...আমাকে যেতে বলছো না যে তোমাদের বাড়িতে ?'

'বলবো কী আবার। যাবেই তো।'

'তুমিও আসবে কিন্তু। আমাকে পড়িয়ে দেবে। আচ্ছা, তুমি "রমলা" পড়েছো ?'...

দুপুরে :

'বড়ো হ'য়ে কী হবে তুমি ?'

'জানি না।'

'কিচ্ছু ভাবোনি ?'

'কী-কী হবো না তা ভেবেছি।'

'বলো।'

'এঞ্জিনিয়র হবো না, কেননা হ'তে পারবো না ; উকিল হবো না, কেননা হ'তে পারবো না ; ডাক্তার হবো না, কেননা হ'তে পারবো না—'

'ম্যাট্রিক পাশ ক'রেই চালিয়াতি শিখেছো—না ? কিন্তু আমি তোমাকে

হাফ-প্যান্ট-পরা দেখেছি, তা জানো ? আর জানো, তুমি হতোমগঞ্জে আমাকে একদিন কী বলেছিলে ?'

'কী বলেছিলাম ?'

'বলেছিলে, তুমি অনেক, অনেক বই লিখবে বড়ো হ'য়ে।—দেখলে তো—তুমি ভুলে গেছো আর আমি মনে রেখেছি ?'...

কিন্তু কেন এ-সব লিখছি ? কী-কথা হয়েছিলো তা কি মনে আছে আমার ? এই সব কথাবার্তা—কেমন ক'রে জানবো সবই আমার এই মুহূর্তের রচনা নয় ? ছায়ার মতো যা ভেসে আছে মনের আকাশে, যা ভেসে-ভেসে চ'লে যায় মেঘের মতো—তা শুধু চোখের ভঙ্গি, বলার ভঙ্গি, আর রূপ, তার রূপ, আমার চোখের সামনে ফুটে-ওঠা কোনো বিরল মরুভূমির ফুলের মতো তার নারীর যৌবন। কিন্তু সবই ছায়া, মেঘের মতোই পরস্পরে মিশে যায়, মুহূর্তে-মুহূর্তে আকৃতির বদল হয়—তার মধ্যে সারবস্তু আর কতটুকু। হাজার চেষ্টা করলেও তার সম্পূর্ণ মুখ দেখতে পাই না, শুনতে পাই না তার কণ্ঠস্বর—আবার মাঝে-মাঝে ভুল হ'য়ে যায় কোন জন মিলি, আর কে বা তাপসী।

দ্বিতীয় দিনের সন্ধেবেলা ঢাকার স্টীমার-ঘাটে নেমে তাঁদের সঙ্গে একই ঘোড়ার গাড়িতে বাড়ি এলাম। খানিক ঘুরে আমাকে একেবারে বাড়ির দরজাতেই নামিয়ে দিলেন তাঁরা ; পরের দিন তুই মায়ে দেখা হ'লো। আর সেই তারিখের ছ-মাসের মধ্যে আমি মনে-মনে জানলাম মিলি আমার বৌ হবে। অবশ্য কোনো পক্ষই মুখে কিছু বললো না, ঘুণাক্ষরেও এটা উচ্চারিত হ'লো না কোথাও, কিন্তু আমার মনে তা ধ্রুব সত্য হ'য়ে বাসা বাঁধলো। আর মিলির মনেও। কেউ কিছু বললাম না—সেটা অসম্ভব ছিলো সে-বয়সে—কিন্তু দু-জনেই জানলাম যে অন্য জন জানে। কিছু বলার কোনো কথা ওঠে না।

ডেপুটি, মুন্সেফ, চাকুরের পাড়া টিকাটুলি; তার একটা মুখ রেল-লাইন পেরিয়ে, কবরখানার পাশ দিয়ে আধা-গরিব নারিন্দার দিকে চ'লে গেছে, আর-একদিকে শেষ সীমা রামকৃষ্ণ মিশন। সেই সীমা ছাড়িয়ে আমাদের বাড়ি, সত্যি বলতে গ্রামের মধ্যে। পদ্মায় পৈতৃক ভিটে লুপ্ত হবার পর, আমার হেডমাষ্টার ঠাকুর্দা কম খরচে এখানে এসে বাড়ি করেছিলেন। তাঁর সময়ে বনজঙ্গল ছিলো এ-সব দিকে; শুনেছি কালেক্টরিতে চার আনা জমা দিলেই নিরেনব্বুই বছরের ইজারায় বিঘেখানেক জমি পাওয়া যেতো। ঠাকুর্দা তাঁর চার ছেলের কথা ভেবে চার বিঘে নিয়েছিলেন, একটা পুকুর আর কিছু ফলের গাছ সুদ্ধু। ছেলেরা নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে চাকরি করে; ঠাকুর্দা মরবার পর থেকে বাড়িটা প্রায় খালিই প'ড়ে ছিলো, যতদিন না বাবা এসে বাড়ি মেরামত করিয়ে, গুছিয়ে বসার আগেই মারা গেলেন।

পাঁচিল-ঘেরা চওড়া জমির মধ্যে লম্বা একতলা বাড়ি। শ্রী-ছাঁদ কিছু নেই, সোজাসুজি পাশাপাশি খান চারেক ঘর, বাইরের দিকে খোলা আর ভিতর দিকে ঢাকা বারান্দা, শান-বাঁধানো সরু উঠোনের ওপারে আলাদা রান্নাবাড়ি। বাড়িটা উত্তর ঘেঁষে, দক্ষিণ দিকটা অনেকখানি খোলা। সেই খোলা জায়গাটাকে আঙিনা বলা যায় না, বাগান তো নয়ই। এমনি প'ড়ে থাকে, আগাছায় আর জঙ্গলে ভরা—মালি রাখার সাধ্য নেই আমাদের—শুধু মাঝখানে মস্ত একটা কালোজাম গাছ, ঠাকুর্দার আমলের ফাটা বেদীতে শোভিত, তার ছায়া আমন্ত্রণকারী, কিন্তু পাখিরা এত নোংরা ক'রে রাখে যে কেউ সেখানে বসে না। বুনো আর বিশৃঙ্খল চেহারা জায়গাটার, সেখানে অতিপ্রজ প্রকৃতি যা গজিয়ে তোলে তাকে বাধা দেবার সাধ্য নেই আমাদের; অপরাজিতা, লজ্জাবতী, আকন্দ, আর শামুক, কেঁচো, কেন্নো, আর গ্রীষ্মে বর্ষায় দুটো একটা সাপ। মা, উপায় নেই জেনে, ও-দিকে ফিরেও তাকান না; কিন্তু রান্নাঘরের

পাশে ছোট্ট জমিতে নিজের হাতে কিছু সব্জি করেন, চেষ্টা করেন গোলাপ ফোটাতে শীতকালে। মাঝখানে তুলসীমণ্ডপ আছে, দেয়াল ছাড়িয়ে মাথা তুলেছে স্থলপদ্মের গাছ, প্রতিবেশী শিউলি ফুরিয়ে এলে তাতে যে-ফুল ফোটে তার রং, আমি কল্পনা করি, উর্বশীর গায়ের রঙের মতো।

পুবদিকে পুকুর। সেখানে যাবার জন্য দরজা করা আছে দেয়ালে, আর পুকুরের চারদিকে আম, কাঁঠাল, জামরুলের ছায়া। টকটকে লাল জবা ফোটে পুকুর-পাড়ে, কলমিশাক সবুজ আঙুল বাড়িয়ে দেয়। আশে-পাশের গেরস্তরা স্নান করে, হাঁস পোষে, গ্রীষ্মের অজস্র ফল অজস্র খেয়ে যায় পাখিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে পাড়ার ছেলেমেয়ের দল।

আর আমি ছুটির দিনে অকারণে ঘুরে-ঘুরে বেড়াই। আর গাছের ফাঁকে মাঝে-মাঝে রঙিন শাড়ি ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

তাই ব'লে মিলিদের বাড়ি অত্যন্ত বেশি কাছে নয়, আধ মাইলের কিছু বরং বেশি হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের পরে, গৌর বসাকের সুরক্ষিত আম-বাগান বাঁয়ে রেখে, একটা মিনিট পাঁচেকের মাঠ পেরিয়ে আমাদের বাড়ির সামনের দরজা পাওয়া যায়। কিংবা, একটু ঘুরে, পিছনের পুকুর-পাড়ে পৌঁছবারও বাধা নেই। ছড়ানো জায়গা, অগোছালো, ভাঙা পাঁচিলে চোরেদের জন্য খোলা, কেননা চুরির যোগ্য বিশেষ-কিছু নেই কোথাও। সপ্তাহে দু-দিন, কখনো বা তিন দিন, মলির মা বেড়াতে আসেন মেয়েকে নিয়ে (ঢাকায়, অন্তত কোনো-কোনো পাড়ায়, মেয়েদের দিনের বেলাতেও পায়ে হেঁটে বেরোবার কোনো বারণ ছিলো না)—আমিও যাই মাঝে-মাঝে, রোজই প্রায় দেখা হয়। আর সেই দেখাশোনার সঙ্গে হুতোমগঞ্জের মেলামেশার অনেক তফাৎ।

মিলির জীবন, দিনের পর দিন, মসৃণ নিয়মের মধ্যে কেটে যায়। তার বাবা মাসিক বরাদ্দে একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছেন, কোর্টে যাবার পথে মেয়েকে স্কুলে নামিয়ে দেন তিনি, ফেরার পথে তুলে আনেন। সকালে ব'সে স্কুলের পড়া তৈরি করে, বিকেলে (যেদিন আমাদের বাড়িতে

আসে না) পাড়ার কোনো মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে বেড়ায়, নয়তো পিংপং খেলে তার বাবার সঙ্গে, নয়তো (যদি বৃষ্টি হয় বা মাথা ধরে) কোনো গল্পের বই পড়ে লম্বা খোলা বারান্দায় ব'সে। আটটার সময় রাতের খাওয়া, ন-টার মধ্যে ঘুম।

তিন জনের সংসারের পক্ষে গগন-কুটির মস্ত বাড়ি, কিন্তু টিকাটুলিতে কোনো ছোটো বাড়ি ছিলোই না সে-সময়ে, সেই যৌথ পরিবার আর সচ্ছলতার [illegible] সকলেই বড়ো মাপে ভাবতেন; ফ্ল্যাট নামক বস্তুটার কল্পনাও কারো মাথায় আসেনি। কোনো বাড়ি ছিলো না যাতে বেশ খানিকটা কম্পাউণ্ড নেই, আর ঘর অন্তত খানপাঁচেক না আছে। গগন-কুটিরে আরো বেশি ছিলো; একতলাটা খালিই প'ড়ে থাকে, উপরে একটা ঘর সাজিয়ে রাখা হয় মণ্টু যখন ছুটিতে আসবে তার জন্য, আর ছাদের সুন্দর চিলেকোঠায় ব'সে মিলি রোববার সকালে জলরঙে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকার চেষ্টা করে।

এই [illegible] পল্লীতে আমাদের বাড়িটা কিছু বেমানান, কিন্তু একেবারে পাড়ার মধ্যে নয় ব'লে তাতে ভিন্ন একটা স্বাদ পাওয়া যায়। যদিও কাছাকাছি, তবু দুই বাড়ির আবহাওয়ার তফাৎ যেন এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের। আমাদের বাড়িতে লোক বেশি; নানা দিকের আত্মীয়রা প্রায়ই এসে যত দিন খুশি কাটিয়ে যান; সকলেই অস্থায়ী, কিন্তু পর-পর আসা-যাওয়ার ভিড়ে বাড়ি বড়ো ফাঁকা থাকে না। তার একটা কারণ, বাড়িটা বাবার পৈতৃক, অন্য অনেকের অধিকার আছে তাতে; অন্য কারণ, আমার মা-র অতিশয় অতিথিবৎসল স্বভাব। আত্মীয়রা তাঁর কাছে থাকতে ভালোবাসেন; সন্তানসম্ভাবনা হ'লে দেওরঝি ভাইয়ের বৌয়েরা তাঁরই কাছে আসে আরামের জন্য, কারো ছেলে কলেজে পড়ার যোগ্য হ'লে তাঁরই কাছে পাঠিয়ে দেয়। যে যার নিজের খরচেই থাকে, কিন্তু দেখাশোনাটা মা-কেই সব করতে হয়, আর সেটা তাঁর ভালোই লাগে, এ-রকম কোনো কাজ না-পেলে বাবার মৃত্যুর পর একমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকে নিয়ে তাঁর সময় কাটানো সহজ হ'তো না।

মা-র সব দিকেই নজর ; আমার জন্য যথাসম্ভব সুব্যবস্থা ওরই মধ্যে ক'রে দিয়েছেন। কোণের ঘরটি আমার জন্য আলাদা করা আছে। ছোটো ঘর, জানলার বাইরে মা-র বাগানের শিউলি আর স্থলপদ্ম, ভাঙা পাঁচিলের ফাঁকে পুকুরটা চোখে পড়ে। বাড়িতে যত ভিড়ই হোক, ও-ঘরের অংশ তিনি কাউকেই দেন না, কেউ আশাও করে না তা। কেননা—দু-পক্ষই মেনে নিয়েছে কথাটা—আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নামমাত্র, যাকে বলে ফর্ম্যাল। তাঁরা যখন তাস খেলেন, বা 'দেশের অবস্থা' বিষয়ে আলোচনা করেন, বা দল বেঁধে রমনার কালীমন্দিরে যান, তখন আমি যে সে-সব ব্যাপারে যোগ দেবো তা সম্ভাবনার বাইরে ব'লেই ধ'রে নেয়া হয়। তবু, আমার পরিবেশ ভিন্ন ব'লে, আমি মিলিদের বাড়ি গিয়ে যেন একটা নতুন আদর্শের মুখোমুখি দাঁড়াই ; আর ঠিক তেমনি, মিলিও আমাদের বাড়ির খোলামেলা ভাব দেখে উচ্ছ্বসিত হয়।

গগন-কুটিরে গেলে দেখতে পাই, হলঘরে ঢাকনা-পরানো অর্গ্যান দাঁড়িয়ে, কাচের আলমারিতে মণ্টু মিলির ছেলেবেলার খেলনা সাজিয়ে রাখা, মেঝে তকতকে পরিষ্কার, সারা বাড়ি শান্ত আর নিঃশব্দ, মিলির পড়ার টেবিলটিতে প্রত্যেকটি বই খাতা পেনসিল নিখুঁতভাবে গুছোনো।

নিশ্চয়ই তাঁরা হুতোমগঞ্জেও এ-ভাবেই থাকতেন, কিন্তু সেখানে দুই বাড়ি একই ছাঁচে গড়া ছিলো ব'লে তেমন কোনো তফাৎ বোঝা যেতো না, কিংবা হয়তো তা ধরা পড়েনি আমার ছেলেমানুষ চোখে। কিন্তু আমার সতেরো বছরের তীক্ষ্ণ অনুভূতি সহজেই ধ'রে ফেললে যে গগন-কুটিরে একটা অবর্ণনীয় পরিচ্ছন্নতা আছে, যার অন্য নাম নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা। তার পরিচয় আছে এমনকি মিলির হাতের লেখাতে, তার স্কুলের টাস্ক রীতিমতো একটা দ্রষ্টব্য জিনিশ, একটি অক্ষর অন্যটির চাইতে বড়ো বা ছোটো নয়, সময় বাঁচাবার জন্য কোথাও একটু পেঁচিয়ে লেখা হয়নি—এক-একটি পাতা যেন এক-একখানা নির্মল হৃদয়ের মতো সহজ এবং অবারিত। দেখে আমি ছেলেবেলার চেয়েও গভীরভাবে মুগ্ধ হলাম।

কিন্তু মুগ্ধ আমি তো প্রথম থেকেই হ'য়ে আছি ; যে-মুহূর্তে বরিশালের স্টীমারে তাকে প্রথম দেখেছিলাম, সেই মুহূর্ত থেকেই।

তার চেহারার একটা বর্ণনা লেখার চেষ্টা করি। তুহিন যামিনী আজ, বাইরের শীত শূন্যের নিচে অনেক ডিগ্রি নেমে গেছে, টেবিলে ব'সে-ব'সে ইলেকট্রিকের মৃদু তাপ অনুভব করছি। এ-দেশে ঘরে-ঘরে সেন্‌ট্রাল হীটিং নেই, এই ঘরেরই দূর অংশগুলো উত্তর মেরুতে পরিণত হয়েছে ; অগ্নিকুণ্ড থেকে দূরে গেলেই মনে হয় বরফ-জলে ঝাঁপ দিচ্ছি। যদি সাহস ক'রে জানলার ধারে একবার যাই, পরদা সরিয়ে কাচের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখি—তখনই ঝাঁকে-ঝাঁকে আমার বর্তমান ফিরে আসবে—ঝাঁকে-ঝাঁকে বরফ, ঝাপসা-আলো-জ্বলা প্যারিস, ল্যুভরের বিরাট, গম্ভীর পাহাড়ের মতো আয়তন। কাল সেখানে গিয়ে, শিল্পের অমরাবতীতে ঘুরে-ঘুরে, তার রূপের তুলনা খুঁজবো কি আমি? না কি এখানে ব'সেই, আমার ঘরের ঠাণ্ডা আর অন্ধকার কোণগুলি থেকে, ঐ কবর থেকে, মৃত্যু থেকে আবার তাকে উদ্ধার ক'রে আনবো? বৃথা চেষ্টা ; কিছু বলার নেই ; শুধু এটুকু লিখে রাখি তার রূপ ছিলো। দুধের মতো গায়ের রং, তরল চোখ, সরু-সরু লতানো আঙুল, বাহু আর পায়ের পাতা শুভ্রতায় চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, সরু-সরু শিরাগুলিতে গাছের কচি পাতার মতো রং, যেন এক মায়াতরু তার সারা দেহে ডাল ছড়িয়ে দিয়েছে। সাধ্য কী আমার, সেই রূপের দাসত্ব না করি।

তার মা-বাবাও দেখতে ভালো ছিলেন, কিন্তু মিলির চেহারার বিশেষ গুণ ছিলো কমনীয়তা, লালিত্য। অস্বাভাবিক নরম আর হালকা মানুষ মনে হ'তো তাকে, বড়ো পেলব, বহু যত্নে লালন করার মতো সম্পদ। এই কথাটাকেই শাদা বাংলায় তর্জমা ক'রে বলা যায় তার স্বাস্থ্য ভালো ছিলো না। প্রায়ই তার অসুখ করে ; সর্দি, গা-বমি, মাথা-ধরা, এইরকম ছোটো-খাটো অনেক উৎপীড়ন মাসের মধ্যে দু-চারবার তাকে সইতেই হয়। তার মা-বাবার বিরাট ভাবনা তা-ই নিয়ে ; ডাক্তার, বদ্যি, হোমিওপ্যাথ, কিছু বাকি রাখেন না ; দুধ, ছানা, ফল, মাংসের মেটুলি, পাঁচ রকমের পেটেণ্ট

ওষুধ—সবই তাকে বদলে-বদলে খাওয়ানো হয়, ঘড়ির কাঁটায় দৈনিক জীবন চলে তার—তবু মেয়ের স্বাস্থ্য সারে না। এই একটা জিনিশ আমার ভালো লাগে না ও-বাড়ির, মেয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে এই হৈ-চৈ, তার মা-র মুখে অবিরাম এই কথা—মেয়ে কেমন ক'রে মোটা হবে। 'মোটা!' কথাটা শুনে শিউরে উঠেছি আমি। সে, মিলি, ঐ বিশ্রী বিশেষণটা তার পক্ষে যে অসম্ভব তা কি জানেন না ওঁরা? কেন, হয়েছে কী? রুগ্ন তো নয়, যাকে অসুখ বলে তা তো করেনি—এক-আধ দিন মাথাও ধরবে না এমন বর্বর দেহ মানাবে কেন ওকে? হাসি, গল্প, বেড়ানো, পড়াশুনো—সবই করে; কী পারে না, বা কোথায় কোন ত্রুটি থেকে যাচ্ছে যে এত ব্যস্ত হ'তে হবে? আর ঐ যে মাঝে-মাঝে শরীর খারাপ হয়, মুখ ম্লান দেখায়, হয়তো চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে—তখন কি ওকে আরো বেশি সুন্দর দেখায় না, আরো অপার্থিব, আঁকা কোনো ছবির মতো? ও-রকম না-হ'লে অত লাবণ্য হ'তো কেমন ক'রে?

আরো একটা ব্যাপারে খুঁতখুঁত করে আমার মন। গিরিজাবাবু ব্রাহ্মভাবাপন্ন, সেটা হুতোমগঞ্জে ভালো লাগতো, কিন্তু এখন দেখি তার অসুবিধেও আছে। যেমন মেয়ের শরীর নিয়ে তাঁরা শঙ্কিত, তেমনি তার মনের স্বাস্থ্যবিষয়েও খুব সাবধানী। মেয়েকে তাঁরা শরৎচন্দ্র পড়তে দেন না, রবীন্দ্রনাথেরও সব বই না, ইংরেজিতে দেন বিলেতি গার্লস অ্যান্যুয়েল, 'এ বাস্কেট অব ফ্লাওয়ার্স', সংক্ষেপিত ওঅল্টর স্কট, ওঅর্ডস্বার্থ আর কুপার-এর কবিতা। আমি এদিকে শরৎচন্দ্রকে গিলে খেয়েছি, রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে ক্নুট হামসুন আর মাক্সিম গর্কীকে ধ'রে ফেলেছি, 'দি পিকচার অব ডরিয়ান গ্রে' পড়া হ'য়ে গেছে। কিন্তু মিলির সঙ্গে আমার এ-ব্যবধানটা কিছুদূর পর্যন্ত মেনে নিতেও আপত্তি হয় না আমার; নিজের অজান্তেই তার মা-বাবার সঙ্গে সায় দিয়ে ফেলি যেন; এমন কোমল সে, এমন সুন্দর আর সুকুমার, যে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'র জগৎটাই তার উপযোগী ব'লে আমার মনে হয়। মনে-মনে বলি: 'আমি মোটা তারের মানুষ, আমার কথা আলাদা, কিন্তু

মিলি না-ই বা জানলো যে পৃথিবীতে ক্ষুধা আছে, কুশ্রীতা আছে, আছে দুঃখ, লোভ, অহংকার।' এই রকম আমি ভেবেছিলাম—অন্তত কিছুদিন পর্যন্ত তার সূক্ষ্ম পথ্যের বদল করার চেষ্টা করিনি।

(এর মানে কি এই যে আমি তখন থেকেই তাকে অচেতন মনে করুণা আর অবজ্ঞা করছি ছেলেমানুষ ব'লে? কিন্তু কেমন ক'রে আমি তা করতে পারি, যখন জানি যে বয়সের হিশেবে আমিও ছেলেমানুষ, আর এই মেয়েই সারা জীবনের সঙ্গিনী হবে আমার?)

যেখানে তার সঙ্গে আমার স্বাধীন বিচরণের সুযোগ ছিলো, সেটা রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'। কিছু দিন আগে ভোটের জোরে মোটা হ'য়ে বেরিয়েছে। সে-বইখানার এক মলাট থেকে আরেক মলাট, প্রত্যেক স্তবক, প্রত্যেক পংক্তি, তার সঙ্গে নতুন ক'রে প'ড়ে ফেললাম। আমার খুশি আর ধরে না, যখন সে একটিও ভুল না-ক'রে আবৃত্তি ক'রে যায় সম্পূর্ণ 'বর্ষশেষ' বা 'তাজমহল'। মেয়ের কৃতিত্বের (আর আমার শিক্ষকতার) পুরস্কার স্বরূপ গিরিজাবাবু পঞ্চাশ টাকা দামের জাপানি-বাঁধাই 'কাব্যগ্রন্থ' কিনে দিলেন, 'ডাকঘর' প'ড়ে একসঙ্গে কাঁদলাম দু-জনে। আস্তে-আস্তে পলগ্রেভ ধরালাম তাকে : মহামতি ওঅর্ডস্বার্থকে এড়িয়ে শেলি, কীটস, আর কোলরিজ।

ততদিনে বছর ঘুরেছে, আবার গ্রীষ্মের ছুটি, গগন-কুটির আবার বাড়ির ছেলেকে অভ্যর্থনা করলে। এর আগে পুজোর ছুটিতে আর ক্রিসমাসে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সম্ভাষণের অভাব ঘটেনি, কিন্তু কোনো পক্ষেই হৃদ্যতা ছিলো না। গ্রীষ্মের ছুটির তৃতীয় সাক্ষাতে বিরুদ্ধভাব জেগে উঠলো।

হুতোমগঞ্জে মণ্টু যে মিলির ভাই ছিলো সে-কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ঢাকায় তাকে দেখার পর আমার পক্ষে কল্পনা করা কঠিন হ'লো যে এই বলবান যুবকটির সঙ্গে মিলির [illegible] সম্বন্ধ আছে। বোনের যদি স্বাস্থ্যের অভাব থেকে থাকে, তার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করেছেন ভাই : তারও বেশি, আধ-ডজন বাঙালির পক্ষে যথেষ্ট স্বাস্থ্য এক দেহে ধারণ করে সে। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা (সগর্বে প্রথম দিনেই সে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলো

তথ্যটা), বুকের মাপ মস্ত, হাত-কাটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে নিজের পেশীর সঞ্চালন নিজেই অবলোকন করে, চলাফেরার সময় হঠাৎ মাঝে-মাঝে 'হুম্‌' ব'লে আওয়াজ ছেড়ে লম্ফ দিয়ে ওঠে। অথচ এতেও সে হাস্যকর হ'য়ে ওঠে না, এক অনাক্রমণীয় গাম্ভীর্য বজায় রাখে সব সময় ; যেমন নিজে সে ঠাট্টা জানে না, তেমনি তাকেও ঠাট্টা করার কারো সাধ্য নেই। বয়সের চাইতে বড়ো দেখায় তাকে—শুধু আকারে নয়, প্রকারেও ; যৌবনে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে যেন জীবনটাকে বুঝে ফেলেছে ; কী করবে, কী হবে, আর কেমন ক'রে সেই অভীষ্টে পৌঁছবে, সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। যেমন নানা দিকে তার চোখ-কান খোলা, তেমনি ব্যবহারে আর কথাবার্তায় সে চতুর। শীতকালে এসেই আবিষ্কার ক'রে ফেললো টেনিস খেলার জায়গা—আর সেটা আমাদেরই কলেজে ; শাদা কেডস, ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরা, গায়ে নীল ব্লেজার—ঝকঝকে সাইকেলটি চ'ড়ে র‍্যাকেট হাতে সন্ধের পরে ফেরে সে—অনুভব করে যে পাড়ার মধ্যে, বিশেষত তরুণীদের মধ্যে, সে হ'য়ে উঠেছে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য ও আলোচ্য বস্তু—ফিরে এসে একটি গ্লাশ গরম দুধ আস্তে-আস্তে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খায়, সবটুকু, নিঃশেষে। দুগ্ধপানে অস্বাভাবিক দক্ষতা ছিলো তার ; কলকাতার হস্টেলে ও-বস্তু দুর্লভ ব'লে বাড়ি এসে সেটা পুষিয়ে নেয়, সকাল থেকে সন্ধের মধ্যে সের ।তনেক অপসারিত করতে তার অসুবিধে হয় না—তার মা আক্ষেপ করেন অনুরূপ রুচি মিলির নেই ব'লে।

এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন দেখা হ'লো মণ্টু আমাকে প্রথম কথা বললে—'কী হে কবি, কেমন আছো ?'

আমি বললুম, 'তার মানে ? আমি কবি হলাম কবে ?'

'লুকিয়ে-লুকিয়ে কবিতা লেখো না ?'

মিলি বললে, 'লুকিয়ে লিখবে কেন ? কবিতা লেখাটা কি লজ্জার ব্যাপার ?'

এক পলক বোনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তা আমি ত্যাখো ও-সব কবিতা-টবিতার ধার ধারি না।'

আমি বললাম, 'কেন? ছেলেবেলায় তো লিখতে।'

হঠাৎ একটু বেশি জোরে হেসে উঠলো মণ্টু; সেই শব্দে, আমার মনে হ'লো, তার ছেলেবেলার সেই দুষ্কর্মের ভূতটা লজ্জা পেয়ে আর-একবার ম'রে গেলো। 'ছোঃ! ও-সব ছেলেবেলার কথা ছেড়ে দাও। ছেলেবেলায় মানুষ কী বা না করে। তখন কোনো বুদ্ধি হয় নাকি?'

মিলি আবার কথা বললে, 'তুমি কি বলতে চাও বড়ো হ'য়ে যারা কবিতা লেখে তারা সবাই বোকা?'

মণ্টু অন্য দিকে তাকিয়ে একটা গানের সুর ভাঁজলো। এই একটা অদ্ভুত অভ্যেস ছিলো তার: কোনো কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ গানের সুর ভাঁজা, অন্যদের অপদস্থ করার জন্য এই একটা উৎপীড়ক উপায় তার হাতে ছিলো। হুতোমগঞ্জে মাঝে-মাঝে সে দু-একখানা ব্রহ্মসংগীত গেয়েছে; কোনো ডিস্ট্রিক্ট জজের বিদায় উপলক্ষে বা স্কুলের পুরস্কার-বিতরণের সময়; এখন—তার মুখ থেকেই সংগ্রহ করলাম—তার ঝোঁক হয়েছে রাগসংগীতে, কলকাতায় মাঝে-মাঝে জলসায় যায়, নিজেরও শেখার ইচ্ছে আছে যদি এঞ্জিনিয়ারিং প'ড়ে সময় হয়। আমাকে রাগ-রাগিণীর নাম শুনিয়েছে অনেক; আর যতই বুঝেছে আমি এ-বিষয়ে অজ্ঞ, ততই উৎসাহ বেড়ে গেছে তার।

ঘরের মধ্যে একটু পাইচারি ক'রে, দুই হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে, মিলির টেবিলের সামনে দাঁড়ালো মণ্টু। একটা বই তুলে নিয়ে ভুরু কুঁচকোলো।

' "ঘরে-বাইরে"! কে আনলো এটা?'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'ওটা আমার বই। আমি এনেছি।'

'মিলি পড়েছিস?'

'হ্যাঁ, দাদা। কালই শেষ করলাম।'

আমার দিকে তাকিয়ে আরো বেশি গম্ভীর হ'লো মণ্টু। 'নীলু, এটা ভালো করোনি।'

'কী ভালো করিনি ?' আমি বুঝতেই পারলাম না কথাটা।

'তুমি কি জানো না মিলি ছেলেমানুষ ? আর "ঘরে-বাইরে" অশ্লীল বই ?'

আমি হেসে উঠলাম। 'কী যা-তা বলছো !'

'হাসির কথা নয়। এ-সব বই কখনো পড়া উচিত নয় অল্প বয়সে।'

'তুমি পড়েছো ?'

' "সাহিত্যদর্পণে"র সমালোচনা পড়েছিলাম।'

'ও—!' আমার আবার হাসি পেলো, কিন্তু মণ্টুর সম্মানরক্ষার্থে চেপে গেলাম। 'বইটা পড়োনি ?'

'আমার কি এত সময় যে যে-কোনো বই খুঁটে-খুঁটে পড়তে পারি ? তবে এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে রবিবাবু বইখানা লিখে ভালো করেননি, আর তুমি তার চেয়েও খারাপ করেছো মিলিকে এটা পড়তে দিয়ে।'

তার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। মিলি মুখ লাল ক'রে বললে, 'তুমি আমার উপর সর্দারি কোরো না তো, দাদা !'

'আমার যা ভালো মনে হয় আমি তা বলবোই। দরকার হয় বাবাকেও বলবো,' ব'লে মণ্টু, কারো দিকে আর না-তাকিয়ে, মাথা উঁচু ক'রে বেরিয়ে গেলো।

সময়ে সবই বদলায়, বয়সের সঙ্গে মানুষ ভালো হয়, মণ্টুর সঙ্গে পরে (এবং শেষ) যেবার দেখা হ'লো, এ-সবের জন্য ক্ষতিপূরণের সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। এই সময়ের বছর দশেক পরে, যখন নাৎসিদের উত্থান হয়েছে কিন্তু আর-একটা যুদ্ধের কথা কেউ ভাবছে না, মণ্টুর দেখা পেলাম একবার বার্লিনে বেড়াতে এসে। একটা ফ্যাক্টরিতে চাকরি করছে তখন, অস্ট্রিয়ান মেয়ে বিয়ে করেছে। আমাকে হোটেল থেকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে এলো, আমার জন্য মস্ত পার্টি দিলে ভারতীয় আর জর্মান বন্ধুদের ডেকে, হ্বান্‌জে হ্রদের ধারে মনোরম লাঞ্চ খাওয়ালো রবিবারে, আর সেদিনই সন্ধেবেলা ঘরে ব'সে প'ড়ে শোনালো মূল ভাষায় হাইনে আর হ্যেল্‌ডার্লিন। তার বাড়িতে, তার অস্ট্রিয়ান স্ত্রীর মুখে, আমি প্রথম রাইনের মারিয়া রিলকে-র কবিতা শুনলাম।

—কিন্তু ক্ষতিপূরণ? তা কী ক'রে হয়, কখনোই হ'তে পারে না, বিশ্বের বিধানে কোনো ক্ষতিপূরণের স্থান নেই। পূরণ করার জন্য এগিয়ে আসতে পারে অনেকে, কিন্তু সেই উপঢৌকন নেবে কোন মানুষ? সে-মানুষ কি আর আছে।

ভালো লেগেছিলো সেবার বার্লিনে, ভালো লেগেছিলো মণ্টুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে। তখন জর্মানিও উজ্জ্বল, মনীষীরা তখনও স্বদেশত্যাগী হননি, স্বস্তিকা-ধারী নাৎসিরা দাপাদাপি ক'রে বেড়ালেও অনেকেই তাদের সং ভেবে উড়িয়ে দিচ্ছে। —কিন্তু, সব সত্ত্বেও, আমার বুঝতে বাকি থাকেনি যে মণ্টুর মনের তলায় একটা গোপন, চুরি-করা ভাবের শ্রদ্ধা আর সহানুভূতি আছে নাৎসিদের জন্য। তাই, অন্য অনেক বিষয়ে কথা উঠলেও, সেই প্রসঙ্গটা আমি এড়িয়ে গেছি।

আরো একটা বিষয়ে একবারও উল্লেখ করিনি আমরা। মিলির নাম কখনো মুখে আনিনি।

আজ খবর পেলাম দু-সপ্তাহ পরে আমাকে জেনেভায় যেতে হবে, সেখান থেকে নেপলস, তারপর সিসিলি। পথ ভালো লাগে আমার, পথিকবৃত্তি বেছে নিয়েছি;—আমার মধ্যে এমন কোনো সৃষ্টিশীল উত্তম নেই যার জন্ম কিছুটা স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বাস করা দরকার হ'তে পারে, আর সাধারণ উত্তম যেটুকু আছে তা খরচ করার জন্যে এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় আমি ভাবতে পারি না—এই পাঁচমিশেলি কাজ, পাঁচমিশেলি লোক, এলোমেলো ভ্রমণ। কোথাও কোনো পিছুটান নেই, হাতে কিছুই জ'মে উঠছে না, পথে-পথে যা-কিছু কুড়োই পথেই সব ফুরিয়ে দিতে পারি।

—কিন্তু সময় হ'লো; এই কাহিনীর নায়িকাকে আর নেপথ্যে রাখা চলে না।

—কিন্তু অদ্ভুত নয় কি, এই যে আমি শীতের রাত্রে ব'সে-ব'সে এই কথাগুলো লিখছি, আর তাও বাংলা ভাষায়? সারাদিন কাটে য়ুনেস্কোর দপ্তরে, নানা দেশের মানুষ কাজ করে সেখানে, নানা দেশের মানুষের নিত্য যাওয়া-আসা, লাঞ্চের সময় খাবার ঘরে কান পাতলে পঁচিশটা ভাষা শোনা যায়, আর বিষয় অনুসারে, সঙ্গী অনুসারে, নিজের মুখের ভাষাও বদলে নিতে হয় ইংরেজি থেকে ফরাশিতে, এবং ফরাশি থেকে জর্মান অথবা ইটালিয়ানে। একটা স্যুট থেকে আর-একটা স্যুটে বদলি হওয়া যত সহজ, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষাতেও তা-ই—তা-ই মনে হয়, অন্তত, এ-সব বিখ্যাত 'আন্তর্জাতিক' আবহাওয়ার মধ্যে কিছুদিন কাটালে পরে। মনে হ'তে থাকে, 'ন্যাশনালিটি' ব্যাপারটা আকস্মিকঘটিত এক উদ্ভাবনমাত্র; যে-দেশে বা সে-সংশ্রবে জন্মেছিলাম সেই অনুসারে আমি রাশিয়ান না চিলিয়ান, সুইডিশ না আইরিশ, বাস্ক্ না নিগ্রো না মার্কিন না বাঙালি—তাতে কিছুই এসে

যায় না, ও-সব বিভেদের অর্থ ছিলো যতদিন ভৌগোলিক বাধার জন্য মেলামেশা ছিলো কম—কিন্তু আজ এই জেট-প্লেনের যুগে, বিচিত্র আন্তক্ষর-সম্পন্ন নিত্যনতুন বিশ্বজোড়া সংঘের যুগে, আমরা সবাই এক ফুটন্ত কটাহে প'ড়ে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে সুখজনকভাবে এক হ'য়ে যাচ্ছি। যত বাড়ছে দেশে-দেশে সন্দেহ, ভ্রমণের নিষেধ, সীমান্ত পার হ'তে হ'লে আইনকানুনের কড়াক্কড়, ততই মানুষ বেশি ভ্রমণ করছে, পার হচ্ছে আরো দূর-দূর সীমান্ত, ততই পৃথিবীর বড়ো-বড়ো নগরগুলিতে, আরো বেশি বিশেষ এক-একটা কেন্দ্রে, টগবগ ক'রে উথলে উঠছে মানবতার কড়াই—তার ফেনার পুঞ্জে গ'লে যেতে-যেতে আমরা ভাবছি, 'কী ভালো! আমরা আর কোনো দেশের থাকছি না, আমরা হ'য়ে উঠছি বিশ্বের!'

কিন্তু তা-ই কি সত্য? আপিশ থেকে যখন বেরোই রীতিমতো রাত নেমে যায়; বৃষ্টি বরফ কুয়াশার মধ্য দিয়ে প্যারিসীয় ভিড় অন্তহীনভাবে চলেছে; মুহূর্তে আমি মিশে যাই তার মধ্যে, যেন সমুদ্রে এক বালতি জল ডুবে গেলো, একটু ফাঁক থাকে না কোথাও, এক উদার ও নিরপেক্ষ জগৎ লক্ষ বাহু মেলে আমাকে বুকে টেনে নিচ্ছে। আপিশে ব'সে থাকার ক্লান্তি কাটাবার জন্য মাইলখানেক হেঁটে গিয়ে কোনো-এক চেনা কাফেতে বসি, চেনাশোনা কারো-না-কারো সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়, দলে প'ড়ে কোনোদিন কোনো নামজাদা রেস্তোরাঁয় ডিনার, তারপর রাসীনের নাটক, বা হ্বাগনারের ট্রিস্টান, বা কোনোদিন হয়তো হালকা মেজাজের ইটালিয়ান অপেরা। আর এই সব শেষ ক'রে—অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে—এই লেখা! একটু অদ্ভুত নয় কি? সারাদিন যাদের সঙ্গে কাটাই তারা কি কল্পনাও করতে পারবে রাত্রে একলা হ'লে আমি কী ভাবি, কী করি? আমি নিজেও একটু অবাক হ'য়ে গিয়েছি যে এতগুলো পাতা সাবলীলভাবে বাংলায় লিখে উঠতে পারছি। আরো মৌলিক প্রশ্ন: বাংলাতেই কেন লেখার কথা মনে এলো আমার?—কিন্তু তা দে'র কথা যে বাংলায় ছাড়া আর-কি-তেই লেখা যায় না!—একটা বাংলা বই পড়ি না কত বছর হ'য়ে গেলো, কত

কাল কেটে যায় বাংলা ভাষার একটা আওয়াজ কানে না-শুনে। তবু কী অমোঘভাবে বাঙালি থেকে গেছি!

জানি না এটা বাঙালির চরিত্রেরই কোনো দুর্বলতা কিনা—তার এই বাঙালিত্বের গোঁয়ার্তুমি, হাজার ধোপ খেয়েও গোপনে যার রং লেগে থাকে। দিল্লিতে বাঙালির একটা বদনাম শুনতুম: 'তিনজন বাঙালি একত্র হ'লেই বাংলায় কথা বলতে শুরু ক'রে দেয়।' তা ছাড়া আর-কিছু যে সম্ভব নয় বা সহনীয় নয় এমন চিন্তা কারো মনে আসে না সেখানে। অবাঙালিরা এখনো অনেকে ইংরেজিতে উপন্যাসাদি লেখেন, এ নিয়ে মাঝে-মাঝে আমি মৃদু বিস্ময় প্রকাশ ক'রে দেখেছি—বিস্ময়ের কারণটাই সেই সব লেখকদের ধারণার বাইরে। আগন্তুককে আত্মসাৎ ক'রে নেবার শক্তি আমেরিকার মতো আর-কোনো দেশের নেই; সেখানে, দেখেছি, য়োরোপের নানা দেশের মানুষ এসে কেমন ছ-মাসের মধ্যেই বাধো-বাধো ইংরেজি নিয়েও মার্কিন হ'য়ে ওঠে; কিন্তু বাঙালিরা চল্লিশ বছর কাটাবার পরেও হাত নাড়ে অবিকল বাঙালি ধরনে, বিরক্তি বা অধৈর্যসূচক যে-আওয়াজটি চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বের করে তা বাঙালি ছাড়া আর কারো আসে না। নিউ ইয়র্কের হার্লেম পাড়ায় এক 'ভারতীয়' খাবার দোকানে হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলাম এক অগস্ট মাসের দুপুরবেলা; নোংরা জায়গা, খাবার মুখে দেবার মতো নয়, কিন্তু দোকানের মালিকটি স্মরণীয়। অনির্ণেয় বয়সের কালো আর বিধ্বস্ত চেহারার মানুষ, তার ইংরেজি বিশ্রী, কিন্তু আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে আলাপ শুরু ক'রে দিলে অন্য এক ভাষায়—যে-ভাষাকে, একটুক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার পর, আমি চাটগাঁ কিংবা নোয়াখালির বাংলা ব'লে চিনতে পারলুম। লোকটি মুসলমান, লস্কর ছিলো মালের জাহাজে, একবার নিউ ইয়র্ক বন্দরে এসে অসুখে প'ড়ে হাসপাতালে যায়, তার সেরে-ওঠার জন্য অপেক্ষা না-ক'রে জাহাজ তাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলো। সে পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা—কাইজারি যুদ্ধেরও দেরি আছে তখনও। তারপর আর জাহাজের কাজে ফিরে যাওয়া হ'লো না; খোদা তাকে

মা[illegible]ই রেখে দিলেন। খাওয়া-পরার অকুলোন হয়নি ; জুতো পালিশ থেকে ট্রাক চালানো পর্যন্ত অনেক রকম কাজ পেয়েছে ও ছেড়েছে ; অবশেষে এক সিংহলি [illegible]াঁয় ছোটো-রাঁধুনির চাকরিতে ঢুকে কিছু-কিছু জমাতেও পারলে ; একটি নিগ্রো মেয়েকে বিয়ে ক'রে তারই বুদ্ধিতে এই দোকান খুলেছিলো প্রায় তিরিশ বছর আগে। মার্থা ছিলো কাজেকমে পটু, স্বভাবটিও মিষ্টি, এক হাতে সংসার আর-এক হাতে দোকান চালাতে পারতো সে, 'কিন্তু আমার কপালে সুখ সইলো না, মার্থা ম'রে গেলো।' তার এখনকার বৌ এক পুএর্টো-রিকান (নিশ্চয়ই তাকে শয়তানে উশকেছিলো, নয়তো আবার বিয়ে করার মতি হবে কেন), আস্ত ডাইনির বাচ্চা, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে এদিকে কাজে অষ্টরম্ভা, 'বাপের বাড়ির গুষ্টিকে আমার ঘাড়ের উপর এনে ফেলেছে, রোজ রাত্রে একবার দোকানে এসে হিশেবের খাতা ত্যাখে—আর নগদ যতটা বাগাতে পারে ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে যায়। মার্থা যা গ'ড়ে তুলেছিলো ঐ রাক্ষুসি নষ্ট ক'রে দিচ্ছে সেই দোকান—আমি বুড়ো হচ্ছি, তেমন মেহনৎ করতে পারি না আর, মার্থার ছেলেরা সৎমার যাতনা সইতে না-পেরে টেক্সাসে চাষের কাজ নিয়ে চ'লে গেছে—এখন দেখছেন কাঁটা-চামচেগুলো তেমন পরিষ্কার নয়, এই গরমির দিনে মাছি পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় টেবলক্লথে, কিন্তু পাড়ার লোকেরা ভুলে যায়নি এই দোকান এককালে কী ছিলো! তা যা-ই হোক, যা হবার তা হয়েছে, যা চ'লে যাবার চ'লে যাচ্ছে, এখন—' আমার চোখে-মুখে সমবেদনা দেখে লোকটি তার দুঃখের কথা একটু সবিস্তারেই শোনালে আমাকে, আর সবশেষে বললে যে এখন আর তার আর-কোনো সাধ নেই, শুধু একবার নোয়াখালিতে ফিরতে চায়, মরতে চায় দেশে ফিরে গিয়ে। যে-নোয়াখালি সে ছেড়ে এসেছিলো তা যে আর নেই, ওখানে কেউ যে আর চিনবে না তাকে, সেও আর মিশে যেতে পারবে না, মরবার পক্ষে যে-কোনো দেশই যে একই রকম, কবরের তলায় সব দেশেই যে সমান ঠাণ্ডা, সমান স্তব্ধ আর অন্ধকার—এ-সব কথা আমি অবশ্য তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম না, কেননা এর কিছুই তার বুদ্ধির অগম্য নয়।

তবু—ঐ এক পোকা ঢুকেছে তার মাথায়, শিশুর মতো এক আব্দার—'দেশে ফিরে যাবো, দেশে গিয়ে মরবো।' আমেরিকার বাসিন্দা হ'য়ে পঁয়তাল্লিশ বছর কাটাবার পর কোনো চেক কিংবা জর্মান কিংবা আইরিশের পক্ষে এ-রকম প্রলাপ সম্ভব কিনা আমি জানি না।

—কিন্তু হয়তো সবই আমার ভুল। হয়তো সব দেশের মানুষই একরকম, আমি বাঙালি হ'য়ে জন্মেছিলুম ব'লে বাঙালিদের ভাবভঙ্গি বেশি বুঝতে পারি, সহজে পারি তাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে। শাগাল যে-রাশিয়াকে ত্যাগ ক'রে এসেছিলেন সেই রাশিয়ার স্বপ্নরূপ জলজ্বল করছে তাঁর ছবিতে। কী হয় ব্যাপারটা? দেশের টান? —না, ছেলেবেলার টান, জীবনের সেই অমূল্য কয়েকটা বছর যখন পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এই প্রত্যক্ষ জগৎ অনবরত আঘাত করছে আমাদের, যখন পর্যন্ত আমরা জ্ঞানী হইনি, তার্কিক হইনি, সুবিবেচনার অধিকারী হইনি। কে এমন আছে যে সেই ছেলেবেলায় ফিরে যেতে না চায়, না চায় তার ছেলেবেলাকে ফিরে পেতে? হার্লেমের ঐ বুড়ো দোকানদার যদি লিখতে কি আঁকতে পারতো তাহ'লে আর মরবার জন্য নোয়াখালিতে ফিরতে চাইতো না।

মাঝখানকার কিছু সময় বাদ দিয়ে যাই; নিজেকে দেখতে পাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু সিঁড়িতে, মিলি আছে কলেজে। জীবনের এই সময়টায় মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে ও বদলায়; সতেরোর সঙ্গে উনিশের, আবার উনিশের সঙ্গে একুশের ব্যবধানটা বিরাট, অথচ সাত আর আট বছরে মানুষ একই রকম থাকে, উনতিরিশ আর তিরিশেও তা-ই। অতএব এটুকু বলাই যথেষ্ট যে চোদ্দ বছরের মিলির আজ সতেরো হ'লো, আর আমি একুশের ভরা জোয়ারে [illegible] ভাসিয়েছি।

শীতের সেই বিকেল, যেদিন তাপসীকে আমাদের বাড়িতে প্রথম দেখলাম। বাড়ির মাঝখানকার ঘরটায় মা থাকেন, সেটা সরকারি ঘর, পারিবারিক বৈঠকের জায়গা, আর সেখানে কখনো বাড়তি বিছানা পড়েনি এমন বড়ো মনে পড়ে না আমার। আমি কলেজ থেকে

ফিরে বারান্দা দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছি, মা-র ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম।

'নীলু, শোন। আয় এখানে।'

আমি ঘরে ঢুকে একজন নতুন মানুষকে দেখলাম।

'এই আমাদের তপু। তাপসী।' আমাকে নীরব দেখে মা আবার বললেন, 'ওকে সেবার দেখিসনি বরিশালে?'

মনে হ'লো আগে কোথায় দেখেছি, অথচ ঠিক মনে পড়ছে না। আমার মা হেসে বললেন, 'যা লাজুক ছেলে, চোখ তুলেই তাকায় না কারো দিকে!' আর ঠিক তখনই, দৈবাৎ, তাপসীর চোখে আমার চোখ পড়লো। মুহূর্তে মনে প'ড়ে গেলো তার আনত, নম্র ভঙ্গি, জলের জগ হাতে আমার সামনে নিচু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ খুব সুখী মনে হ'লো নিজেকে—জানি না কেন খুব ভালো লাগলো। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'আপনি আসবেন আমি তো জানতুম না।'

মা জবাব দিলেন—'আহা, বাড়ির যেন কোনো খবরই রাখিস তুই।'

মা যাকে 'বাড়ির খবর' বলেন—যার অর্থ পাঁচমিশেলি নিশ্চরিত্র আত্মীয়দের আনাগোনা—তাপসী যে তারই অন্তর্ভূত এই ভাবটা আমার ভালো লাগলো না। জিগেস করলাম, 'আপনি কি এইমাত্র এলেন বরিশাল থেকে?'

'এই কয়েক ঘণ্টা আগে।'

'স্টীমার সন্ধেবেলা আসে না?'

'আজকাল সময় বদলেছে। রাত দুপুরে ছাড়ে, দু-দিন পরে দুপুরবেলা পৌঁছয়।'

'একা এলেন?'

'আমাদের পাড়ার কুঞ্জবাবুও আজ এলেন বরিশাল থেকে,' জবাব দিলেন আমার মা। 'তপু, চল তোকে আমার বাগান দেখিয়ে আনি।'

'গোলাপ ফুটেছে বুঝি, মা?' আমি হেসে ফেললাম। 'কিন্তু তোমার ঐ পাঁচ হাত জমির তিনটে গাছপালাকে বাগান বোলো না তো।'

'তপু তো আর তোর মতো নয়,' মা চোখে হেসে বললেন, 'তপু ফুল ভালোবাসে।'

'কেন ?' তাপসী অবাক হ'লো। 'উনি—আপনি—ফুল ভালোবাসেন না ?'

'ভালোবাসি না তা নয়, কিন্তু তা নিয়ে বাড়াবাড়ি ভালোবাসি না। ফুল তো আর নিজের চেষ্টায় সুন্দর হয়নি, অত তারিফ করবার কী আছে ?'

'সত্যি তো!' আমার কথা শুনে খুব যেন অবাক হ'লো তাপসী। 'কিন্তু গাছে যখন ফুল ফুটে থাকে তা দেখতে ভালো লাগে না আপনার ?'

'ভালো তো আমাদের কত কিছুই লাগে, কিন্তু তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।'

'প্রমাণ ?' তাপসীর মুখে মৃদু একটি হাসি ছড়িয়ে পড়লো, 'ফুল আবার প্রমাণ করবে কী ?'

মা বললেন, 'থাক, এ-সব তত্ত্বকথা থাক এখন। নীলু, তোর ঘরে গিয়ে বোস, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'চলো, মা, আমিও দেখে আসি তোমার গোলাপ,' যেন মা-র প্রতি করুণাবশত আমি রাজি হলাম। 'জানেন, মা-র এই গোলাপের একটা ইতিহাস আছে।'

মা বললেন, 'ও-রকম আপনি-আপনি করিসনে তো তোরা—বিশ্রী শোনায়।'

সত্যি তা-ই, 'আপনি'টা বজায় রাখা যায়নি বেশিদিন, বজায় না-রাখার জন্য কোনো চেষ্টাও করতে হয়নি। খুব সহজে, স্বাভাবিকভাবে, আর অল্পদিনের মধ্যে, তাপসীর সঙ্গে আমি একটা আত্মীয়তা অনুভব করলাম। অ[illegible]য়তা : কিন্তু চাপা, সলজ্জ, ব্যক্ত হ'তে অনিচ্ছুক, কিংবা যেন তার কোনো ভাষা অথবা [illegible] খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমার বরিশালের দিদি তাঁর এই দেওরঝিকে আমার মা-র কাছে কেন পা[illegible]য়ে[illegible]ন, তা জানতে আমার দেরি হ'লো না। বরিশাল থেকে আই. এ. পাশ ক'রে ব'সে আছে ; আর প'ড়ে কী বা হবে, এবার নারীর জীবনের পরম

পতিটি কোনোরকমে যদি ঘ'টে যায়। এই খবরটা শুনে কেমন একটা ভোঁতা রাগ অনুভব করেছিলাম, মনে পড়ে।

এই প্রথম নয়, মা-র আশ্রয়ে বিবাহযোগ্যা আত্মীয়াদের হাজির হওয়া। যেমন সন্তানের জন্মের সময় আর্তনাদ, তেমনি শামিয়ানা-খাটানো বিয়ের বাদ্যিও একাধিকবার শুনতে হয়েছে আমাকে। এ-সবই এ-বাড়ির রুটিনের অন্তর্গত। কিন্তু এই প্রথম, যখন এই সব অতিথি, যারা অস্থায়ী অথচ স্বল্পস্থায়ী নয়, তাদের কারো বিষয়ে আমার মনের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগলো।

অনূঢ়া মেয়েদের অবস্থাটা ঈর্ষাযোগ্য ছিলো না সে-সময়ে, বিশেষত ভাগ্য যদি তাদের ঠেলে দিয়েছে মা-বাপ ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয়ে। বেকার যুবকের ক্ষমা ছিলো ; সে অন্তত আইনের ক্লাশে ভরতি হ'য়ে বেকার-নাম ঘোচাতে পারতো ; বিয়ে ক'রে শ্বশুরবাড়িতে সমাদর, আর নিজের বাড়িতে মর্যাদালাভেরও বাধা ছিলো না। আমার মা-কেই দেখেছি অনেক গুম্ফবান কর্মহীন পারিবারিক জামাতাকে মাসের পর মাস আপ্যায়ন করতে। কিন্তু মেয়েদের তখনও বিয়ে না-হওয়া পর্যন্ত কলেজের লগি ঠেলার চল হয়নি ; বেশির ভাগই ম্যাট্রিকে পৌঁছয় না, ম্যাট্রিকের পরে বিরাট একটা অংশ ঝ'রে পড়ে, আর অত্যন্ত অগ্রসর বা অবস্থাপন্ন পরিবারে ছাড়া কেউ কল্পনাও করে না যে মেয়েদেরও বি. এ., এম. এ. পাশ করাবার কোনো প্রয়োজন আছে। তাই, পনেরো-ষোলোর মধ্যে যে-মেয়ের বিয়ে হ'য়ে না-গেলো, সে পরিবারের মধ্যে একটু বেকায়দায় প'ড়ে যায় ; কেউ যে কোনো রূঢ় ব্যবহার করে তার সঙ্গে তা নয় (অন্তত কোনো স্নেহলতার আত্মাহুতির প্রয়োজন হয় না আর) —কিন্তু তার যেন কোনো নির্দিষ্ট আসন নেই, নিয়ম-মতো কোনো খানেই সে জায়গা পায় না ; ট্রেনের জন্য ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করার মতো একটু উশখুশানি এড়াতে পারে না সে, আর তার দিকে তাকিয়ে—সাধারণত অন্যেরাও না।

কোনো-কোনো মেয়ে—আমি আমাদের বাড়িতেই দেখেছি তাদের—এই সময়টায় ক্ষণিকের জন্য মধুর নারীত্বে বিকশিত হয় ; নরম ক'রে কথা

বলে, নরম ক'রে তাকায়, চাকরকে কেউ জল দিতে বললে ছুটে গিয়ে নিজে এনে দেয়, মাথা নিচু ক'রে পান সাজে, ঘরে-ঘরে বিছানা পেতে রাখে সকলের—সকলকেই বুঝতে দেয় যে সে তাদের কোনো কাজে লাগার জন্য উৎসুক। এমনি ক'রে তারা সার্থক ক'রে তুলতে চায় নিজের অপেক্ষমাণ অস্তিত্বটাকে, একেবারে বেদরকারি তাকে যেন না ভাবে কেউ, আর হয়তো এ-কথাটাও মনের মধ্যে কাজ করে যে পরিবারের চোখে যত বেশি 'লক্ষ্মী মেয়ে' হ'তে পারবে, ততই বেড়ে যাবে পরিণয়ের সম্ভাবনা, এগিয়ে আসবে সেই তারিখটি যেদিন সে নিজস্ব একটা অধিকার পাবে, পাবে গৃহ, সংসার, জীবন। আবার সেই মেয়েদেরই দেখেছি, বিয়ের ছ-মাস পরে বেড়াতে এসে পাতিহাঁসের মত চ্যাঁচাতে, দিবানিদ্রায়, পরচর্চায়, টোয়েন্টি-নাইন খেলায় শ্বশুরবাড়ির খাটুনির শোধ তিন-ডবল তুলে নিতে।

প্রথমে—ক্ষণিকের জন্য—আমার ভুল হয়েছিলো: তাপসীকেও সেই রকমই ভেবেছিলাম। তার কথায়, চলাফেরায়, ব্যবহারে এমন একটা সক্ষম মৃদুতা দেখতে পাই যাকে আমি—বোকা ছেলে!—বানানো ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারিনি প্রথমে। কিন্তু আমার ভুল ভাঙতেও দেরি হ'লো না। সে যে কারো অনুগ্রহ পাবার জন্য অস্থায়ীভাবে 'লক্ষ্মী মেয়ে' হ'য়ে ওঠেনি, এই কথাটা দু-চারদিন না-যেতেই আমি বুঝেছিলাম। ঠিক বুদ্ধি দিয়ে বুঝিনি—ততটা সাংসারিক বুদ্ধি তখন ছিলো না আমার, এখনও আছে কিনা জানি না—গায়ে রোদ পড়লে যেমন তাপ লাগে এও যেন সেইরকম। নিজের মধ্যে সে এমন সম্পূর্ণ যে তার যে কোনো স্বামী বা আলাদা সংসারের প্রয়োজন আছে তা-ই যেন ভাবা যায় না। বহু অতিথির সংসারে মা-র উপর চাপ পড়ে, কয়েক দিনের মধ্যেই তাপসী তাঁর ডান হাত হ'য়ে উঠলো। আর মা, তাঁর নিজের কন্যা নেই ব'লে, যে-কোনো মেয়ের বিষয়েই দুর্বল; বাড়িতে যে যখন থেকেছে সকলকেই ভালোবেসেছেন তিনি, কিন্তু তাপসীর প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত—যে-আমি অনেক-কিছুই লক্ষ করি না, আমারও তা চোখ এড়ালো না। ক্রমে আমি আস্তে-আস্তে পূর্ব ইতিহাস

জানতে পারলাম : তাপসীর মা-র মৃত্যুর সময় আমার মা ছিলেন কাছে ; তাপসীর যখন দেড় বছর বয়স তাকে কাছে এনেও রেখেছিলেন কিছুদিন ; তারপর বড়দির কাছে অনেকবার দেখেছেন। সেইজন্যেই সে প্রথম থেকেই 'আমাদের' তপু। ঐ স্নেহের সম্বোধন অক্ষরে-অক্ষরে সত্য হ'য়ে উঠলো ; মা-র এমন ভাব যেন তপুকে না-হ'লে তাঁর চলে না, সে না-আসাতে এতদিন এই বাড়িতে মস্ত একটা ফাঁকা ছিলো যেন।

আর, মা-র এই ভাব দেখে, আমার মনে অবশ্য ঈর্ষা জাগে, মিলির কথা ভেবে ঈর্ষা জাগে।

মিলি কিন্তু দেখামাত্রই তাপসীকে ভালোবেসে ফেললো। বয়সে যদিও বছরখানেকের বেশি তফাৎ নয়, তাকে ডাকে তপুদি ব'লে, আর তাপসী এমন করে ওর সঙ্গে যা কোনো সত্যিকার দিদি কখনো করে না—শুধু পাতানো দিদিরাই কখনো-কখনো ক'রে থাকে। দু-জনকে একসঙ্গে দেখলে মনে হয়, তাপসী অন্তত দশ বছরের বড়ো। ছেলেমানুষ মনে হয় মিলিকে : অসহায়, স্নেহলিপ্সু, অত্যন্ত মধুর এবং কিছুটা করুণ—সে যে বহু যত্নে লালিত হবার মতো এক দুর্লভ সামগ্রী তা তাপসী আরো বেশি স্পষ্ট ক'রে তুললো ; সে নিজেও তা ভোলে না, অন্যদেরও অবিরাম মনে করিয়ে দেয়। তার দিক থেকে সবটাই দান, মিলির দিক থেকে সবটাই নির্ভর। দেখে-দেখে আমার মনে আরো এক ঈর্ষা হানা দেয় : মনে হয় মিলি বুঝি আমার চেয়েও তাপসীর সঙ্গ পছন্দ করছে।

আমার মনের ভাব জানতে দেরি হয়নি তাপসীর, হয়তো এক পলকেই ব্যাপারটা সে বুঝে ফেলেছে। মিলি আমার কাছে আর আমারই জন্য আমাদের বাড়িতে আসে, এই সত্যটাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে সে, কিন্তু কোনো-না-কোনো সময় মিলি তাকে খুঁজে বের করে, মেঝেতে ব'সে তার কাঁধে মাথা এলিয়ে দেয়, ঝরনার মতো অত কী কথা বলে আমি ভেবে পাই না। তাপসী সাধারণত থাকে বাড়ির ভিতরে, আর আমি—মিলি যখন আসে—তার সঙ্গে বাইরে থাকতেই ভালোবাসি, আমাদের পাঁচিল-ঘেরা

জামগাছের আঙিনায়, পুকুর-পাড়ের ঝোপেঝাড়ে, এক-আধ দিন নিজের এলাকা ছাড়িয়ে খোলা মাঠের প্রান্ত পর্যন্ত। কথাবার্তা হয় বেশির ভাগ বইয়ের বিষয়ে—মিলি ততদিনে একটু-আধটু সাবালকপাঠ্য ইংরেজি বই ধরেছে, আমি কোনো কবিতার লাইন ব'লে তাকে পরের লাইনটা বলতে বলি, সে আমাকে তার অধ্যাপিকাদের বলার ধরন অনুকরণ ক'রে শোনায়, কিংবা, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, হয়তো নিজে না-বুঝে, ভবিষ্যতের চিত্র রচনা করে। 'কোন রং তুমি ভালোবাসো?' 'কী-রকম বাড়ি তোমার পছন্দ?' 'পুডিং খেতে আমার বিশ্রী লাগে—তোমার?' জগতের প্রায় কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে আমরা মতের বিনিময় না করি—তুমুল তর্কও বেধে যায় এক-এক সময়—অথচ, আশ্চর্য—নতুন বিষয় নিত্যই অফুরন্তভাবে গজিয়ে ওঠে, এবং এই সবের শেষে হঠাৎ মিলি ব'লে ওঠে—'যাই, তপুদিকে একবার দেখে আসি। তুমিও চলো না!'

ক্রমে এমন হ'লো যে আমাদের সঙ্গে তাপসীও যোগ দেয় মাঝে-মাঝে—যদিও বাইরে সে বেড়ায় না, ঘরের মধ্যেও একটানা ব'সে থাকে না বেশিক্ষণ। প্রায় সব সময় সে কিছু-না-কিছু করছে; মিলিকে নিয়েই বা কম করে কী। আগে যেগুলো মা করতেন তার অনেকটাই সে নিয়ে নিয়েছে—নানা ছাঁদে চুল বেঁধে দেয়; নিজের উদ্ভাবিত, সাধারণ, অথচ কোনো বিস্ময়কর খাবার পুরে দেয় মুখের মধ্যে; হঠাৎ মিলির মাথা ধ'রে উঠলে (এটা মা-ও পারতেন না) তাকে বিছানায় শুইয়ে মাথা টিপে-টিপে সারিয়ে দেয়। এ-বিষয়ে অদ্ভুত একটা দক্ষতা ছিলো তার—প্রায় একটা রহস্যময় কৌশল, কয়েক মিনিট পরেই ছেড়ে দেয় আর মিলি ব'লে ওঠে—'তাই তো! সেরে গেছে!...কিন্তু বাড়িতে মাথা ধরলে কোথায় পাবো তোমাকে?'

'ডেকে পাঠিয়ো। যাবো।'

'ডাক্তারি করতেই যাবে—এমনি যাবে না?'

'নিশ্চয়ই! বলো তো রোজ যেতে পারি।'

'থাক। অত ভালোমানুষিতে কাজ নেই। এতদিনের মধ্যে একদিন

যেতে পারলে! নীলু, এর পরের দিন নিশ্চয়ই তুমি তপুদিকে নিয়ে যাবে।'

আর তারপর এমন হ'লো যে তাপসী কাছে না-থাকলে অসম্পূর্ণ লাগে আমাদের : মিলির আর আমার।

তাপসীর প্রতি আমার কেন আকর্ষণ হ'লো? এ-কথাটা সে-সময়ে আমি জিগেস করিনি নিজেকে, চাপা দেবারই চেষ্টা করেছি। তরুণীদের সঙ্গ আমি আর যে পাইনি তা তো নয়—অন্তত, চাইলেই পেতে পারতাম, এ-বাড়ির আগন্তুক আত্মীয়স্থানীয়াদের মধ্যে। আর বাড়ির বাইরে, যদিও অবরোধপ্রথার সম্পূর্ণ অবসান হয়নি তখনও, তবু আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়ি-পঁচিশটি ছাত্রী তো আছেন। তাঁরা যে আমার দিকে কখনো দৃষ্টিপাত করেন না তাও নয়। কিন্তু আমি—আমার মন যে একটিমাত্র তরুণীতেই ভরা, অন্য কারো দিকে তাকাতে গেলেই মিলিকে আমার মনে প'ড়ে যায়—লজ্জা পাই।

জানি, যুবকের চিত্ত চপল; সাধারণভাবে পুরুষের আর মানুষের চিত্তই চপল; অবিবাহিত যৌবনের চোখ সহজে এক জায়গায় স্থির হ'তে পারে না। কিন্তু এও জানি যে এই সনাতন সূত্রের মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর মেলা অসম্ভব। হৃদয় আমার লঘু ছিলো না, কিন্তু মিলির দ্বারা ভারাক্রান্ত আমার চিত্তকে তাপসী যে টানতে পেরেছিলো, তা কিসের জোরে?

এখানে আমাকে চেষ্টা করতে হয় তাপসীর একটা বর্ণনা লেখার, ঔপন্যাসিকের মতো তাকে 'ফুটিয়ে তোলা'র। বলেছি, মা-র অনেক কাজ সে নিয়ে নিয়েছে—কিন্তু কাজ তো সে নেয়নি, কাজগুলোই চুম্বকের মতো ছুটেছে তার দিকে। বলেছি, সব সময় সে কিছু-না-কিছু করছে, সে-কথা সত্যি—কিন্তু দেখতে মনে হয় সব সময়ই তার অবসর। কাউকে সে উপেক্ষা করে না, কারো দিকে এগিয়ে আসে না, কারো উপর আরোপ করে না নিজেকে; অনেক কাজ করে, কোনো কাজ মুহূর্তের জন্য ফেলে রাখে না, খুঁজে-খুঁজে নতুন কাজ বের ক'রে নেয়, অথচ ব্যবহারে বা চলাফেরায় কোনো ব্যস্ততা

নেই, কোনো অরুচি নেই হাসি-গল্পে—সে যা-কিছু করে সব যেন ঝ'রে পড়ে তার ভিতর থেকে, ইলেকট্রিকের বাল্‌ব্ থেকে যেমন আলো বেরোয়, কিছুর জন্যেই তাকে চেষ্টা করতে হয় না, এবং এমন সন্দেহ—তাকে কিছুদিন দেখার পর—নির্বোধেরও জাগবে না যে সে কাউকে 'খুশি করার জন্য' কিছু করছে, বা 'প্রতিদান' দিচ্ছে 'উপকারে'র, বা—কথাটা লিখতেও লজ্জা করছে আমার—নিজের বৈবাহিক যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে। এ-ই তার স্বভাব, এ-ই নিয়েই সে জন্মেছে ; যেখানে, যে-অবস্থাতেই থাক না কেন, এ-ই সে করবে।

এবং তার কোনো কুণ্ঠা নেই, কোনো দীনতা তার হাজার মাইলের মধ্যে আসতে পারে না। কাগজে-কলমে, সে আশ্রিত মানুষ, ছেলেবেলা থেকেই তা-ই ; কাগজে-কলমে, সে দুঃখী। কিন্তু তার মতো অনাবিল প্রফুল্লতা আর কারো মধ্যে দেখেছি ব'লে আমার মনে পড়ে না। এমনকি, অত মৃদুতার সঙ্গেও, কেমন একটা গর্বের ভাবও আছে তার ; যেখানে থাকে, অন্যেরাই তার আশ্রিত হ'য়ে পড়ে যেন, চারদিকের পরিবেশের দায়িত্ব না-নিয়ে সে যেন বাঁচতেই পারে না।—তার চেহারা ? জানি না কেমন, কখনো ভাবিনি সে-কথা, তার প্রসঙ্গে চেহারা ব্যাপারটা অবান্তর

কিন্তু তার হাসি আমার মনে পড়ে। এক জাতের মানুষ আছে, যাদের মুখে হাসির ভাব কখনো ঘোচে না : আমরা তাদের ভালোমানুষ বলি। আবার অন্য একদল অভ্যাসবশে বিমর্ষ বা কঠোর হ'য়ে থাকেন—কিন্তু হঠাৎ এক-এক সময়, হয়তো কোনো তুচ্ছ কারণে, সরব হাসির ঢেউয়ের মধ্যে ভাসিয়ে দেন নিজেদের—যেন হাসিটা কোনো অন্যায় আর অপবিত্র বস্তু যা থেকে সাধারণত বিরত থেকে ক্বচিৎ একেবারে আকণ্ঠ ডুবে যেতে হয়। এ-দুয়ের মাঝামাঝি আছে স্বভাবী মানুষের নানা রকম হাসির স্তর ;—হাসি, সেই আশ্চর্য জিনিশ যা পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘোষণা করে ; খেলা নয়, প্রমোদ নয়, উল্লাস নয়—শুধু গালের আর ঠোঁটের রেখা, চোখের উদ্ভাস, ভাষাহীন, ক্ষণিক, নিঃশব্দ—অথচ যাতে আয়নার মতো মনটাকে দেখতে পাওয়া যায়। সে-আয়না সকলের মধ্যে সমান স্বচ্ছ হয় না ; কত স্বচ্ছ

হ'তে পারে তা তাপসীর মধ্যে দেখেছিলাম। যাকে বলে 'হাসিখুশি' তার মুখ সে-রকম ছিলো না, চোখের কোণ যেন ছায়া ক'রে আছে, দৃষ্টি যেন লক্ষ্য ছাড়িয়ে আরো দূরে; কিন্তু যখনই সে হেসেছে তখনই যেন চরম বিশ্বাসে আর সরলতায় নিজেকে অঞ্জলির মতো উৎসর্গ করেছে মুহূর্তের জন্য।

আমি কি বাড়িয়ে বলছি? আমি কি প্রশ্রয় দিচ্ছি কল্পনাকে? কিন্তু কেনই বা এ-সব কথা মনে আসবে আমার, এই দূর দেশে, দূর কালে, তুহিন রাত্রে, যদি-না তখনই এ-রকম কিছু ধারণা হ'য়ে থাকে?

তার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি তার মুখ থেকে চোখ সরাতাম না, পাছে সেই হাসির কোনো মুহূর্তকে হারাতে হয়।

আমাকে আলাদা ক'রে কোনো মনোযোগ দেয়নি তাপসী, আমাকে এড়াবারও চেষ্টা করেনি—সেটাও একরকমের মনোযোগ হ'তো। বাড়ির মধ্যে চলতে-ফিরতে দেখা হ'লে তাকিয়েছে—খুব সহজ সেই তাকানো, অত্যন্ত চেনা মানুষের মতো। আস্তে-আস্তে কিছু কথাও হয়েছে দু-জনের মধ্যে—আলাপের বা 'গল্প করা'র ধরনে নয়, ছাড়া-ছাড়া, বিচ্ছিন্নভাবে—আজ একটা কথা হ'লো, দু-দিন পরে আরো খানিকটা, পরের সপ্তাহে আবার কয়েক মিনিট—এমনি ক'রে।

সেই টুকরোগুলোকে মনে-মনে জোড়া দেবার চেষ্টা ক'রে দেখছি, তাপসীর সঙ্গে একটা হাস্যকর আর হৃদয়গ্রাহী বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে আমার; ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে কথা হয়েছে। মা-র একটি ঠাকুরঘর ছিলো—প্রায় সব বাড়িতেই ও-বস্তুটি থাকতো সে-সময়ে, একমাত্র গগন-টিরেই—অতগুলো ফাঁকা ঘর থাকা সত্ত্বেও—ঐ উপসর্গ দেখিনি। আর তার জন্য মনে-মনে তারিফ করেছি তাঁদের, লজ্জিত হয়েছি নিজের বাড়ির 'আলমারির কঙ্কালে'র কথা ভেবে। আমার ঘরের পাশেই একটা খুদে কুঠুরি; সেখানে মা তাঁর ঠাকুরঘর সাজিয়েছেন, আর সেই ঘরে রোজ সন্ধেবেলা তাপসী প্রায় এক ঘণ্টা ক'রে সময় কাটায়।

ঐ সময়টায় প্রায়ই আমি বাড়ি থাকি না। নানা রকম ব্যাপার থাকে ইউনিভার্সিটিতে, আড্ডা থাকে, দোকান-পাট থেকে আমরা অনেক দূরে ব'লে কিছু কেনাকাটাও ক'রে আনতে হয় আমাকে। মিলি এলে সন্ধের পরে থাকে না, আমি তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে এদিক-ওদিক চ'লে যাই।

কিন্তু কখনো-কখনো এমনও হয় যে ঘরে ব'সেই সন্ধেবেলাটা কেটে যায়। হয়তো বৃষ্টি পড়ছে, হয়তো প্রোফেসর খুব জরুরিভাবে কিছু লিখতে বলেছেন, হয়তো একটা উপন্যাসের মধ্যপথে এসে কিছুতেই ছাড়তে আর পারছি না। তখন ঘরে ব'সে অনুভব করি ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধে মেশানো, ছোটো-ছোটো শব্দ শুনি, ঘর থেকে বেরোলে চোখে পড়ে প্রদীপ-জ্বলা আবছা অন্ধকারে তাপসী ব'সে আছে মা-র পাশে। মা-র পিঠ দরজার দিকে, কিন্তু তাপসীর আধখানা মুখ দেখা যায়, সে আমার দিকে তাকায় না, আমি ক্রুদ্ধ হ'য়ে ঘরে এসে বসি।

আমি, ইতিহাসের ছাত্র, অ্যানথ্রপলজির বই পড়েছি, রেনেসাঁস থেকে রুশ বিপ্লব পর্যন্ত প্রত্যহ বিচরণ করি—মানুষের এই অ[illegible]র দৃশ্যে আমার শিউরে না-উঠে উপায় থাকে না। মা-কে বুঝি, তাঁকে ক্ষমা করতেও পারি—কিন্তু আমারই সমবয়সী আর-একজন মানুষ বুদ্ধিকে এ-ভাবে বিসর্জন দেবে, তা আমি সহ্য করি কেমন ক'রে?

অতএব কথাটা একদিন বলতেই হ'লো।

'তুমি রোজ পুজো করো কেন?'

'পুজো তো করি না।'

'কাছে ব'সে থাকো। ভক্তিভরে ব'সে থাকো, বলা যায়। আমার মা খুশি হবেন ব'লে?'

'তা কেন? আমার নিজেরই ভালো লাগে।'

'ভালো লাগে?'

'অনুষ্ঠান ভালো লাগে আমার।'

'অনুষ্ঠানের কোনো মানে হয় কিনা ভেবে দেখেছো?'

'আমি কিছু ভাবি না।'

'ভগবান আছেন কি নেই তাও ভাবো না কখনো?'

'আমি বেঁচে আছি কি নেই তা কি কখনো ভাবি?'

তার উত্তর শুনে আমার তর্কের জিব লকলক ক'রে উঠলো। কলেজের সেমিনারের ধরনে তক্ষুনি জবাব দিলাম, 'তার মানে, ভগবানের অস্তিত্বটা তোমার কাছে তোমার আমার অস্তিত্বের মতোই প্রত্যক্ষ। এর বিরুদ্ধে অন্তত এই কথাটা বলবার আছে; প্রথমত, তুমি আমি সীমার মধ্যে আবদ্ধ; আমাদের বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে—অসংখ্য দুঃখ আর অমঙ্গলের আমরা অধীন, কিন্তু আমাদের এই ক্ষণিক অস্তিত্বের বাইরে কোনো-এক অনন্ত, চিরন্তন, সর্বক্ষম ও মঙ্গলময় সত্তার এ-পর্যন্ত মানুষ শুধু কল্পনাই করেছে, এই জগতের মধ্যে কোনো প্রমাণ পায়নি। হয় ভগবান নেই, নয় তিনি সর্বক্ষম নন, কিংবা সর্বক্ষম হ'লেও মঙ্গলময় নন—নয়তো পৃথিবীতে এত দুঃখ কেন?—কিন্তু এই তর্কের মধ্যে আমি এখন যাবো না, আপাতত আমি তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি, ধ'রে নিচ্ছি ভগবান আছেন, এবং তাঁর সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পারলে মানুষের কল্যাণ হবে। কিন্তু তার উপায় কি ঐ পুতুল-পুজো? যাঁকে অনন্ত বলছো তাঁকে ঐ এক টুকরো পাথর অথবা ধাতুর কোনো খেলনার সঙ্গে এক ক'রে দেখতে তোমার লজ্জা করে না?'

'আমি তো কিছু বলিনি। সব তুমি বলছো।'

'কিন্তু না—এড়িয়ে যেয়ো না কথাটা। জবাব দাও।'

'হিরণ্যকশিপুর গল্প জানো? স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ ক'রে নৃসিংহমূর্তি বেরিয়ে এসেছিলেন?'

'ও-সব গল্পই।'

'খুব ভালো গল্প না? জানো, একবার প্রলয়ের জল থেকে কেমন ক'রে শিব উঠেছিলেন?'

বইয়ের বিষয়ে তাপসী কখনো কথা বলে না, আমরা যে-সব বই পড়ি তার কোনো খবরই রাখে না সে। কিন্তু পুরাণের অনেক গল্প তার জানা

আছে—কোথায় সে-সব শুনেছিলো বা পড়েছিলো জানি না—অনেক অদ্ভুত আর নতুন গল্প, যা মহাভারতেও পাওয়া যায় না। আমার আক্রমণ যখন প্রবল হ'য়ে উঠেছে, ওরই দু-একটা গল্প শুনিয়েছে আমাকে। শিবের গল্পটা শুনলাম তার মুখে। একবার প্রলয়ের জলে বিষ্ণু অনন্ত-শয্যায় শুয়ে আছেন, এমন সময় সেই অন্ধকারের উপর দিয়ে এক ভাস্বর পুরুষ ভেসে-ভেসে তাঁর কাছে এসে থামলেন। বিষ্ণু বললেন, 'তুমি কে?' জবাব এলো: 'তুমি কে?' 'আমি বিষ্ণু। আদি এবং একমাত্র স্রষ্টা।' 'আমি ব্রহ্মা। সৃষ্টির দেবতা আমি।' 'কী বললে?' বিষ্ণু কুপিত হলেন কথা শুনে, 'আমিই প্রথম, আমার আগে কিছু নেই, তোমাকে আমিই সৃষ্টি করেছি, জেনো। তুমি এবার অন্য সব সৃষ্টি করো।' ব্রহ্মা হেসে উঠে বললেন, 'বাতুল! আমি অনাদি, আমি অনন্ত, তুমি আমাকে প্রণাম করো।' দু-জনে যখন এই রকম তর্ক হচ্ছে, তখন তিমির ভেদ ক'রে জ্যোতির্ময় স্তম্ভের মতো মূর্তি নিয়ে শিব উঠলেন। উঠছেন তো উঠছেনই, আর ফুরোয় না। বিষ্ণু আর ব্রহ্মা হতবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন সে-দিকে। বিষ্ণু বললেন, 'ব্যাপারটা কী দেখতে হয় তো। এক কাজ করা যাক, তুমি মরাল হ'য়ে আকাশে উড়ে যাও, ছাখো কোথায় শেষ হয়েছে। আর আমি বরাহ-রূপ ধারণ ক'রে নিচে নামছি, কোথায় এর আরম্ভ তা দেখতে হবে।' বিষ্ণু নামলেন নিচে, ব্রহ্মা উড়লেন আকাশে, কিন্তু কেউ কোনো অন্ত বা আদি খুঁজে পেলেন না।

আর-একদিন ইন্দ্রের এক গল্প শোনালে। একবার দেবরাজ এক প্রাসাদের পরিকল্পনা করলেন, যার মতো ত্রিভুবনে আর দেখা যায়নি। যত নির্মাণ হচ্ছে, ইন্দ্রের আর তৃপ্তি হয় না, কেবল বলেন—'আরো! আরো! আরো!' বিশ্বকর্মা খেটে-খেটে হয়রান—মহলের পর মহল, অরণ্যের মতো চূড়া, প্রান্তরের মতো অলিন্দ; দেবতারা বিমূঢ় হলেন কারুকর্মে, কিন্তু ইন্দ্র আবার নতুন ক'রে আদেশ দেন। অবশেষে বিশ্বকর্মা শ্রান্ত হ'য়ে ব্রহ্মার দ্বারস্থ হলেন। 'আমাকে উদ্ধার করুন। আর পরিশ্রম সহ্য হয় না।' ব্রহ্মা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বিষ্ণুর কাছে।

পরের দিন এক ব্রাহ্মণ-বালক ইন্দ্রের দর্শন প্রার্থনা করলে। তাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখে ইন্দ্র সভাগৃহে এসে ছাখেন, এক কান্তিমান বালক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মৃদু হাসছে। হাসি দেখে উষ্মা হ'লো দেবরাজের; জিগেস করলেন, 'হাসছো কেন?' 'ঐ পিঁপড়েদের দেখে হাসছি।' ইন্দ্র দেখলেন, তাঁর মণিময় কুট্টিমের উপর দিয়ে ব'য়ে চলেছে মন্থর, কালো স্রোতের মতো পিঁপড়ের পাল। ধীরে, অতি ধীরে, সেনানীর মতো নির্ভুল নিয়মে, সেই বিশাল বাহিনী সভাগৃহ অতিক্রম ক'রে অদৃশ্য হ'লো। এবার উচ্চস্বরে হেসে উঠলো বালক।

ইন্দ্র কঠোর স্বরে বললেন, 'আমি এই কৌতুকটা ঠিক অনুধাবন করতে পারছি না।'

'শুনুন, দেবরাজ। এক লক্ষ পিঁপড়ে ছিলো ওখানে। তাদের মধ্যে এমন একটিও নেই যে কোনো-এক কালে ইন্দ্র ছিলো না। আপনারই মতো দেবরাজের আসনে বসেছিলো তারা। আরো দেখতে চান?'

আবার এক পাল পিঁপড়ে বেরিয়ে এসে আস্তে-আস্তে পার হ'য়ে গেলো; আবার, আবার। দশবার এই দৃশ্য অভিনীত হবার পরে বালক বললে, 'এই ইন্দ্রের মিছিলের অন্ত নেই। প্রতি মুহূর্তে একজন ক'রে জন্মাচ্ছে, বিলীন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে একজন। কত পৃথিবী, কত স্বর্গ, কত ইন্দ্র, আর কত ব্রহ্মাণ্ড, এক-একটি নির্ভার ভেলার মতো অতল জলে ভেসে বেড়ায়—আপনি কি তা গণনা করতে পারেন? কিন্তু ধন্য আপনি—এমন একটি প্রাসাদের পরিকল্পনা করেছেন যা আপনার পূর্ববর্তী কোটি-কোটি ইন্দ্রের মধ্যে আর কেউ করেনি!'

এই কথা ব'লে বালক অদৃশ্য হ'লো।

ইন্দ্র মনস্থ করলেন সন্ন্যাস নেবেন, তখন শচীদেবী বৃহস্পতির কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। দেবগুরুর [illegible] ইন্দ্র অন্তঃপুরে ফিরে এলেন; আবার লিপ্ত হলেন তাঁর অফুরন্ত, তাঁর ক্ষণিক সম্ভোগে।

এমনি সব গল্প শুনেছি তাপসীর মুখে। যুক্তির বদলে সে ছবি উপস্থিত

করে ; উপদেশটাকে অগ্রাহ্য করলেও ছবিটাকে সরিয়ে দিতে পারি না, পিঁপড়ের স্বপ্নও দেখলাম একদিন। এই সব কথাবার্তার মধ্য দিয়ে, আমার চেতন মন সব সময়ই চেয়েছে তাকে আমার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে ; কিন্তু হয়তো, আমারই অজান্তে, এই অছিলায় তারই কথা শুনতে চেয়েছি আমি, তার কাছে কিছু শিখতে চেয়েছি। আর এ-রকম সময়ে মিলি কখনো এসে পড়লে আমি হঠাৎ কথা থামিয়ে ব'লে উঠেছি—'আরে, এসো!' একটু বেশি উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছে আমার গলায়। একটু থেমে বলেছি—'চলো, বাইরে যাই। জানো, আজ…'

ক্রমে আমার মনে ধরা পড়লো যে মিলির সঙ্গে আমি খেলা করি, অবসর কাটাই, কিন্তু কথা বলি তাপসীর সঙ্গে। অস্বস্তি বোধ করলাম।

এর পরের গ্রীষ্মের ছুটিতে মণ্টু তার এক কলকাতার বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি এলো। আমার এম. এ.-র শেষ বছর অদূরবর্তী, মণ্টুরও শিবপুর থেকে বেরোতে বেশি দেরি নেই। নিটোল একটি ভদ্রলোকে সে পরিণত হয়েছে, পেশীর প্রদর্শনী আর খুলে দেয় না, কথা বলার মধ্যে রাগিণীও ভাঁজে না আর, চেহারা দেখলে সম্ভ্রম জাগে। আর তার চেয়েও চমকপ্রদ তার বন্ধুটি।

মনোতোষকে দেখলে মনে হয় কোনো হলিউডের ফিল্ম থেকে সে সন্ত উঠে এসেছে—সেকালের হলিউডের কথা বলছি। সেকালের পক্ষেও একটু সেকেলে তার বেশভূষা; কালো, সরু আর পরিচ্ছন্ন এক জোড়া গোঁফে উপরের ঠোঁটটিকে অলংকৃত করেছে; পমেটম-মাখা চকচকে চুল মাথার ঠিক মধ্যিখানে সিঁথি-করা—হুবহু প্রিন্স অ্যালবার্টের মতো। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে, পায়ে শাদা নাগরা—এর কোনোটাই ছাত্রমহলে প্রচলিত নেই। এক কথায়, নির্ভুলভাবে বয়স্কদের আসরে বসার যোগ্য, ছাত্রজীবনের শেষ বছরের পক্ষেও অত্যন্ত বেশি সুবেশ, সুশৃঙ্খল ও আত্মস্থ।

তার মা, বাবা, বোনের কাছে, তারপর আমার কাছে, বন্ধুকে উপস্থিত করার সময় মণ্টু একটু গর্বের ভাব লুকোবার কোনো চেষ্টা করলে না। তার বিশেষ কোনো কৃতিত্ব বা গুণপনার উল্লেখ না-ক'রেও স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে যে মনোতোষ অসাধারণ ব্যক্তি, কলকাতার—মানে, বাংলাদেশের—সেরা যুবকদের অন্যতম, যার সঙ্গে, ঢাকার মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরে ব'সে, পরিচিত হওয়া আমার অথবা মিলির পক্ষে ভাগ্যের বিষয়।

ক্রমশ জানা গেলো মনোতোষের বাবার প্রসাধন-দ্রব্যের ফ্যাক্টরি আছে, সে-সব সামগ্রীর নাম 'উজ্জয়িনী'। ক্রীম, স্নো, পাউডার, সেণ্ট সবই তৈরি হয়—বহু টাকা লোকশান দেবার পর এখন ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে। এ-জন্যেই কেমিস্ট্রি পড়ছে মনোতোষ, অঙ্গরাগে অভিনব আবিষ্কার করার জন্য; তার

গবেষণার যথাযোগ্য ব্যবস্থা হবে ব'লে বাপ নতুন ফ্যাক্টরি আর ল্যাবরেটরি তৈরি করাচ্ছেন—বরানগরে জমি নেয়া হ'য়ে গেছে, আর সেই বাড়ির প্ল্যান তৈরি করছে মণ্টু। সেই হবে তার 'কেরিয়ারের প্রথম কাজ'।

মনোতোষের মাথায় অদ্ভুত সব আইডিয়া আছে সুগন্ধ বিষয়ে, কিন্তু ঘ্রাণের রসায়ন তার একমাত্র বিষয় নয়; সে পলিটিক্স বোঝে, আর্ট অর্থাৎ চিত্রকলা বিষয়ে পারদর্শী, নিজে মোটর চালিয়ে কাশ্মীর পর্যন্ত গিয়েছিলো একবার, এবং জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে এমন কিছু নেই, যা সে জানে না। এখন এই মনোতোষ, যাকে দেখে মনে হয় তার বাবার ব্যবসার জীবন্ত বিজ্ঞাপন, যার মাথার একটি চুল কখনো এপাশ-ওপাশ হয় না, কামানো গাল দুটি পিতলের মাজা বাসনের মতো চকচক করে, মৃদু, ধীর, গম্ভীর ধরনে ইংলণ্ডের লেবরপার্টি থেকে মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধ শিল্প পর্যন্ত নানা বিষয়েই যে কথা বলে—সে যে হাত-দেখার মতো ছেলেমানুষি ব্যাপারে উৎসাহী, তাতে আমার অবাক না-হ'য়ে উপায় থাকলো না।

সেই গ্রীষ্মে মণ্টু আমার সঙ্গে প্রায় আশাতীতরকম সহৃদয় ব্যবহার করলে। ততদিনে—হয়তো মনোতোষেরই প্রভাবে—মানবিক শাস্ত্রগুলো বিষয়ে সে অনেক বেশি সহনশীল হয়েছে; বুঝেছে, একজন কলকাতাবাসী যুবকের পক্ষে ও-সব বিষয়ে দুটো-চারটে কথা বলতে না-পারাটা লজ্জার বিষয়। তার সঙ্গে মনোতোষের যে-সব কথা হয়—বরং, সে যখন মনোতোষের কথা সহাস্য অনুমোদনের সঙ্গে শুনে যায়, তখন আমার উপস্থিতি আমন্ত্রণ করে সে, মিলিকেও বসিয়ে রাখে ওখানে—আর সুযোগ পেলে তাপসীকেও দলে টানতে ছাড়ে না।

বলা দরকার যে আমাদের বাড়িতে মণ্টুর আসা-যাওয়া সেবার বেড়ে গিয়েছিলো; মাঝে-মাঝে কোনো সকালবেলায়, যখন পর্যন্ত পাখির ডাক থামেনি, রোদের তাপ বেড়ে ওঠেনি, পাড়ার ছেলেদের দাপাদাপি শুরু হবার আগে পুকুরের জল গাছের ছায়া বুকে নিয়ে স্থির হ'য়ে আছে—তখন দুই বন্ধু এসে আমার সঙ্গে কাটিয়ে যেতো দু-এক ঘণ্টা, আর শুধু আমার

সন্দেহই নয়। মনোতোষ আমাদের গ্রাম্য পরিবেশ দেখে মুগ্ধ, পুব-বাংলায় এই তার প্রথম আসা—সে লক্ষ করলে পশ্চিম বাংলার চাইতে শ্যামলিমা এখানে বেশি, মাছ আর সব্জি বেশি সুস্বাদু, আর যদিও এত মশা তবু কী আশ্চর্য ম্যালেরিয়া নেই যখন জানলে যে এই পুকুর আর ফলের গাছ নিয়ে সমস্ত জমিটাই আমাদের, অথচ আমরা এগুলোকে কোনো 'কাজে লাগাচ্ছি' না, তখন মা-র কাছে একদিন একটি প্রস্তাব পেশ করলে—কেমন ক'রে এই 'সম্পত্তি'কে একটি বিলেতি ধরনের 'ফার্ম'-এ পরিণত করা যায় ; আম, কাঁঠাল, কলা, জামরুল কিছু মনোযোগ দিলেই বাজারে পৌঁছতে পারে, পুকুরে কেন হবে না মাছের চাষ—মাছের পিছনে খরচ খুব কম, মেহনৎ প্রায় কিছুই না, বাজার-দরে 'মার্জিন' বেশ ভালোই থাকবে। 'এ-সব করেন না কেন আপনারা, বছরে পাঁচশো টাকা খরচ ক'রে দু-হাজার বা আড়াই হাজার আয় হওয়া নিশ্চিত—আমি স্কীম ক'রে দেখিয়ে দিতে পারি।'

মা উত্তরে বলেন, 'এ তো আমার একার নয়, নীলু এ-সবের কিছু বোঝে না, আর নীলু পাশ ক'রে বেরোলে আমরা কোথায় যাই তার ঠিক কী। ওর কাকারাও বাইরে থাকেন—কে দেখবে ?"

'দেখার লোকের অভাবে নষ্ট হ'য়ে যাবে!' আপশোষের সুরে ব'লে ওঠে মনোতোষ।

'নষ্ট কেন হবে—ও-সব দিশি আমের কী বা দাম, পাড়ার ছেলেরা খেয়ে তবু সার্থক করে।'

আমার বুঝতে দেরি হলো না যে মনোতোষের মন ঠিক আধুনিক জগতের উপযোগী ; খুব গোছানো, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং হিশেবি। ঢাকায় বেড়ানোর সঙ্গে যে কিছু কাজের সূত্র একেবারে রাখেনি তা নয়, মস্ত স্যুটকেস ভ'রে 'উজ্জয়িনী'র নমুনা এনেছে ; মাঝে-মাঝে ঘণ্টা হিশেবে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ক'রে শহরের বড়ো-বড়ো মনোহারি দোকানে নমুনা রেখে আসে, যা অর্ডার পায় পরের দিন তাদের কলকাতার আপিশে লিখে পাঠাতে ভোলে না।

আর এই নিয়ে কথা বলতেও তার সংকোচ নেই : ঢাকার মতো এত বড়ো একটা 'মার্কেট'-এর দিকে এতদিন নজর না-দিয়ে বাবা ভুল করেছিলেন, ভাগ্যিশ সে এসেছিলো এবার ; এখানে, এমনকি, 'উজ্জয়িনী'র একটা ব্রাঞ্চ-আপিশ খুললেও মন্দ হয় না।

এবং বন্ধুমহলে সকলকেই সে 'উজ্জয়ি-ী'র সেট উপহার দিলে : মিলিকে, মিলির মা-কে, মিলির দু-একজন বন্ধুকেও, আর তাপসীকে।

তাপসী বললে, 'আপনি বরং অন্য কাউকে দিন।'

'কেন ?'

'আমি কী করবো ও-সব দিয়ে ?'

'একদিন ব্যবহার করুন। ভালো না-লাগলে ফেলে দেবেন।'

'আমার অভ্যেস নেই, দেখুন।'

'অভ্যেস নেই ? অবশ্য কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করাটা বেয়াদবি, কিন্তু আপনার কথার কি আমি এই মানে করবো যে আপনি প্রসাধন ব্যাপারটাকেই এড়িয়ে চলেন ?'

আমি জানতুম তাপসী কখনো পাউডার মাখে না, যাকে সাজগোজ বলে তা ঠিক আসে না তার, সেটা যেন বেমানান মনে হয় তার পক্ষে। তার ব্যক্তিগত খরচ এতই কম যে আমার বড়দি তাকে পাঁচ টাকা ক'রে যে-হাতখরচ পাঠান, তা থেকে প্রত্যেক মাসে সে মিলিকে কিছু উপহার দেয়, বাড়িতে যখন যারা বাচ্চা থাকে তাদের মধ্যে টফি আর লজঞ্চুশ বিলোয়, মা-র পুজোর ঘরের জন্য দামি ধূপকাঠি কেনে। আর তার উপর, সে নিঃস্ব থাকে না কোনো সময়েই, আমার স্কলারশিপ পেতে দেরি হ'লে হাতখরচের জন্য আস্ত একটা টাকাও আমাকে বের ক'রে দেয় মাঝে-মাঝে।

প্রসাধন বিষয়ে তাপসীর এই বিমুখতা, আমাকেই তা জানিয়ে দিতে হ'লো মনোতোষকে।

'আপনি পাউডার মাখেন না ? আশ্চর্য !'

'আশ্চর্য কিছু নেই। যারা ও-সব ব্যবহার করে তাদের আমি পছন্দ করি, কিন্তু আমার ভালো লাগে না।'

'ব্যবহার করলে ভালো লাগবে না তা কি জানেন?'

'আমি কোনো প্রয়োজন দেখি না।'

'প্রয়োজন তো কত কিছুরই নেই। আপনি নীল শাড়ি পরেছেন, শাদা হ'লে কী ক্ষতি ছিলো? কিন্তু দেশের সব মেয়ে সব সময় শুধু শাদা শাড়ি পরছেন, এ কি কখনো কল্পনা করা যায়? যাতে প্রয়োজন নেই তাতেই তো সভ্যতার পরিচয়।'

নানা রকম বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে মনোতোষ বুঝিয়ে দিলে যে সভ্যতা মানেই বাহুল্যবৃদ্ধি। তারপর হঠাৎ বললে, 'বুঝতে পারছি, আপনি একটু বিশেষ ধরনের মানুষ। যদি অনুমতি করেন, আপনার হাতটি একবার দেখতে চাই।'

'হাত দেখবেন?'

'হ্যাঁ, ঐ আমার একটা বাতিক আছে।'

'শুধু বাতিক নয়,' মণ্টু ব'লে উঠলো এখানে, 'ও রীতিমতো রিসার্চ করেছে এ নিয়ে, বিস্তর বই পড়েছে, ওর বিশ্বাস এর পিছনে রীতিমতো একটা সায়ান্স আছে।'

কিন্তু তাপসী কোনো-একটা ছুতো ক'রে খুব ভদ্রভাবে সেখান থেকে চ'লে গেলো।

এই হাত দেখার বাতিক, তখনকার দিনে, দেশের অনেক যুবকের মধ্যেই লক্ষ করেছি। তার কারণটা খুব স্পষ্ট ছিলো। মেয়ে-পুরুষে স্বচ্ছন্দ মেলামেশা ছিলো না তখন, অনতিস্বচ্ছ আড়ালের ফাঁকে-ফাঁকে কিছু বিনিময়ের জন্য সুযোগ খুঁজতে হ'তো। তারই একটা উপায় ছিলো জ্যোতিষশাস্ত্র। ঐ শাস্ত্রে—কৌতূহল বেশি ব'লে—মেয়েদেরই আকর্ষণ প্রবল; তাতে কিছু দখল আছে জানতে দিলে, কোনোরকম প্রমাণ দিতে না-পারলেও, তরুণীমহলে লক্ষণীয় হওয়া যেতো, কাছে গিয়ে বসা যেতো তাদের, এমনকি খুব নির্দোষ

আর পালকাভাবে এক-একটি হাত নিজের হাতে ধ'রে রাখা যেতো কিছুক্ষণ—প্রশ্নোত্তরের ছলে হাস্য-পরিহাস আর হার্দ্য প্রয়াসেরও অবকাশ ছিলো মন্দ না। এ-রকম সঙ্গলিপ্সু অচিরস্থায়ী গণক আমি কম দেখিনি ; মনোতোষকে তাদেরই একজন ব'লে ভেবে নেয়া আমার পক্ষে সহজ হ'লো না—সে, কলকাতার মনোতোষ দত্ত, রাজধানীর আগুয়ান সমাজে চলাফেরায় অভ্যস্ত, অন্য সব বিষয়ে পুরোপুরি সাবালক, ঢাকায় বেড়াতে এসেও পৈতৃক ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্য সচেষ্ট, তার মধ্যে এই একটা বয়ঃসন্ধির দুর্বলতা দেখে আমি মনে-মনে তারই জন্য লজ্জিত হলাম।

অথচ, মানতেই হয়, মনোতোষের হাত-দেখার মধ্যেও একটা গম্ভীর, পেশাদারি ভাব আছে, যাতে ব্যাপারটাকে একেবারে বুজরুকি ব'লে উড়িয়ে দেয়াও সম্ভব হয় না সব সময়। সে ভোরবেলায় ছাড়া এই বিদ্যার ব্যবহার করে না, তার দ্বারা ভাগ্য-গণনা করাতে হ'লে সদ্যস্নাত হওয়া চাই, হাতখানা বাড়িয়ে দিলেই তক্ষুনি দেখতে ব'সে যাবে তা নয়—সব সময় রাজিও হয় না, সে নিজে যাদের বিষয়ে কোনো আগ্রহ বোধ করে শুধু তাদেরই জন্য তার অন্তর্দৃষ্টি জমা রাখে, এবং সে ঠিক ভাগ্য-গণনাও করে না, ভবিষ্যৎ বিষয়ে বরং কম বলে, মানুষটির চরিত্র বর্ণনা করে, আর অতীতের কিছু তথ্য ব'লে দিয়ে চমক লাগিয়ে দেয়।

প্রথমে সে যাঁর উপর তার শক্তির পরীক্ষা করলে তিনি স্বয়ং মিলির বাবা। গিরিজাবাবু, ব্রাহ্মভাবাপন্ন বিচক্ষণ সব-জজ, তিনিও যে স্নান ক'রে আসন-পিঁড়ি হ'য়ে এই যুবকের কাছে এসে বসতে রাজি হলেন—এতেই মনোতোষের খ্যাতি ছড়িয়ে গেলো পাড়ায়। আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলুম না, কিন্তু শুনলুম সে গিরিজাবাবুর জন্মের বছর, মাস ও তারিখ নির্ভুলভাবে ব'লে দিয়েছে, শুধু সময়টাতে কয়েক ঘণ্টা ভুল হয়েছিলো। ঐ ছোট্ট ভুলটুকু হওয়াতে লোকেদের আরো বিশ্বাস হ'লো যে এটা বুজরুকি নয়, 'সায়ান্স'।

পাড়ার কেউ-কেউ কৌতূহলী হলেন ; অনেকেরই অনেক কিছু মিলে গেলো।

মিলিকে শুধু বললে যে সে খুব বিশ্বাসপ্রবণ, কিন্তু যাদের বিশ্বাস করে তাদেরই কাছে আঘাত পাবার আশঙ্কা আছে।

কিন্তু তাপসী কিছুতেই তার প্রস্তাবে রাজি হয় না। পর-পর দু-দিন সময় ঠিক ক'রে সকাল সাড়ে-সাতটায় মনোতোষ এলো, কিন্তু তাপসী দু-দিনই তাকে চা আর হালুয়া খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে। মনোতোষ দুঃখিত হ'লো, কিন্তু এই আশাভঙ্গ আমাদের বাড়িতে তার আনাগোনার অন্তরায় হবে এমন কোনো অভিমানের লক্ষণ দেখালে না। মাঝে-মাঝেই আসে, কোনো-কোনোদিন মণ্টুকেও বাদ দিয়ে—রোজ একই রকম নধর, চিক্কণ, সুবেশ, আত্মস্থ ও সহাস্য। তাকে যখনই দেখি তখনই তার সদ্যস্নাত চেহারা, কাপড়-জামার যেন এইমাত্র ভাঁজ ভেঙেছে, পায়ে এক-একদিন এক-এক রঙের নাগরা কিংবা লপেটা কিংবা সেলিম, পকেট থেকে রুমাল বের করলে মৃদু সুগন্ধ অনুভূত হয়। অথচ তাকে নেহাৎই একজন 'কলকাতার বাবু' ব'লে উপেক্ষা করার উপায় নেই; ভদ্র ও মার্জিত তার ব্যবহার, কথাবার্তায় বুদ্ধি ও বিবেচনা দুটোরই পরিচয় আছে; তার বাপের বয়সীদের মহলেও দিব্যি মানিয়ে যায় তাকে; মিলির বাবার সঙ্গে ব্যবসায়িক আইন নিয়ে আলোচনা করে, আমার মা-র সঙ্গেও ফলের চাষ বিষয়ে কথা চালিয়ে যায়। এক কথায়, যেখানেই যায় সেখানেই তার সম্মান অবধারিত।

একদিন বেলা দশটা নাগাদ আমার ঘরে ব'সে বই পড়ছি, হঠাৎ মনোতোষ এসে ঢুকলো। এতদিন সে সাধারণভাবে—মানে, সারা বাড়ির অতিথি হ'য়ে—এই বাড়িতে এসেছে; এই প্রথম বিশেষভাবে আমার কাছেই এলো। আমি ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালুম।

'আসুন, মনোতোষবাবু···এই যে, এই চেয়ারটাতে—' আমার আরামদায়ক বেতের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলাম তাকে।

ব'সে, রুমালে ঘাড় মুছে, মনোতোষ একবার সীলিঙের দিকে চোখ তুললো। আমি একটু কুণ্ঠিতভাবে বললাম, 'আমাদের পাখা নেই—'

'পাখার দরকারও নেই,' মোলায়েমভাবে জবাব দিলে মনোতোষ। 'এত

ঢাকা এখানে, ইলেকট্রিক হাওয়ার আর [illegible]র করে না। হেঁটে এলাম কিনা—আর ওটা কলকাতার একটা বদভ্যাস। গগন-কুটিরেও বিনা পাখায় থাকি—কিছু টেরই পাই না। এই তো সুন্দর হাওয়া আসছে—বেশ রমণীয় পরিবেশ আপনার।' প্রায় এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা ব'লে মনোতোষ আমার মুখের দিকে তাকালো।

এবার কিছু বলা আমার কর্তব্য বুঝে আমি জিগেস করলাম—কী উত্তর শুনবো তা নিশ্চিত জেনেও জিগেস করলাম ঢাকায় তার কেমন লাগছে।

'ক্যাপিট্যাল! চমৎকার! "বাঙাল দেশ" ব'লে কলকাতায় যে একটা প্রেজুডিস আছে সেটা নেহাৎই বর্বরতা। এ-রকম সহৃদয়তা কলকাতায় কল্পনা করা যায় না। এই অল্প দিনেই গিরিজাবাবুর ঘরের ছেলে হ'য়ে গিয়েছি আমি। আর আপনাদের এখানে—আপনারাও কত আপ্যায়ন করছেন আমাকে, আমার পক্ষে এ আশাতীত'

'কী আশ্চর্য!' আমি বোধহয় একটু লাল হলাম, 'আমরা তো কিছুই করিনি যাকে আপ্যায়ন বলা যায়।'

'বাঃ, এই তো সেদিনও এসে চা আর মোহনভোগ খেয়ে গেলাম—"হালুয়া"কে "মোহনভোগ" বলেন আপনারা—না? কত বেশি ভালো আপনাদের কথাটা! "হালুয়া" বললে "হালুম" মনে পড়ে, আর "মোহনভোগ"—নামেই প্রকাশ, কী সুস্বাদু ঐ খাদ্যটি!'

আমি মনোতোষের মুখের দিকে একবার তাকালাম। এর অর্থ কী? ঠাট্টা—না, স্থূল স্তাবকতা?—কিন্তু স্তাবকতার কারণ কী থাকতে পারে?

'আর এখানকার লোক্যাল লোকেরা—' আমার স্বল্পভাষিতায় মনোতোষের উৎসাহ একটুও ব্যাহত হ'লো না—'ও-রকম ইন্টারেস্টিং মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি। ফরাশগঞ্জ থেকে চকবাজার পর্যন্ত দোকানে-দোকানে ঘুরেছি তো—সারা পূর্ববঙ্গের [illegible] মুঠোয় ধ'রে আছে এখানকার সাহা বসাক ইত্যাদিরা—লেখাপড়া বেশি জানে না, জানবার দরকারও নেই, জন্ম থেকেই ব্যবসাটা বোঝে। অথচ এদের মধ্যে একটা মনোরম সরলতাও

আছে—অনেক জিনিশ আনায় যার নাম জানে না, ব্যবহার জানে না—বিষ্ণু পালের দোকানে একটা ম্যানিকিউর-সেট খুলে আমাকে দেখিয়ে জিগেস করলে, "বাবু, এটা দিয়ে কী হয় ?" আমি যখন বুঝিয়ে দিলাম হেসে বললে, "কী কাণ্ড ! নখের জন্য এত !—আপনি এটা নিয়ে যান না, বাবু।" কেমন একটা নরম, মেয়েলি আদরের টানে শেষ কথাটা বললে। হয়তো ভেবেছে নখের জন্য সাড়ে-সাত টাকা খরচ করার মতো খদ্দের তাদের নাও জুটতে পারে, আমার পক্ষে ওদের খুশি রাখা দরকার তাও জানে—তবু, কথাটা আমার এত ভালো লাগলো যে ওটা না-কিনে পারলাম না, কিনে অবশ্য তক্ষুনি উপহার দিয়ে দিলাম মিলিকে। জিনিশটা আমাকে গছিয়ে দিয়ে আমার উপকারই করলে বিষ্ণু পাল—ওরাও হাতে থাকলো, গিরিজাবাবুদের আতিথেয়তার সামান্য প্রতিদানও দিতে পারলাম।'

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'আপনারও ব্যবসাবুদ্ধি অসাধারণ।'

কথাটাকে প্রশংসার অর্থে নিয়ে মৃদু হাসলো মনোতোষ।—'হ্যাঁ—বাঙালি ব্যবসা পারে না, বাঙালি শুধু ইমোশনের ফানুস—এই কলঙ্ক আর সহ্য হয় না। দেখুন না—এরা তো শুধু কেনাবেচা করে—আসলে ওটা দালালের কাজ—একে কি আর ব্যবসা বলে। দেশের ধন যাঁরা সৃষ্টি করেন তাঁদের কাজটি কত বড়ো ভেবে দেখুন। আমি সেইরকমই একজন হ'তে চাই।'

'মণ্টু বলছিলো সেইজন্যেই কেমিস্ট্রি পড়ছেন ?'

'হ্যাঁ—কেমিস্ট্রি—ফ্যাসিনেটিং সায়ান্স!—তা এখানকার কুটিদেরও খুব ভালো লাগে আমার—তারাই তো গাড়ি চালায় ?—কী সপ্রতিভতা, কী রেডি উইট, যে-কোনো কথার জবাব যেন জিভের আগায় লকলক করছে। ঐ রোগা-রোগা ঘোড়াগুলোকে কী বেদম ছোটাতে পারে সরু-সরু রাস্তায়—আবার ঘণ্টা হিশেবে গাড়ি নিলে সেই ঘোড়া কেমন নববধূর মতো ধীর গতিতে চলে—হী-হি—ভারি মজার!—আপনি বাখরখানি ভালোবাসেন ?'

'না—তেমন না—' মনোতোষের কথাবার্তার অসংলগ্ন ধরনে আমি একটু অবাক হলাম। কেন এসেছে ? কী চায় ?

'আই লাভ ইট! আজকাল পার্ক স্ট্রিটের একটা দোকানে গরম-গরম সুইস রোল পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু তার চেয়েও ভালো সকালে চায়ের সঙ্গে একটি গরম ও নরম বাখরখানি।—জানেন? আমিও আসলে ঢাকার লোক, বাঙাল?'

'তাই নাকি?'

'পূর্বপুরুষ বিক্রমপুরে ছিলেন, আমার প্রপিতামহ কোম্পানির আমলে কৃষ্ণনগরে চ'লে আসেন, সেখান থেকে কোন্নগরে, কলকাতার পত্তনের সময় এক ইংরেজ হৌসে ঢুকে তাঁর বরাত খুলে যায়। তাঁর ছেলেরা পৈতৃক বিত্ত অর্ধেক উড়িয়ে দিলেন, আমাদের ভাগে ছিটেফোঁটা পড়েছে এখন, কিন্তু আমার বাবা এবার চেষ্টা করছেন নতুন ক'রে কিছু-একটা গ'ড়ে তুলতে, আর তিনি যেটুকু করলেন তাকে আরো বাড়িয়ে তোলা আমার ইচ্ছে।—শুধু ইচ্ছে নয়, আমার—আমার সংকল্প। আর-একটি জিনিশ মনে-মনে চাই আমি, আমাদের আদিনিবাস এই পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আবার যোগস্থাপন করতে।'

মনোতোষের দিকে আর-একবার দৃষ্টিপাত ক'রে আমি বললাম, 'আমাদের কার আদিনিবাস কোথায় তাতে এমন কী এসে যায়? মানুষ ভালো হ'লেই হ'লো।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ঠিক বলেছেন—' মনোতোষ মাথা নেড়ে তক্ষুনি একমত হ'লো আমার সঙ্গে। 'এই বাংলাদেশের মধ্যেই এত রকম ভেদাভেদের কোনো মানেই হয় না। আর সেটা দূর করবার উপায়ই হ'লো পরস্পরে আরো মেলামেশা। এবারে ঢাকায় এসে আমি এক নতুন দৃষ্টি লাভ করলাম।'

সেই মুহূর্তে এক পেয়ালা চা হাতে ক'রে তাপসী ঘরে ঢুকলো। মনোতোষ বেগে উঠে দাঁড়ালো চেয়ার থেকে, হাত জোড় ক'রে নমস্কার ক'রে দাঁড়িয়েই থাকলো।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'মনোতোষবাবু, আপনি বসুন। আর ঐ চা-টা তুমি এঁকেই দাও, তাপসী।'

'না, না, সে কী হয়—আপনি নিজের হাতে ক'রে এনেছেন মনোতোষবাবুর জন্য—'

'আর-এক পেয়ালা নিয়ে আসছি এক্ষুনি।' পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাপসী আরো চা নিয়ে এলো, সঙ্গে কিছু ঘরে-তৈরি ক্ষীরের সন্দেশ।

'এ-সব আবার কেন? শুধু চা-ই তো বেশ ভালো ছিলো। মিছিমিছি—তা আপনার পেয়ালা দেখছি না?'

তাপসী বললে, 'বেশি চা খাই না আমি।'

'ক-পেয়ালা খান?'

'ঠিক নেই কিছু। তা সন্দেশটা একটু মুখে দেবেন না, মনোতোষবাবু?'

'নিশ্চয়ই—বাঃ, চমৎকার! আচ্ছা, চা না-ই বা খেলেন, একটু বসুন এখানে।'

'হাতে কাজ আছে এখন, পরে দেখা হবে।' তাপসীর চ'লে যাওয়ার দিকে একটু তাকিয়ে থাকলো মনোতোষ, তারপর নিঃশব্দে কয়েক চুমুক চা খেলে। তার চিরপ্রফুল্ল মুখ হঠাৎ একটু গম্ভীর দেখালো।

'হঠাৎ এসে বিরক্ত করলাম আপনাকে। আপনি পড়ছিলেন।'

আমি বললাম, 'কিছুমাত্র না। আর-কিছু করবার নেই, তাই একটা বই নিয়ে বসেছিলাম।' কিন্তু আমার এই প্রতিবাদ আমার নিজের কানেই ফাঁকা শোনালো।

'কী বই ওটা?'

বইটার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে (আসলে আমার মন তখনও সেখানে প'ড়ে ছিলো) জবাব দিলাম, 'ফ্লরেন্সের মেদিচিদের বিষয়ে বই একটা।'

'ফ্লরেন্সের মেদিচি? যাঁরা মস্ত বড়ো আর্ট-পেট্রন ছিলেন?'

'হ্যাঁ, তাঁরাই। আরো অনেক-কিছু ছিলেন তাঁরা। আশ্চর্য সব মানুষ।'

'তাঁদের বিষয়ে কিছু লিখছেন বুঝি আপনি?'

'না, না, লিখবো কেন—আর আমি আবার লিখবোই বা কী। এমনি পড়ছিলাম—কৌতূহল মেটাতে।'

'অমৃত বলে আপনি নাকি কবিতা লেখেন ?'

'কে, মন্টু ? ও তা-ই সন্দেহ করে, আর সেজন্তে একটু রেগেও আছে আমার উপর।'

'অ লক সন্দেহ ?'

আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জবাব দিলাম, 'ছেলেবেলায় মন্টু আর আমি একসঙ্গে হাতে-লেখা কাগজ বের করতাম; এখন সে মস্ত বড়ো এঞ্জিনিয়র হ'তে চলেছে আর আমি সায়াল্সটা পর্যন্ত পড়লাম না—এটা আমার একটা অপরাধ বইকি।'

'অপরাধ কেন ? সাহিত্য কি একটা কম জিনিশ ? ইতিহাসকে তুচ্ছ করতে কি পারি আমরা ? দেশের কাজে এ-সবও তো কম লাগে না।'

মনোতোষের কথা শুনে আমার চোখের পলক পড়লো। বিষয়টা বদলাবার চেষ্টায় বললাম, 'আর-একটু চা দেবে আপনাকে ?'

'না, আর না, থ্যাঙ্কস।' সুগন্ধি সিল্কের রুমাল বের ক'রে আস্তে একবার চাপ দিলে ঠোঁটে। 'হ্যাঁ—অমৃতর সবই ভালো, শুধু এখনও একটু ফিলিস্টাইন-মতো আছে। আর্টের কদর বোঝে না।'

আমি বললাম, 'তা ওটা এমন কী ব্যাপার যে সকলকে মাথা ঘামাতে হবে তা নিয়ে ? দু-চারজন এখানে-ওখানে থাকে তো থাক, তাতে দেশের উন্নতির কোনো ব্যাঘাত হবে না।'

'এই তো আপনি ঠাট্টা করছেন আমাকে!' ঝকঝকে দাঁতে হাসলো মনোতোষ। 'আমি অবশ্য অনধিকারচর্চা করতে চাই না, কিন্তু—যদি আপনি কখনো কিছু লেখেন—লিখে ছাপাতে চান—তাহ'লে আমি হয়তো আপনার কোনো কাজে লাগতে পারি।'

'আমার লেখা ছাপাবার যোগ্য হ'লে তবে তো সে-কথা উঠবে।'

'ও-সব যোগ্য-অযোগ্যের কথা ছেড়ে দিন, মশাই—সবই চেনাশোনায় হয়। ব্যাপার কী জানেন, আমার বাবার সঙ্গে অনেক কাগজের কর্তার চেনাশোনা আছে—উজ্জ্বলীর বিজ্ঞাপন ছাপেন তো তাঁরা—একজন সম্পাদক

তো বাবার বন্ধুই, রোববার সকালে আড্ডা দিতে আমাদের বাড়ি আসেন। আপনি কিছু লিখলে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, তারপর আমি যা হয় করবো। রবিবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার?'

মনোতোষের প্রশ্ন শুনে আমি চেয়ার থেকে প'ড়ে যাচ্ছিলাম। 'র বি বা বু? রবীন্দ্রনাথের কথা বলছেন? তাঁর সঙ্গে আমার আ লা প হবে কেমন ক'রে?'

'সে এমন অসম্ভব কী। হ'তে পারে তিনি "গীতাঞ্জলি" লিখে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, কিন্তু আপনার আমার মতো একজন মানুষই তো! তাঁকে চোখেও ছাখেননি?'

'দেখেছি—ঢাকায় এসেছিলেন গেলো বছর। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা করলেন।'

'কাছে যাননি?'

'কাছে কেন যাবো? আর গিয়ে বলবোই বা কী?'

'বলবেন—"আপনার অমুক বইখানা (সবশেষে যেটা বেরিয়েছে সেটার নাম করবেন) আমার খুব ভালো লেগেছে।" ও-কথা শুনে—যিনি যত বড়োই হোন—কারো মনে-মনে খুশি না-হ'য়ে উপায় থাকে না। তারপর বলবেন, "আমার জীবনে এই-এই সমস্যা দেখা দিয়েছে, আপনার কাছে উপদেশ চাই।" নয়তো শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জানাবেন। তাঁর বেশি কথা বলার সময় হবে না, পরে আপনি খুব গুছিয়ে একখানা চিঠি লিখবেন। উত্তর এলে আর-একখানা লিখবেন—দেশের বা জগতের কোনো সমস্যা উত্থাপন ক'রে। এমনি ক'রে, দেখুন, রবিবাবুর কয়েকখানা আপনার সম্পত্তি হ'য়ে যাবে—সেটা একটা কম কথা!'

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে মনোতোষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'আমার কথাগুলো হয়তো আপনার খুব ভালো লাগছে না, কিন্তু আমি—ধৃষ্টতা মাপ করবেন—আপনার হিতৈষী হিশেবেই বলছি। কী জানেন, এই সংসারে এগিয়ে যেতে হ'লে শুধু বুদ্ধি আর বিদ্যে থাকাই যথেষ্ট নয়—সেই সঙ্গে চাই ঠিক-ঠিক দেবতার কাছে ঠিক-ঠিক সময় বুঝে

পুজো দেয়া—দেশের মধ্যে যাঁরা “দশজন” ব'লে গণ্য তাঁদের সঙ্গে হৃদ্যতা করলে কোনো ফল পাওয়া যায় না তা হ'তেই পারে না। আজ যাঁরা “দশজন” [illegible] তাঁরা তাঁদের আগেকার “দশজনে”র ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন, সেই “দশজন” আবার তাঁদের আগেকার—এমনি চ'লে এসেছে চিরকাল, এমনি চলবে।'

মনোতোষের এই থিওরি আমার এতই অদ্ভুত মনে হ'লো যে আমি হেসে ফেললাম। 'প্রথমত, আপনার কথা বিশ্বাস করি না; আর দ্বিতীয়ত, আপনার কথাই যদি সত্য হয় তাহ'লে “এগিয়ে যেতে” একটুও ইচ্ছে নেই আমার।'

আমার কথা শুনে মনোতোষ রাগ করলে না, বরং আমার হাসির উত্তরে নিজেও হেসে বললে, 'আমার সব কথাই ভুল হ'তে পারে, কিন্তু এ-কথা আমি বলবোই যে আপনার কলকাতায় আসা উচিত। পকেটে দু-চারটে লেখা নিয়ে চ'লে আসুন একবার, তারপর আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না। আমার সাধ্য অবশ্য অল্পই; বড়ো জোর পারবো দু-তিনজন সম্পাদকের কাছে আপনাকে নিয়ে যেতে, আর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ এলে তাঁর কাছেও নিয়ে যেতে পারবো—আমার বাবার আনাগোনা আছে জোড়াসাঁকোয়—আর শিশির ভাতুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে চান তারও ব্যবস্থা করা যাবে। আর, জানেন তো, কলকাতায় এখন সিনেমা তৈরি হচ্ছে, আনকোরা নতুন একটা ব্যাপার—শুনছি অনেক টাকার ফেলাছড়া হচ্ছে সেখানে—তাতে যদি ঢুকে যেতে পারেন তাহ'লে কে জানে পঁয়ত্রিশ বছর পরে বাংলা ফিল্মের পাইওনিয়র হিশেবে কর্পোরেশন আপনাকে মানপত্র দেবে না?'

আমার মনে হ'লো মনোতোষ প্রলাপ বকছে। তাকে চৈতন্যে ফিরিয়ে আনার জন্যে বললুম, 'আপনি ভুল করছেন। আমি একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি নই, কোনো সম্পাদক বা ফিল্মের মালিককে চমকে দেবার মতো কোনো পাণ্ডুলিপি কখনোই স্থান পাবে না আমার পকেটে। আমি এখান

থেকেই এম. এ. পাশ করবো, তারপর এখানকারই ইউনিভার্সিটিতে একটা মাষ্টারি যদি জুটে যায় তবে আমি আর-কিছু চাই না।'

'কী ক'রে জানেন? আপনার বয়স এখনো অল্প—মাপ করবেন, সেদিন হিশেব হ'লো, মনে নেই?—আমি তিন বছরের বড়ো আপনার, তাছাড়া আমার [illegible] বেশি সেটা তো মানবেন?—আমি বলতে চাচ্ছি নিজের বিষয়ে সব কথা আপনি এখনো জানেন না। তাছাড়া অন্য একটা ব্যাপার আছে—একটা "এক্স"—যেটাকে আমরা ভাগ্য নাম দিয়ে থাকি। সেদিন মাসিমা বললেন—আপনার মা-র কথা বলছি—' একই রকম স্বরে মনোতোষ ব'লে চললো—'আপনি এম. এ. পাশ করার পরে আপনারা কোথায় থাকেন ঠিক নেই?'

'সে তো বটেই। এখানে যে চাকরি পাবোই তার নিশ্চয়তা কী। যেখানে পাবো সেখানেই চ'লে যেতে হবে।'

'তখন এই বাড়িটার কী হবে?'

'অন্যেরা থাকবে।'

'ভাড়া দেবেন?'

'ভাড়া কি আর দিতে চাইবেন কাকারা?'

'আপনার মা-র একলার বাড়ি নয় এটা?'

আমি লাল হলাম মনোতোষের প্রশ্ন শুনে। কোনো জবাব দিলাম না।

'মাপ করবেন—এটা ব্যক্তিগত কথা, জিগেস করাটা অন্যায় হয়েছে আমার। আসলে কী জানেন—এই যে আপনাদের বাড়িতে এত আত্মীয়-স্বজন দেখতে পাই—ভারি ভালো লাগে আমার। আমাদের বাড়িতে শুধু বাবা, মা, আমি, আর আমার ছোটো এক ভাই। দুই দিদির বিয়ে হ'য়ে গেছে—একজন দিল্লিতে, আর-একজন সরকারি-চাকুরে স্বামীর সঙ্গে জেলায়-জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কলকাতায় আর যাঁরা আছেন সকলেই থাকেন আলাদা, মাঝে-মাঝে বেড়াতে-আসা-গোছ আসা-যাওয়া হয়। ফাঁকা প'ড়ে থাকে বাড়ি। আচ্ছা—ঐ তাপসী ব'লে মেয়েটি, আপনার বোন হয়?'

'কী হয় ঠিক জানি না।'

'জানেন না?' ভুরু কোঁচকালো মনোতোষ।

'মানে—সম্পর্কটা দূর—'

'—কিন্তু মানুষটি আপন,' মনোতোষ আমার কথা শেষ করলো। আমি হঠাৎ শিউরে উঠলাম।

'বাড়ির কথাটা জিগেস করলাম কেন, বলি,' একটু চুপ ক'রে থেকে মনোতোষ আবার বলতে লাগলো। 'আমার ইচ্ছে করছে ঢাকায় একটা বাড়ি কিনতে—অবশ্য এখন পর্যন্ত এটা পরিকল্পনা মাত্র, ফিরে গিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বললে তবে বোঝা যাবে—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই রকম জমিওলা একটা বাড়ি কিনে এখানে ডাক্তারির একটা ব্রাঞ্চ-ফ্যাক্টরি খুলি।'

'জমিওলা বাড়ির অভাব নেই ঢাকায়, আপনি খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন। আর এই বাড়ি বিক্রি করার কখনো যদি কথা হয়, নিশ্চয়ই জানাবো আপনাকে।'

'আমার একটা দোষ—কোনো আইডিয়া মাথায় এলে আর স্থির থাকতে পারি না, তক্ষুনি সেটাকে নিয়ে উঠে-প'ড়ে লাগতে ইচ্ছে করে। —ববঙ্গে পণপ্রথার উৎপাত কী-রকম?'

মনোতোষের বিষয়গুলির অসংলগ্নতায় ততক্ষণে অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছি আমি; কিন্তু তার এই শেষ প্রশ্নটিতে আমার বড্ড বেশি চমক লাগলো। হঠাৎ যেন তার মনের ভিতরটা দেখতে পেলাম আমি; যে-ভিমে সেখানে সে তা দিচ্ছে তার আকৃতিটা চোখের সামনে ফুটে উঠলো। মনোতোষ আনমনা হ'য়ে ব'সে থাকলো একটুক্ষণ, জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে, তারপর আমার মুখের উপর চোখ সরিয়ে এনে বললে, 'এখনো অনেকে আমাদের পণপ্রথার পক্ষপাতী, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি শ্বশুরের অর্থপয়সা নেবো না।'

'শ্বশুর যদি ভালোবেসে তাঁর মেয়েকে দেন তাহ'লে ফিরিয়ে দেবেন?'

'আমাদের প্রত্যেকের বোধহয় গরিবের মেয়ে বিয়ে করা উচিত—যার কিছু দেবার সামর্থ্য নেই।'

'তাহ'লে ধনীকন্যাদের কী দশা হবে?'

'তারা বিয়ে করবে গরিব ছেলেদের—আর এমনি ক'রে সমাজে সাম্য ও সুবিচার স্থাপিত হবে। ধনীর সঙ্গে ধনীর আর গরিবের সঙ্গে গরিবের বিয়ে—এতেই দেশটা আরো বেশি উচ্ছন্নে গেলো।'

'কিন্তু সব দেশেই তো মোটামুটি তা-ই ব্যবস্থা।'

'কিন্তু অন্যান্য দেশে জাতিভেদ নেই; আমরা দিশি বিলিতি নতুন পুরোনো দুই রকমের ভেদের চাপে মারা যাচ্ছি।—চলি, অনেক বাজে বকলাম, অনেক সময় নষ্ট করলাম আপনার—কিছু মনে করবেন না।'

মনোতোষ বিদায় নেয়াতে এত বেশি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম যে আমি তক্ষুনি বললাম, 'চলুন একটু এগিয়ে দিয়ে আসি আপনাকে।'

ঘর থেকে বেরোতেই আমার মা-র সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। মনোতোষ টিপ ক'রে তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।—'কত ভাগ্যে আপনার দেখা পেলুম, মাসিমা।'

'কেন, আমার দেখা পাওয়া এমন কী শক্ত।'

'কত কাজে ব্যস্ত থাকেন আপনারা—এসে উৎপাত করি।'

'চা খেয়েছো তো?' মা সস্নেহ চোখে মনোতোষের দিকে তাকালেন। 'আবার এসো। নীলু বেরোচ্ছিস?'

'এক্ষুনি আসছি, মা।'

আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই একটা মিনিট পাঁচেকের মাঠ পাওয়া যায়—মধুবাবুর মাঠ বলে পাড়ার লোকেরা, যদিও এই মধুবাবু ব্যক্তিটি কে তা কারোরই জানা আছে ব'লে মনে হয় না। তৈরি রাস্তা নেই, মাঠের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা পথ ধ'রে পেরোতে হয়, আর ঠিক মধ্যিখানে একটা মস্ত উঁচু ও সুশ্রী তেঁতুলগাছ ঝিরিঝিরি ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে। এই ছায়ায় এসে মনোতোষ হঠাৎ থামলো।

'একটু দাঁড়ানো যাক, নীলাঞ্জনবাবু। দিব্যি ছায়াটি হয়েছে, না?'

'সত্যি—যা গরম!'

'তা গর্মির দিনে গরম হবে তাতে আর আশ্চর্য কী।—আসুন,' সিগারেট এগিয়ে দিলে আমার দিকে।

তখনও আমি সিগারেটে অভ্যস্ত হইনি, কিন্তু তার হাত থেকে সিগারেট নিলাম। মুহূর্তের জন্য পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকালাম আমরা।

মনোতোষ বললো, 'আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

আমি মনে-মনে ঠিক এই রকমই কিছু আশঙ্কা করছিলাম। কথাটা কী তাও ঝাপসাভাবে অনুমান করতে পারছিলাম না তা নয়, কিন্তু নিজে কিছু না-ব'লে তারই কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করলাম।

'আমি যা বলবো তা শুনে আপনি হয়তো কিছুটা অবাক হবেন। তাই ভূমিকাস্বরূপ জানানো দরকার যে অমৃত—মানে, মণ্টু—আমাকে সব কথাই বলে—তার পারিবারিক ব্যাপারেও পরামর্শ করে আমার সঙ্গে।'

'ঠিকই করে; সাংসারিক বিষয়ে পরামর্শ দেবার যোগ্যতা সত্যিই আছে আপনার।'

'আপনিও তা-ই বলছেন? কিন্তু আসলে আমি আইডিয়ালিস্ট, একটা আদর্শ সামনে রেখে কাজ করি—অন্তত চেষ্টা করি তা-ই। কথাটা হচ্ছে, অমৃত আপনাকে ঠিক পছন্দ করে না।'

আমার ঠোঁট যে-রকম ভঙ্গিতে বেঁকে গেলো তাকে ঠিক হাসি বলা যায় না।

'মানে—এমনিতে ওর ভালো লাগে আপনাকে, কিন্তু ভগ্নীপতি হিশেবে পছন্দ করছে না। ওর ধারণা, সেই পদবির আমি ঢের বেশি উপযুক্ত।'

আমি সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে বললাম, 'আমাকে এ-সব কথা বলা বৃথা, মনোতোষবাবু।'

'আপনি ভাবছেন, মিলি আপনাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না? করতে চাইবে না, সে-বিষয়ে আমারও সন্দেহ নেই। কিন্তু অল্প বয়সের বাঙালি মেয়ে, অত্যধিক আদরে-যত্নে প্রতিপালিত, আর ঐ তো ডেলিকেট স্বাস্থ্য—কত পারবে লড়াই চালাতে জাঁদরেল দাদার সঙ্গে? অমৃতর

ওদের সামনে তার মা-বাবাই বা কতক্ষণ টিকতে পারবেন ? গিরিজাবাবু তো এর মধ্যেই একটু হেলেছেন আমার দিকে—"নীলাঞ্জন খুব প্রমিসিং, কিন্তু মনোতোষ তৈরি ছেলে"—এই রকমের মনের ভাবটা মনে হচ্ছে তাঁর। আমাকে সেদিন খুঁটে-খুঁটে উজ্জয়িনী কোম্পানির অবস্থার কথা জিগেস করছিলেন। আমি এসেছিলুম সরল বিশ্বাসে ঢাকায় বেড়াতে—আর মনে-মনে ছিলো উজ্জয়িনীর জন্যে যদি কিছু করতে পারি। অমৃত আমার জন্য এই ফাঁদ পেতে রেখেছে তা কল্পনাও করিনি—রীতিমতো চিন্তিত বোধ করছি।... কিছু বলছেন না আপনি ?'

'আমার কিছু বলবার নেই,' তাচ্ছিল্যভরে মাথা ঝেঁকে জবাব দিলাম।

'কিছুই না ?'

'আপনি যে-বিষয়টি উত্থাপন করেছেন তা আমার মতে একান্তই আমার ব্যক্তিগত—সেখানে মন্টু কেউ নয়, আপনি কেউ নন, জগতের আর-কেউ কিছু নয়।'

'কিন্তু ধরুন—যদি ঠোঁটের কাছ থেকে পেয়ালা ফসকে যায় ?'

'আপনার উপমাটাতে আমি আপত্তি করছি, মনোতোষবাবু। আপনি যদি আর-একটু ভদ্রভাবে কথা বলতে না পারেন আমি আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়াবো না।'

মনোতোষ অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকালো। 'এতে আপনি ভদ্রতার অভাব কোথায় দেখলেন ? মাপ করবেন—আপনার সুকুমারবৃত্তিতে যদি আঘাত দিয়ে থাকি তো ক্ষমা চাই—কিন্তু আমি তো বেশি সাহিত্য পড়িনি, অল্পই উপমা জানা আছে আমার : ঠোঁট, পেয়ালা ; ফুল, ভ্রমর ; মধু, মক্ষিকা—এমনি অতি মামুলি কয়েকটা। আর এর প্রত্যেকটাই নিশ্চয়ই সমান খারাপ লাগে আপনার ?—কিন্তু উপমার কথা ছেড়ে দিন, আমি যা বলতে চাচ্ছি তা তো বুঝতে পারছেন ?'

'আপনাকে বলেছি তো, এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে আমি ইচ্ছুক নই।'

'নাঃ—বা' লদেশের সবই ভালো, কিন্তু সত্যি আপনারা বড্ড গোঁয়ার। জেদের জন্য নিজের ক্ষতি করতেও পেছপা হবেন না!—কিন্তু প্লেটো থেকে দেকার্ত্‌ পর্যন্ত মনীষীরা কি ব'লে যাননি যে মানুষের মধ্যে যুক্তিই হ'লো ঐশ্বরিক বিভা, সেই যুক্তিকে অবহেলা করলে—'

আমি এমনভাবে মনোতোষের দিকে তাকালুম যে তার ভাঁড়ামি তক্ষুনি থেমে গেলো। গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'অনুমতি করেন তো সরল বাংলায় কথাটা জিগেস করি : যদি আর ছ-মাসের মধ্যে মিলির সঙ্গে অন্য কারো বিয়ে হ'য়ে যায় তাহ'লে আপনার কেমন লাগবে?'

মিলিকে মুহূর্তের জন্য অন্য কারো স্ত্রী ব'লে কল্পনা করলাম আমি—আর আমার মন এক অদ্ভুত নিরাশায় ডুবে গেলো। নিরাশার কারণ—কষ্ট নয়, কষ্টের অভাব। ভেবেছিলাম—ধ'রে নিয়েছিলাম যে ব্যথিত হবো, মর্মাহত হবো; ভেবেছিলাম এই কথা মনে আনামাত্র আমার হৃৎপিণ্ড যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠবে। কিন্তু সে-রকম কিছুই হ'লো না—আমার হৃৎপিণ্ড অস্পষ্টভাবে কী-যেন গুনগুন ক'রে নীরব হ'য়ে গেলো। মনে-মনে তাকে আঘাত ক'রে আমি বললাম—'বলো! সাড়া দাও! চুপ ক'রে আছো কেন?'—লম্পট যেমন তার ক্লান্ত ইন্দ্রিয়কে কৃত্রিম উপায়ে চেতিয়ে তোলার চেষ্টা করে তেমনি ক'রে তাকে পীড়ন করলাম আমি, নানা রকম শোকের দৃশ্য তুলে ধরলাম তার সামনে, মিলির কান্না, আমার পরাজয়, আমার পৌরুষহীনতা—তবু সেই নিষ্ঠুর কোনো উত্তর দিলে না। দুপুরের জ্বলজ্বলে রোদ ম্লান হ'য়ে এলো আমার চোখে, আমার পা দুর্বলভাবে কেঁপে উঠলো, মুখ দিয়ে একটি কথাও বের করতে পারলাম না।

ভাগ্যিশ মাথা নিচু ক'রে ছিলাম, মনোতোষ আমার মুখ দ্যাখেনি, কিংবা দেখে থাকলেও আমার ম্লানিমার সাত্যিক কারণ সন্দেহ করতে পারেনি সে। মিনিটখানেক পরে, হয়তো মনে-মনে আমার অপ্রতিভতা উপভোগ ক'রে, সে আর-এক প্যাঁচ স্ক্রু চালিয়ে দিলে—'এদিকে আমিও সম্প্রতি বিয়ে করার কথা ভাবছি।'

'আমার এখনো মনে হচ্ছে না আমার কিছু বলবার আছে এ-বিষয়ে,' নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ তুলে তাকালাম আমি।

'যদি মিলিকেই বিয়ে ক'রে ফেলি?' চোখ দুটি উপরের দিকে তুলে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো মনোতোষ।

'যদি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তা করেন,' কপটভাবে জবাব দিলাম আমি, 'তাহ'লে আমি বলবো আপনি যথেষ্ট পুরুষ নন।'

'ব্রাভো! বেশ বলেছেন!' নাটুকে ধরনে মনোতোষ আমাকে কুর্নিশ করলো। 'কিন্তু—আপনাকে এখনই জানিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই—মিলিকে আমি বিয়ে করবো না। অমৃত পিড়াপিড়ি করুক, এমনকি গিরিজাবাবু প্রস্তাব করুন—তবু না। প্রথমত, আপনার সঙ্গে মিলির যে-সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছে, আর তার ইতিহাস আমি যেটুকু জানতে পেরেছি—'

'যাক, ওটা যাক, ওটা বাদ দিয়ে যান,' আমি হাত নেড়ে মাছি তাড়াবার মতো ভঙ্গি করলাম

মনোতোষের চোখের কোণ থেকে একটা ঝিলিক বেরোলো। একটু পরে অমায়িকভাবে আবার বললে, 'আমি বলতে যাচ্ছিলাম আপনাদের এই সম্বন্ধটাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার মুখ থেকে ও-কথা শুনতে আপনার যখন ভালো লাগছে না তখন ওটা বাদ দিয়ে যাই। আমার নিজের দিক থেকেই বলি তাহ'লে। বিয়ে সম্বন্ধে আমার ধারণা তো বলেছি আপনাকে, সেটা শুধু মুখের কথা নয় আমার, কাজেও আমি তা-ই করবো, আমি গরিবের মেয়ে বিয়ে করতে চাই। আমার মা-বাবা সে-লাইনে ভাবছেন না, কিন্তু আমি তাঁদের রাজি করাতে পারবো। গরিবের মেয়ে, স্বাস্থ্যবতী, বছরে একদিন মাথা ধরে না, গৃহকর্মে নিপুণ, বাধ্য, সেবাপরায়ণা, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তেজ আছে। কোনো শৌখিন গুণপনা চাই না আমি, না-ই বা সে একটু-একটু ছবি আঁকলো, কি গান গাইলো, আমি চাই সে সত্যিকার স্ত্রী হবে—সবভাবে।' একটু থেমে আমার চোখে চোখ ফেলে গলা নামিয়ে বললো—যদিও আশে-পাশে জনপ্রাণী ছিলো না—'কিন্তু কী

জানেন, ও-রকম মেয়ে কলকাতায় আমাদের সমাজে পাওয়া শক্ত। দেখেছি তো অনেক—ব্রাহ্ম ধরনের বাড়ি, বেথুন-কলেজে-পড়া মেয়ে, অর্গ্যান বাজিয়ে গান শোনায় তারা, ইংরেজি বুকনি আওড়ায়—আমি হাত নাড়লে তার যে-কোনো একজন ছুটে আসে। বি. এ. পাশ করলে হবে কী, আসলে বিয়ের জন্য হাঁকড়াচ্ছে। আর তার বিয়ের আদর্শ হচ্ছে : টাকা, আরাম, সোশ্যাল লাইফ, ড্রয়িংরুমে পরচর্চা। এক পেয়ালা চাও যেন নিজের হাতে করতে না হয়। না মশাই, ও-সবে আর চিত্ত নেই আমার ; আমি যা চাই, যা মনে-মনে খুঁজছি, তা মনে হয় এই ঢাকায় পাওয়া যেতে পারে। সত্যিকার বৌ—ভারি মিষ্টি আপনাদের বাঙাল ভাষার এই "বৌ" কথাটা!' কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করলো যেন মুখ দিয়ে লালা ঝরবে।

মনোতোষের কথা শুনতে-শুনতে রাগে চিড়বিড় করছিলো আমার মাথার মধ্যে। তার অসভ্যতা যে এতদূর যেতে পারে তা আমি কল্পনাও করিনি।

'শুনুন, মনোতোষবাবু,' আমার গলা কাঁপছিলো, কিন্তু আমি নিজেকে সংযত ক'রে আস্তে-আস্তে বললাম, 'আপনি গরিবের মেয়ে বিয়ে করতে চান সে কৃতজ্ঞতায় আপনার দাসী হ'য়ে থাকবে ব'লে, তেজি মেয়ে চান তাকে জুলুম ক'রে বাগ মানিয়ে উল্লসিত হবেন ব'লে। কিন্তু ঠিক ও-রকম কোনো মেয়ে আমার জানা নেই, অতএব আপনার বৈবাহিক ব্যাপার আমাকে বাদ দিয়েই সমাধা করতে হবে আপনাকে।'

'কিন্তু আপনারই সাহায্য আমি চাই যে,' আমার বুকের উপর আস্তে টোকা দিলে মনোতোষ, আমি দু-পা পেছিয়ে গেলাম। 'আপনার পথ খোলশা ক'রে দিচ্ছি আমি, আপনিও আমার জন্য কিছু করবেন না?'

'আপনার নির্লজ্জতায় আমি স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছি ; আর-একটাও কথা বলতে চাই না আপনার সঙ্গে।'

'কী মুশকিল! আপনার এই সূক্ষ্ম স্নায়ু নিয়ে তো বড়ো ফ্যাশাদে পড়লাম। এর মধ্যে আপনি নির্লজ্জতা দেখছেন কোথায়? কিছু দাও, এবং কিছু নাও—এ-ই তো জগতের নিয়ম, যাকে বলে ফেয়ার এক্সচেঞ্জ।

আর আমি তো বিয়ে করতেই চাচ্ছি—সীরিয়াসলি—একটা অনেস্ট অফার রাখছি আপনাদের সামনে। একবার বিবেচনা ক'রেও দেখবেন না?'

'আমাকে মাপ করুন, মনোতোষবাবু, আমার অনেক কাজ আছে—আপনার আজে-বাজে কথা শোনার আমার সময় নেই।'

এতক্ষণ তা হয়নি, কিন্তু এইবার মনোতোষের সুদর্শন মুখটি কঠিন হ'লো। কালো দেখালো তাকে, থুতনিটাকে হঠাৎ লম্বা মনে হ'লো। কিন্তু পর-মুহূর্তেই—আশ্চর্য শক্তি তার—গালের ভাঁজে-ভাঁজে হাসি ফুটিয়ে বললে, 'আচ্ছা বেশ, তা-ই হবে। সুখের বিষয়, আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ নই, আর প্রতিহিংসার জন্যও ঐ চিমসে মিলিকে নিয়ে এক বিছানায় শোবো না। আপনার সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রীর জন্যই তা রইলো।'

আমার গলা দিয়ে একটা আর্তস্বর বেরোলো; কানে হাত চাপা দিয়ে একছুটে বাড়ি চ'লে এলাম।

আট

ঘরে পা দিয়েই তাপসীর সঙ্গে দেখা। আমার টেবিল গুছোচ্ছিলো, আমি যখন ঘরে থাকি না প্রায়ই ঐ কাজটি ক'রে রাখে।

'নীলু, বড্ড ঘেমেছো!'

'হ্যাঁ, খুব রোদ।'

'এই সবগুলো বইই কি পড়ছো এখন, না কয়েকটা আলমারিতে তুলে রাখবো?'

'টেবিলেই—থাক,' আমি আবছা গলায় জবাব দিলাম।

'হাঁপাচ্ছো কেন? কী হয়েছে?' তাপসী তাকালো আমার দিকে, কিন্তু আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। একটু আগে স্নান করেছে সে, চুল ছেড়ে দিয়েছে পিঠের উপর, শান্ত মুখশ্রী। তার এই নির্মলতার সামনে নিজেকে অসহ্য লাগছিলো আমার; নোংরা, নোংরা, নোংরা হ'য়ে আছি আমি, যেন একটা ক্লেদাক্ত নর্দমায় প'ড়ে গিয়েছিলাম, কি একটা কদর্য সরীসৃপ আমার সারা গা চেটে দিয়েছে। মনোতোষের কথাগুলি তখনও ঘোরাফের করছে আমার মগজের মধ্যে, পোকার মতো কামড় দিচ্ছে থেকে-থেকে। কতক্ষণে ভুলতে পারবো ওগুলো? কবে সব মুছে যাবে?

'গিয়েছিলে কোথায়? মনোতোষের সঙ্গে বেরোতে দেখলাম যেন তোমাকে?'

'হ্যা—একটু বেরিয়েছিলাম।'

'এতক্ষণ কী করলে?'

আমি কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢকঢক ক'রে খেয়ে নিলাম, তাড়াতাড়িতে অর্ধেক জামা ভিজে গেলো।

'ইশ্! কেন যে অনর্থক ঘোরাঘুরি করো রোদ্দুরে!' তাপসী আর-একবার আমার দিকে তাকালে। 'এতক্ষণ কী বকবক করলে তো মনোতোষের?'

'ঢাকা খুব ভালো লেগেছে তার ; ঢাকায় বাড়ি কিনতে চায়, বিয়েও করতে চায় বাঙাল দেশের মেয়ে।'

'তোমাকে বলছিলো এ-সব কথা ?'

'আর আমি যদি কখনো কিছু লিখি, সে তা ছাপিয়ে দিতে পারবে কলকাতার মাসিকপত্রে।'

'আর তুমি ব'সে-ব'সে শুনছিলে ? যত বাজে!'

'বাজে কেন ? একটু বেশি কথা বলে হয়তো, কিন্তু অনেক গুণ আছে মনোতোষের।'

'তা হবে। ওদের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলে ?'

'এখন ? না। কেন বলো তো ?'

'বেরোলেই যখন, মিলিকে একবার দেখে এলে না কেন ? কাল আসতে পারেনি, শরীর ভালো ছিলো না—কেমন আছে জানতে পারলাম না।'

'ভালোই আছে। কাল সন্ধেবেলাই তো গিয়েছিলাম আমি।'

'কেমন ছিলো তখন ?'

'সর্দি হয়েছিলো—আর সর্দি হ'লে ও বড়ো কষ্ট পায়।'

'সেদিন বৃষ্টিতে ভেজেনি তো লুকিয়ে-লুকিয়ে ?'

'তা তো জানি না।'

'আমাকে বলছিলো আজকাল সন্ধেবেলা যখন মাঝে-মাঝে কালবৈশাখী ওঠে ওর খুব ভিজতে ইচ্ছে করে। পাড়ার কত ছেলেমেয়ে ভেজে, লাফায়, চ্যাচায়—কিন্তু ওর মা ওকে আগলে-আগলে রাখেন। "কিন্তু একদিন মা-কে লুকিয়ে আমি ভিজবোই, ভিজবোই, ভিজবোই। ছাদে চ'লে যাবো, কেউ টের পাবে না—চিলেকোঠায় শাড়ি বদলে নেমে আসবো ভালোমানুষের মতো মুখ ক'রে।" তাই ভাবছিলাম—'

আমি হেসে বললাম, 'তা ওকে যে-রকম কড়া পাহারায় রাখা হয়, দু-একবার আইন অমান্য করা হয়তো ভালোই।'

'কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে থাকলে ভালো করেনি। ওর অসুখ করলে বড়ো উদ্বেগ হয় আমার।'

'কেন, অত উদ্বেগের কী আছে?' হঠাৎ একটু ঝাঁঝালো গলায় আমি ব'লে উঠলাম। 'ননীর পুতুল তো নয় যে গ'লে যাবে। তোমরা ব'লে-ব'লে ওকে আরো রুগ্ন ক'রে দিচ্ছো।'

পুরো কথাটা আমার মুখ থেকে বেরোবার আগেই আমি বুঝতে পারলাম কত বড়ো অন্যায় আর নিষ্ঠুর কথা বলেছি। অনুতাপে জ্বালা করতে লাগলো বুকের ভিতরটা, মনে হ'লো ক্ষমা চাই, কিন্তু কেমন ক'রে কী বলবো কিছুই ভেবে পেলাম না। মুহূর্তের জন্য একটু ম্লান দেখলাম তাপসীকে, কিন্তু তক্ষুনি সে স্বাভাবিকভাবে বললে, 'ঠিক বলেছো, আমি একটু বাড়াবাড়িই করি মিলিকে নিয়ে। যে-উদ্বেগটা তোমার হবার কথা, ধ'রে নাও না সেটাই আমি নিজের ক'রে নিয়েছি।'

অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করলাম তার কাছে, আমার যে-হৃদয়টাকে মনোতোষ একটু আগে নোংরা থাবায় চটকে দিয়েছিলো, তা যেন দ্রব হ'য়ে তাপসীর দিকে ছুটে গেলো। অন্য দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি খুব বিশ্রী কথা ব'লে ফেলি এক-এক সময়।'

কথাটা না-শোনার ভান ক'রে তাপসী বললে, 'বিকেলের দিকে আমাকে একবার নিয়ে যাবে ওদের বাড়িতে?'

'যাবে তুমি?' উৎসাহে মুখ ফিরিয়ে ওর চোখে চোখ ফেললাম। 'কী অবাক হ'য়ে যাবে মিলি! কী খুশি হবে তোমাকে দেখে! কতদিন বলেছে, কিন্তু একদিনও যাওনি এখনো। চলো যাই। কিন্তু—' হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে প'ড়ে যাওয়ায় আমি থমকে গেলাম।

'আবার কিন্তু কেন?'

গ্রীষ্মকালে টেনিস থাকে না, দেরিতে বিকেল হয়, কিন্তু মণ্টু আর মনোতোষ রোজই বেরোয় ছ-টা নাগাদ, আটটার আগে ফেরে না। মনে-মনে সেই সময়টার হিশেব ক'রে নিয়ে আমি বললাম, 'কখন যেতে চাও?'

'তোমার যখন সময় হবে তখনই। এখন খেতে চলো।'

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

একটা কারণহীন, অর্থহীন সুখে আমার মন ছেয়ে গেলো সেই মুহূর্তে। তাপসী যাবে মিলিদের বাড়িতে, আর আমাকেই সঙ্গে নিয়ে যাবে, এই অতি সাধারণ ব্যাপার আমার মনে মস্ত একটা ঘটনা হ'য়ে উঠলো যেন। খাওয়ার পরে পাটি-পাতা বিছানায় সেই মেদিচিদের জীবনীটি হাতে নিয়ে শুয়ে পড়লাম, বইটি কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার মনকে আঁকড়ে ধরলে। সূর্যের মতো লোরেনৎসো, রাহুর মতো সাভনারোলা, রোদ্দুরে রামধনু-রঙা ফোয়ারার জলের মতো পিকো দেল্লা মিরান্দোলা, শিল্পী, বাজিকর, উৎসব, কূটনীতি, মত্ততা, নরকের ত্রাস, আর এই সবের ফাঁকে-ফাঁকে এক রহস্যময়ী রমণী: দু-ঘণ্টা বা আড়াই ঘণ্টা সময় আমি ভুলে থাকলাম মণ্টু আর মনোতোষকে, ভুলে থাকলাম আমার চারদিকে যা ঘনিয়ে আসছে—যা আমি বুঝেও এখনো না-বোঝার ভান করছি। কিন্তু কখন নিজেরই অজান্তে পনেরো শতকের ফ্লরেন্স থেকে চ'লে এলাম বিশ শতকের হুতোমগঞ্জে।

নদীর ধারের রাস্তাটি ধ'রে মিলি আর আমি বেড়াচ্ছি। বর্ষাকাল, মেঘের মধ্যে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, নদী কূলে-কূলে ভরা। আর ছেলেমানুষ নেই আমরা, দু-জনেই বড়ো হয়েছি, আমাদের মধ্যে অনুল্লিখিত একটা স্বীকৃতি আছে। খুব সুখকর এবং আসন্ন কোনো ঘটনা নিয়ে মৃদুস্বরে কথা বলছি আমরা। চলেছি সূর্যাস্তের মুখোমুখি, হাওয়ায় একটা লালচে আভা ছড়িয়ে আছে, কদমফুলের গন্ধমাখা সেই হাওয়া। মিলি বললে, 'কত কদম ফুল ফুটে আছে, দেখেছো—একটা ছিঁড়ে নিই?' 'আমি এনে দিচ্ছি।' মিলিকে ছেড়ে একটা ফুলন্ত গাছের দিকে এগিয়ে গেলাম, হঠাৎ চোখে পড়লো পথের পাশে কালোমতো কী-একটা প'ড়ে আছে। নিচু হ'য়ে সেটা তুলে নিয়ে ফিরে এলাম মিলির কাছে। 'ফুল পেলে না?' 'ফুল আনিনি, কিন্তু এই ছাখো ব্যাগের মধ্যে তি-তাড়া টাকা। সব দশ টাকার নোট।' 'কোথায় পেলে?' 'কুড়িয়ে

পেয়েছি।' 'কুড়িয়ে পেয়েছো? তাহ'লে শিগগির চলো ফিরে যাই—কার টাকা হারিয়েছে খোঁজ ক'রে দিয়ে দিই তাকে।' 'অত তাড়া কেন? কী সুন্দর সূর্যাস্ত হচ্ছে ছাখো; আরো একটু বেড়ানো যাক।' 'না, বাড়ি চলো। যার টাকা হারিয়েছে তার কথা ভাবছো না কেন তুমি?' 'তিনশো টাকা—সে যে অনেক।' 'অনেক হোক অল্প হোক, যার হারিয়েছে তার হারিয়েছে, আর যে পেয়েছে সে পেয়েছে—এর উপর আবার কথা কী?' 'তার মানে—তুমি এই টাকা ফিরিয়ে দেবে না?' 'অত চেঁচিয়ো না—কে কোথায় শুনে ফেলবে।' 'শুনুক—আমি সকলকে ব'লে দেবো—আমি আর তোমার সঙ্গে থাকবো না—তুমি যদি টাকা ফিরিয়ে না দাও তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আর রাখবো না আমি!' 'সে তোমার ইচ্ছে।' মিলি আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'নীলু, তুমি এত বড়ো পাষণ্ড!' 'ফের চ্যাচাবে তো দেবো এক ধাক্কায় নদীতে ফেলে! চুপ করো!' হাত উল্টো ক'রে ঠোঁটের উপর চেপে ধরলো মিলি, তার বিস্ফারিত চোখে এক অবর্ণনীয় আতঙ্ক আর যন্ত্রণা ফুটে উঠলো। এমন সময় গম্ভীর গলায় মনোতোষ ব'লে উঠলো, 'সেকেণ্ড মুন্সেফ গিরিজাবাবুর তিনশো টাকাসুদ্ধ ব্যাগ হারিয়েছে। যে পেয়েছো ফিরিয়ে দাও!' আমার ডানদিকে দাঁড়িয়ে তাপসী চাপা গলায় বললে, 'নীলু—শিগগির—আমাকে দিয়ে দাও ব্যাগটা।' আমার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সে আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেললে ওটাকে; তার হাতের চকিত স্পর্শে বিদ্যুতের স্রোত ব'য়ে গেলো আমার শিরায়। তাকিয়ে দেখি, মিলিকে মাঝখানে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মণ্টু আর মনোতোষ, পাশাপাশি দাঁড়ানো আমার আর তাপসীর মুখোমুখি। আর এই পাঁচজনকে ঘিরে গোল হ'য়ে অনেক লোক দাঁড়িয়েছে—কোত্থেকে এলো এরা?—শিশু, বৃদ্ধ, যুবা, পুরুষ ও নারী, ঘড়ি-চেন-আঁটা উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক থেকে ভিখিরি-সুদ্ধ বাদ যায়নি—সকলের চোখ আমাদের উপর ন্যস্ত, সকলের চোখে হিংস্রতা, অরণ্যে মুমূর্ষু মানুষকে শ্বাপদেরা যেমন ক'রে ঘিরে থাকে শুনেছি, তেমনি ক'রে এরা ঘিরে আছে আমাদের, এই সজীব ও প্রতীক্ষমাণ বৃত্তটি একটু-

একটু ক'রে কাছে স'রে আসছে, একটা গোলাকৃতি দেয়ালের মতো চেপে ধরেছে যেন। আমার চোখের সামনে মনোতোষের মাথা ভিড় ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেলো, দৈত্যের মতো বিরাট হ'য়ে উঠলো সে, যেন মেঘে মাথা ঠেকিয়ে বজ্রের মতো আওয়াজে বললে, 'সূর্য এইমাত্র নদীকে ছুঁয়েছে, অস্ত যেতে আর ঠিক দু-মিনিট বাকি আছে, এই দু-মিনিটের মধ্যে টাকা যদি ফিরিয়ে দেয়া না হয়, তাহ'লে নদী উঠে এসে ভাসিয়ে নেবে হতোমগঞ্জকে, ভীষণ বন্যায় সব ভেসে যাবে, কোনো পাপী আর জীবিত থাকবে না। যে নিয়েছো দাও…যে নিয়েছো দাও…এখনো দাও…আর দেরি কোরো না।' আমার সারা শরীরে দুর্দান্ত কাঁপুনি নামলো, জিভ শুকিয়ে গেলো মুখের মধ্যে, তাপসীকে বলতে চেষ্টা করলাম—'আমাকে ছুঁয়ো না, আমাকে ছুঁয়ো না—আমি বড়ো নোংরা—নোংরা, নোংরা, নোংরা—' কিন্তু একটু আওয়াজ বেরোলো না গলা দিয়ে। এক হাতে আমার হাত চেপে ধ'রে আর-এক হাতে তাপসী বের ক'রে দিলে কালো ব্যাগটা, এক ঘড়িচেন-আঁটা মোটা ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে সেটি তাঁর গলাবন্ধ কোটের পকেটে পুরলেন; ভিড়ের লোক এক পাল হায়েনার মতো খ্যাক-খ্যাক ক'রে হেসে উঠলো—মারাত্মক সেই হাসি, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে চলতে লাগলো যেন কখনো শেষ হবে না, অনেক পাটি বড়ো-বড়ো দাঁত লেলিহানভাবে অট্টহাসিতে হাঁ হ'য়ে থাকলো। ঢিলের মতো কথা পড়লো চারদিক থেকে: 'আগেই জানতাম ও চোর! আগেই জানতাম ও চোর!' 'মা নেই, বাপ তালুই, পরের অন্নে প্রতিপালিত, তার এই কাজ! ছী-ছি!' 'আরে মশাই গরিব ব'লেই তো চুরি করেছে—তিনশো টাকা একসঙ্গে চোখে দেখেছে নাকি কখনো!' 'পুলিশে দিন!' 'হাজতে নিয়ে যান!' 'শ্রীমতীবন্ধুপক্ষে শ্রীঘরই দেখছি ঠিক জায়গা!' ততক্ষণে সূর্য অস্ত গেছে, একটা পিঙ্গল আভা ছড়িয়ে আছে চারদিকে, হাওয়ার জোর বেড়ে উঠে নদীর খলখল শব্দ আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। একটা নামহীন আতঙ্ক আমার গলা চেপে ধরেছে, আমার শরীর যেন পাথর, আমি নিশ্বাস নিতে

পারছি না, অথচ অনুভব করছি তাপসীর একটি হাত আমার হাত ছুঁয়ে আছে। ভিড়ের লোক কতগুলো মশাল জ্বেলে নিয়ে এলো, আরো কাছাকাছি ঘিরে ধরলো আমাদের, সেই আলোয় দেখলাম মিলি তার দাদার পায়ের কাছে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে পাগলের মতো বিলাপ করছে। অনেক উঁচু থেকে বজ্রস্বরে মনোতোষ এবার ব'লে উঠলো—'তাপসী দত্ত, তুমি স্বীকার করো যে গিরিজাবাবুর চাপকানের পকেট থেকে তিনশো টাকাসুদ্ধ ব্যাগ তুমি চুরি করেছিলে! স্বীকার করো! স্বীকার করো! স্বীকার করলে আমি তোমাকে বিয়ে ক'রে কলকাতায় নিয়ে যাবো, সারাজীবন আমার আশ্রয়ে সুখে থাকবে—কিন্তু স্বীকার না-করলে কী ভীষণ শাস্তি হবে, জানো?' চারদিকে রব উঠলো মেয়ে-পুরুষের গলায়—'কী ভাগ্য! ঈশ, কী ভাগ্য! ঐ তো একটা হাড়-হাভাতে কালো-কুচ্ছিৎ মেয়ে—কপাল করেছিলো বটে!' 'কী মহানুভবতা! কী আত্মত্যাগ! গরিবের মেয়ে—চুরি ক'রে হাতে-হাতে ধরা পড়েছে, তবু তাকেই বিয়ে করতে চায়!' 'বাবা মনোতোষ, তুমি লক্ষ্মীমন্ত মানুষ, তোমার এই দুর্মতি কেন? আমার মেয়ের গায়ের রং চাঁপা ফুলের মতো, ষোলোয় পা দিয়েই আঠারোর মতো দেখায় তাকে, অর্গ্যান বাজিয়ে গান গাইতে পারে, আমাদের বুড়ি ঝি তাকে তেল মাখাবার সময় যা বলে তা এত লোকের সামনে বলতে আমার লজ্জা করছে কিন্তু চোখে দেখলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। আর তাছাড়া আমরা গরিব নই বাবা, দশ হাজার টাকা নগদ দেবো তোমাকে, মেয়ের গা-ভরা গয়না। আমি এখনই কথা চাচ্ছি না তোমার কাছে, কিন্তু একবার অন্তত মেয়েটিকে চোখে দেখে যাও!' 'আপনি চুপ করুন!' গর্জন ক'রে উঠলো মনোতোষ, 'আমি স্বাধীন মানুষ, আদর্শবাদী, আমাকে আপনি টলাতে পারবেন না। তাপসী দত্ত, তুমি স্বীকার করো যে চুরি করেছিলে!' 'চুরি আমি করিনি,' শান্ত গলায় জবাব দিলো তাপসী। 'তাহ'লে কী ক'রে ব্যাগটা এলো তোমার কাছে?' 'তা আমি বলবো না।' 'আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না, তাপসী দত্ত; স্বীকার করো চুরি করেছিলে।' 'চুরি আমি করিনি।'

'এখনো সত্য কথা বলো!' 'চুরি আমি করিনি।' 'আচ্ছা, রোসো তাহ'লে। মজা দেখাচ্ছি।' একটা বিকট হাসি ছড়িয়ে পড়লো মনোতোষের মুখে, রাক্ষসের মতো সারি-সারি অসংখ্য দাঁত বেরিয়ে পড়লো ; তার গলাটা লম্বা হ'তে-হ'তে একটা উড়ন্ত মোটা সাপের মতো আকাশে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে এলো তাপসীর দিকে, তার মুখের ঠিক কাছে এসে একটা মস্ত দাঁতালো মুখ খেয়ে গেলো। আমি তাকিয়ে দেখলাম, মনোতোষের জিভটা আগুনের মতো লকলক করছে, আর গরম মোমের মতো ফোঁটা-ফোঁটা লালা ঝ'রে মাটিতে পড়ামাত্র শক্ত হ'য়ে জ'মে যাচ্ছে। 'স্বীকার করবে না? তাহ'লে—দেখছো তো আমাকে—তোমার মুখ লালা দিয়ে ভিজিয়ে দেবো, কামড়ে ছিঁড়ে নেবো গালের মাংস, তোমার গলায় আমার গলা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে আস্তে, আস্তে, আস্তে, পিষে মারবো তোমাকে। কেমন—রাজি আছো এতে?' ভিড়ের লোক অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো আবার, একটা ভয়ংকর আমোদের লোভে মাতাল হ'য়ে উঠলো যেন, কিন্তু সেই হাসির শব্দ ছাপিয়ে মিলির তীক্ষ্ণ স্বর আকাশে গিয়ে বিঁধলো—'দাদা, তপুদিকে ছেড়ে দাও, তপুদিকে ছেড়ে দাও, সে কিছু করেনি। কে চুরি করেছে আমি জানি, বাড়ি গিয়ে তোমাকে বলবো—কিন্তু তপুদিকে তোমরা ছেড়ে দাও, তপুদিকে তোমরা ছেড়ে দাও!' ভিড়ের লোকেরা চেঁচিয়ে উঠলো—'কে করেছে জানতে চাই! অপরাধীর শাস্তি না-দেখে আমরা এখান থেকে যাবো না।' একটুক্ষণ নিথর স্তব্ধতা নামলো, অবিরল লালা ঝরলো মনোতোষের মুখ থেকে, তার দাঁতে দাঁত ঘষার আওয়াজ আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। হঠাৎ মিলি চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি—আমি চুরি করেছিলাম! বাবার পকেট থেকে টাকা নিয়েছিলাম নীলুকে দেবার জন্য। কিন্তু নীলু তা নেয়নি!' 'ও, তাহ'লে তুমি আছো এর পিছনে!' মণ্টু জলন্ত চোখে আমার দিকে তাকালো। 'বলো, মিলি কি সত্য বলেছে?' আমার শরীর হিম হ'য়ে গেলো, রক্ত যেন বরফ হ'য়ে গেছে, তাপসীর হাতটি নিজের হাতে মুচড়ে-মুচড়ে আমি চেষ্টা করলাম একটু উষ্ণতা আনতে শরীরে, চেষ্টা করলাম বলতে—'আমি—

আমি চুরি করেছি! আমি!' বলার চেষ্টায় বুক ফেটে যেতে লাগলো আমার, তবু আওয়াজ বেরোয় না—আবার, আবার জোর করতে গিয়ে শুধু একটা গাঁ-গাঁ বোবা আওয়াজ বেরোলো, আর নিজের গলার সেই বিকট শব্দে আমি ধড়মড় ক'রে হঠাৎ জেগে উঠলাম।

ঘামে ভিজে গেছে আমার শরীর, পা কাঁপছে, মেদ্দিচিদের জীবনীটি উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে বুকের উপর। ছেলেবয়সে ঐ একটা রোগ ছিলো আমার—যাকে বলে বোবায় ধরা। বই বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে প্রায়ই হ'তো ও-রকম, বিশ্রী স্বপ্ন দেখে জেগে উঠতে বড়ো কষ্ট হ'তো। কী চেষ্টা জেগে ওঠার জন্য, কী পরিশ্রম, এক-একদিন মনে হ'তো ঘুমের মধ্যে ম'রে যেতেও পারি। কিন্তু সেদিনকার মতো কুৎসিত আর ভয়াবহ স্বপ্ন আর কখনো দেখেছিলাম ব'লে মনে পড়ে না;—সত্যি বলতে, আর-কোনো স্বপ্ন আমার মনেও নেই।

জেগে উঠেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না স্বপ্নের মায়াজাল থেকে সত্যি বেরোতে পেরেছি। উব-হাঁটু হ'য়ে উঠে বসলাম খাটের উপর, বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ছায়া লম্বা হয়েছে, মিষ্টি হাওয়া আমাকে আদর ক'রে গেলো, কিন্তু তবু যেন একটা চীৎকার শুনে চলেছি—শ্লেষ্মাজড়িত গলার কোনো জবরদস্তি। একটু পরে বুঝলাম, এটা আর স্বপ্ন নয়, পাশের ঘরে কে যেন বেশ চড়া গলায় কথা বলছে। কুঞ্জবাবুর গলা মনে হচ্ছে না?

'রাজি হ'য়ে যান মাঐমা'—আমার কানে এলো—'এ-রকম ভালো সম্বন্ধ চট ক'রে আর পাবেন না ব'লে দিচ্ছি। ঘর ভালো, লক্ষ্মীমন্ত সংসার, মাসে কম-সে-কম চারশো টাকা রোজগার করেন মুরারিবাবু।...অ্যা, কী বলছেন?'

আমার মা নিচু গলায় কী বললেন আমি শুনতে পেলাম না।

'ঐ এক কথা আপনার—বয়স বেশি! দোজবর! বয়স বেশি মানে কি আর সাতাশি! এই টায়ে-টুয়ে চল্লিশ হয়েছে। চল্লিশ আবার কিছু

বয়স নাকি পুরুষমানুষের—বিলেতে ও-বয়সে লোকেরা বিয়েই করে না! চমৎকার স্বাস্থ্য, একটু টাক না-থাকলে দেখে কেউ পঁয়তিরিশের বেশি একদিনও ভাবতো না। এদিকে মা-লক্ষ্মী তপুও তো তেরো বছরের খুকুটি নয়—হেঁ-হেঁ। বছর-বছর তারও তো বয়স বেড়েই চলেছে। আর দোজবর তো হয়েছে কী বলুন তো—এক হিশেবে দোজবরই তো ভালো। একটু মান্য-মাননা করবে বৌকে, বছরে দু-খানা গয়না দেবে, একটা কড়া কথা বলবার আগে দু-বার ভাববে। তা-ই না? বুঝে দেখুন আমার কথাটা। ঐ তো আমার ভাগনি টেঁপিটাকে দোজবরে দিয়েছিলুম, তার মা-র আপনারই মতো খুঁতখুঁতানি ছিলো—কিন্তু এখন দেখছি স্বামীর সোহাগে বছর-বছর মোটা হচ্ছে, তার বিয়ের সময়কার অনন্ত এখন আর হাতে লাগে না। একঘর ছেলেপুলেও নেই মুরারিবাবুর—মাত্র দুটি খোকা-খুকু, তা তপুর তো সেবাযত্ন ক'রে অভ্যেসই আছে, কোনো অসুবিধে হবে না। বি. এল. পাশ না-হ'লে কী হবে, নারানগঞ্জের উকিলদের মধ্যে বেশ নাম আছে মুরারিবাবুর, নিজে একটি বাড়ি করেছেন, মাঝে-মাঝে ঢাকাতেও আসেন কেস চালাতে, তখন আমার সঙ্গে দেখা হয়। এখন কথাটা হচ্ছে...'

এখানে আবার মা কিছু বললেন, আমি তা শুনতে পেলাম না।

'তা আপনাদের ইচ্ছে,' কুঞ্জবাবুর শ্লেষ্মায়-ভরা ভাঙা গলা আবার একটানা ব'য়ে চললো। 'আপনারাই অভিভাবক, আমি তো আর জোর করতে পারি না। কিন্তু মাঐমা—মা মরলে বাপ তালুই তা তো জানেন—রাধাকান্তবাবু মুখে যা-ই বলুন তপুর বিয়েতে কত আর টাকা দেবেন তিনি—বড়ো জোর ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে দু-এক হাজার ছুঁড়ে দেবেন, সে আপনার দানসামগ্রী কিনতে আর লোকজন খাওয়াতেই বেরিয়ে যাবে। দুঃখী মেয়ে, ওর কপালে এর চাইতে কত আর ভালো জুটবে আপনিই ভেবে দেখুন। মুরারিবাবুর দাবি-দাওয়া কিছু নেই; মেয়েকে আপনারা শুধু তুলে দেবেন, দু-চারখানা শাড়ি-গয়না দিতে চান তো ভালো, নয়তো শাঁখাতে-সিঁদুরে বিয়ে দিলেও বরের আপত্তি নেই। তবে হ্যাঁ—একটা কথা, বেশি দেরি করা চলবে না,

সামনের আষাঢ়েই বিয়ে হওয়া চাই। কথাটা হচ্ছে, দেশে তো মেয়ের কোনো অকুলোন নেই হেঁ-হেঁ, আর মা-লক্ষ্মী তপুর গায়ের রংটিও চাপা ফুলের মতো নয়। কাজেই—বোঝেন তো সব। আমি কিচ্ছু লুকোইনি, মেয়ের রং উজ্জ্বল শ্যামলই বলেছি, বয়স একটু কমিয়ে আঠারো বলেছি—তা আঠারো আর উনিশ-কুড়িতে তফাৎটা, কী বলে গিয়ে, চোখে মালুম হয় না—মুরারিবাবু আমার কথা শুনেই রাজি হ'য়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর একটি আব্দার, একবার তিনি মেয়েটিকে নিজের চোখে দেখতে চান। তা আজকাল তো বরের নিজে এসে দেখারই চল হয়েছে—এতে আর আপত্তির কথা ওঠে কিসে। এখন আপনারা মেয়ে-দেখার জন্যে একটা দিন-টিন ব'লে দিলেই তাঁকে জানাতে পারি আমি—আজ সন্ধেবেলা তিনি আসছেন আমার দোকানে, রাত ন-টার গাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন নারায়নগঞ্জে।...কী, অন্তত একবার মেয়েকে দেখাতেও আপনার আপত্তি নাকি?'

আমার স্বপ্নে-শোনা কথাগুলোর অদ্ভুত প্রতিধ্বনি আমি শুনতে পেলাম যেন, মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিলো দুঃস্বপ্নটাই চলছে এখনো—আর-এক ধাক্কা জেগে উঠে আমি দেখবো, সব ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে। কিন্তু না—কুঞ্জবাবু মানুষটি অত্যন্তই বাস্তব। বেঁটে লোকটি, ছোটো-ক'রে-ছাঁটা তেল-চুপচুপে চুল মাথায়, একজোড়া পুষ্ট গোঁফ মুখের শোভা বাড়াচ্ছে। কী সূত্রে তিনি আমাদের 'আত্মীয়', বা কোন সুবাদে তিনি আমার মা-কে মাঐমা ব'লে ডাকেন, আমি তার কিছুই জানি না, কোনো কৌতূহলও বোধ করিনি জানার জন্য। কিন্তু ঢাকায় এসে অবধিই দেখছি, মাঝে-মাঝে তিনি আসেন আমাদের এখানে, সকলের খোঁজ-খবর নেন, ছোটোখাটো কাজও ক'রে দেন মা-র জন্য। কারো অসুখ করলে ডাক্তারের খবর দেন; অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ তিন রকমই তাঁর চেনা আছে; বাড়িতে আসন্নপ্রসবা কেউ থাকলে ধাত্রী ইত্যাদি ঠিক ক'রে দেন তিনি; কোনো বিয়ে হ'লে নিজের ঘাড়ে টেনে নেন সব ব্যবস্থা করার দায়িত্ব—এবং কোনো পাত্র বা পাত্রীর প্রয়োজন থাকলে তারও খোঁজের অকুলোন হয় না

তাঁর ঝুলিতে। যাকে বলে একেবারে পাকাপোক্ত কাজের মানুষ ; দোকানে যে-ভাবে গেঞ্জি-গায়ে একটি চেয়ারে ব'সে-ব'সে তিনি চাকর খাটান, খদ্দের খুশি রাখেন আবার হিশেবপত্রও মেলান তাতেই তাঁর কর্মিষ্ঠতার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। জনসন রোডের উপর পরোটা-মাংসের দোকান তাঁর, উল্টো দিকে সারি-সারি আদালত, পাশে সিনেমা ; দিনের বেলা মামলাবাজ আর সন্ধের পরে ছাত্রদের ভিড় লেগেই আছে—আমিও মাঝে-মাঝে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে যাই ওখানে। তাঁর দোকানে কোনো সাইনবোর্ড নেই, দরকার হয় না—ঢাকাই পরোটা যেমন বিখ্যাত তেমনি কুঞ্জবাবুর পরোটার দোকানটিও শহরের লোক একডাকে চেনে—আগে বেঞ্চিতে বসতে হ'তো খদ্দেরদের, এখন টিনের চেয়ার আর অয়েল-ক্লথে ঢাকা টেবিলে রীতিমতো 'রেস্টুরেণ্ট' সাজানো হয়েছে।—এই কুঞ্জবাবুর সঙ্গেই তাপসী বরিশাল থেকে এসেছিলো।

ভদ্রলোককে আমি কোনোদিনই প্রীতির চোখে দেখতে পারিনি। তিনি যে আমার বা বাড়ির কারো কোনো ক্ষতি করেছেন তা নয়, বরং চোখে দেখছি তিনি উপকার করতেই সচেষ্ট, আমি তাঁর দোকানে কখনো খেতে গেলে প্রচুর আপ্যায়নও করেন। কিন্তু তবু আমার তাঁকে ভালো লাগে না, মনে হয় আমার মা তাঁকে বড্ড বেশি আমল দেন, তাঁর ঐ একঘেয়ে ভাঙা-ভাঙা গলা—যা একবার কথা আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না—তা শুনলেই কেমন রাগ হ'তে থাকে আমার, লোকটাকে মনে হয় ইতরতার একটা তেল-চিটচিটে নমুনা। দোকানে কোনো চাকরকে বাপ তুলে গাল দিতে শুনেছি তাঁকে, আবার পরমুহূর্তে খদ্দেরের কাছে এসে হেঁ হেঁ ক'রে হাত কচলে কথা বলেছেন ; শুনেছি দু-পয়সা গাড়িভাড়া কমাবার জন্য দশ মিনিট ধ'রে চ্যাচামেচি করতে।—কিন্তু সেদিন, সেদিন তাঁর কথা শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছিলো ছুটে গিয়ে টুঁটি চেপে ধ'রে তাঁকে ঠাণ্ডা ক'রে দিই।

আমি উঠে পাশের ঘরে গেলাম, কুঞ্জবাবু আমাকে দেখামাত্র একগাল হেসে বললেন, 'এই যে ভায়া, তোমার যে দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল। দোকানেও আসো না বড়ো-একটা?'—কিন্তু তাঁর কথার কোনো জবাব

না-দিয়ে মা-র সামনে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, 'মা, চা দাও। এক্ষুনি বেরোবো।'

পাখা হাতে নিয়ে একটা মোড়ায় ব'সে ছিলেন মা। একটু অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'তপুকে বল।'

'না, তুমি ওঠো। এক্ষুনি চা চাই আমার।···ওঠো না!'

'ছেলেকে আপনি এত আদর দেন, মাঐমা!' মন্তব্য করলেন কুঞ্জবাবু। 'তা ছেলেও যুগ্যি হয়েছে—কী নাকি একটা এমন লিখেছো যে ভাইস-চান্সলার সুদ্ধ অবাক হ'য়ে গেছে, হেঁ-হেঁ?'

এমন বিতৃষ্ণা হ'লো কথা শুনে যে ছিটকে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ভিতরের দিকে বারান্দায় এসে দেখি তাপসী সেখানে চুপচাপ ব'সে আছে।

'তাপসী, এখানে কী করছো?'

'তুমি কোত্থেকে?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখেছি। এখন চা চাই।'

'রাখু উনুন ধরাচ্ছে, এক্ষুনি ক'রে দেবো।'

'মা-র উপর খুব রাগ হচ্ছে আমার।'

'কেন?'

'ওখানে ব'সে-ব'সে ঐ লোকটার কথা শুনছেন কেন? চ'লে এলেই পারেন।'

'কোন লোকটা?'

'ঐ যে—কুঞ্জবাবু।'

'আর-একটু ভদ্রভাবে কথা বললে কী হয়?'

'রেখে দাও ভদ্রতা,' আমি তার পাশে শানের উপর ব'সে পড়লাম। 'তাপসী, তুমি কিছু শুনেছো?'

'কী—?'

'ঐ লোকটার কথাবার্তা কিছু?'

তাপসী জবাব দিলো না।

'তার মানে—শুনেছো!'

আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে তাপসী বললে, 'এ-সব বাজে কথায় তুমি কান দাও কেন?'

'বাজে কথা! বাজে কথা কেন?...আমি অবশ্য কোনো খবরই রাখি না, না, কিন্তু আজ হঠাৎ আমার কানে এসেছে—ভাগ্যিশ এসেছে! ঐ কুঞ্জবাবু লোকটাকে আমি দেখে নেবো!'

তাপসী হেসে ফেললো, আর তার হাসি দেখে আমার রাগের মাত্রা আরো চ'ড়ে গেলো।

'কেন? কুঞ্জবাবু বেচারা কী-দোষ করলেন?'

'তাপসী! আমি ভেবে পাই না তুমি হাসতে পারো কেমন ক'রে!'

'কোনো কারণে তুমি নিজের উপরেই রেগে আছো, নীলু, তাই কিছুই ভালো লাগছে না। ঐ মনোতোষ এসেই তোমার মেজাজটা আজ খারাপ ক'রে দিয়ে গেছে।'

মনোতোষকে মনে প'ড়ে আমি বিষণ্ণ হ'য়ে গেলাম। সেও আর-এক টুকরো বাস্তব, অতি কঠিন বাস্তব। এটা কেন হয় যে ভালোর চাইতে খারাপটাকে বেশি বাস্তব ব'লে মনে হয় আমাদের? কেন মনে হয়, মিলি একদিন মেঘের মতো দিগন্তের আড়ালে মিলিয়ে যেতে পারে, তাপসীর উপরে নেমে আসতে পারে যবনিকা, কিন্তু ঐ কুঞ্জবাবু আর মনোতোষ যেন শাশ্বত, সব সময় থাকবে তারা, পদে-পদে তাদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে না-দিয়ে এক পা চলবার উপায় নেই?

আমি ব্যাকুলভাবে ব'লে উঠলাম, 'তাপসী, একটা কথা জিগেস করতে চাই তোমাকে, তুমি ঠিক তার জবাব দেবে তো?'

'রাখু, চায়ের জল চাপিয়েছো?' বলতে-বলতে মা বেরিয়ে এলেন। আর তাপসী—'আমি চা ক'রে আনছি—' এই ব'লে রান্নাঘরে অন্তর্হিত হ'লো।

সাড়ে-ছ'টা পর্যন্ত ঘরে ব'সে ছটফট ক'রে কাটালাম। আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই, এই সময়টা ঘরের মধ্যে বড়ো বিমর্ষ। তেলের লণ্ঠন দিয়ে

যায় ঘরে-ঘরে, তার আলো উজ্জ্বল হ'তে বেশ সময় লাগে, ভনভন করে মশা, নিবস্ত আকাশ যেন মফস্বলের সব মলিনতা ঘরের মধ্যে উপুড় ক'রে ঢেলে দেয়। ঘর থেকে বেরোলেই অবশ্য অনেক ভালো, সেখানে প্রকৃতির স্নিগ্ধতা আছে, কিন্তু সেদিন আমি ইচ্ছে ক'রেই ঘরে ব'সে আছি—খারাপ যখন লাগছেই তখন আরো খারাপ লাগুক, কত খারাপ লাগতে পারে, দেখি!

ধূপদানি হাতে ক'রে তাপসী ঘরে এলো। ছিবড়ের ফাঁকে-ফাঁকে জলজ্বল করছে আগুন, পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে সুগন্ধি ধোঁয়া উঠছে। আমাকে দেখে বললে, 'বেরোও ঘর থেকে। জানলা-দরজা বন্ধ ক'রে ধোঁয়া দেবো। মশা ম'রে যাবে।'

'আমি বেরোবো না।'

'বেরোবে না? এই ধোঁয়ার মধ্যে ব'সে থাকবে?'

'তা-ই থাকবো।'

'কী অদ্ভুত ছেলে বাপু! বাইরে একটু পাইচারিও তো করতে পারো।'

'তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'হ্যাঁ—চলো, এবার যাই মিলির কাছে। এক্ষুনি হ'য়ে যাবে আমার। আপাতত একটু বাইরে যাও, লক্ষ্মী তো।'

'আমাকে "লক্ষ্মী" বলবে না!'

'এক-এক সময় বড়োদেরও "লক্ষ্মী" বলা যায়।—আমি কিন্তু সারা ঘরে ধোঁয়া দেবো এবার। তোমার কষ্ট হবে।'

'তোমারও তো হবে।'

পর-পর কয়েকবার ধূপদানিতে ফুঁ দিলে তাপসী, লাল আভা প'ড়ে তার মুখটি দেখালো প্রতিমার মুখের মতো, ছিবড়ে আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ঘন ধোঁয়ায় ঘর ভ'রে দিলে। জানলা দুটো বন্ধ ক'রে দিয়ে তাপসী বললে, 'তুমি আগে বেরোও, আমিও আসছি।'

মিনিট পাঁচেক পরেই আমরা বাড়ির বাইরে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার

ছিলো, কিন্তু বাইরে এখনো গাছের মাথায় তীরের মতো আলো বিঁধে আছে। হঠাৎ আমার মনে হ'লো, স্বপ্নে যেমন মিলি আর আমি হাঁটছিলাম এও যেন সেই রকম।

মধুবাবুর মাঠ পেরিয়ে আমি কথা বললাম—'তুমি আর আমি এই প্রথম রাস্তায় বেরোলাম, তাপসী।'

'সেটা আর এমন আশ্চর্য কথা কী।'

'এমনও তো হ'তে পারতো যে কখনোই আমরা একসঙ্গে বেরোলাম না। ...তাপসী, তুমি একেবারেই বাড়ি থেকে বেরোও না—তা-ই না?'

'বাঃ, ঢাকার দ্রষ্টব্য সবই তো দেখেছি। ঢাকেশ্বরী বাড়ি, রমনার কালীবাড়ি, গোলাপ-বাগিচা, লোহার পুল—'

'যত বাজে—! আমাদের ইউনিভার্সিটির দিকে যাওনি কখনো—গিয়েছো?'

'রমনার কালীবাড়ি যেতে পথে পড়ে তো।'

'সে আর কতটুকু! একদিন যাবে আমার সঙ্গে? গান-বাজনা নাটক হয় মাঝে-মাঝে—না কি তোমার ও-সব ভালো লাগে না?'

'নিশ্চয়ই লাগে! মিলির সঙ্গে চ'লে যাবো একদিন।'

'আমার সঙ্গে যাবে না?' কথাটা আমার ঠোঁটে উঠে এলো, কিন্তু কী মনে ক'রে সেটা চেপে গিয়ে বললাম, 'মিলি যায় ওর মা-বাবার সঙ্গে—তুমিও তা-ই যেয়ো, গাড়ি ক'রে যান ওঁরা। তা-ই ভালো হবে। কিন্তু—আমি আর-একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কী, বলো!'

'তুমি তো আই. এ. পাশ করেছো, ভরতি হ'য়ে যাও না কেন ইউনিভার্সিটিতে?'

'আমি?' তাপসী নরম গলায় হেসে উঠলো। 'রক্ষে করো—এক বছর পরে তুমি মাস্টার হ'য়ে আমাকে পড়াবে, ও আমার সহ্য হবে না।'

একটা অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস পড়লো আমার। তাই তো, আর এক বছর মাত্র ইউনিভার্সিটির জীবন, এক বছর মাত্র। কে জানে তারপর কোথায় থাকবো,

কে জানে আর কতদিন হাঁটবো এই সব রাস্তা দিয়ে। নিজের অজান্তে চলার বেগ শ্লথ ক'রে দিলাম।

'তাপসী—তোমাকে কয়েক বছর আগে বরিশালে দেখেছিলাম, কিন্তু স্পষ্ট মনে পড়ে না কেন?'

'আমার কিন্তু তোমাকে বেশ মনে পড়ে। অনেক ছেলেমানুষ ছিলে তখন।'

'বোকা ছিলাম, বলো! তখনকার আমাকে ভেবে আমার বড্ড হাসি পায় আজকাল। আচ্ছা—ঐ যে কোঁকড়া চুলের বড়ো-বড়ো চোখের ভদ্রলোকটি—তিনি তোমার বাবা?'

'হ্যাঁ, তিনিই। মিলিদের বাড়িটা কোন দিকে?'

'এই—আরো একটু। তাপসী, তোমার বাবা তোমাকে চিঠি লেখেন কখনো?'

'বা রে, চিঠি লেখার কী হয়েছে? ভুল হ'য়ে গেলো—মিলির জন্যে কিছু নিয়ে আসবো ভেবেছিলাম।'

'তাপসী, তোমার বরিশালের জীবন আমার জানতে ইচ্ছে করে। কী করতে সারাদিন? কলেজে যেতে?'

'যেতাম।'

'গাড়িতে, না হেঁটে?'

'গাড়িতেই যেতে হ'তো। বেশ দূরে তো কলেজ।'

'ঘোড়ার গাড়িতে?'

'তা বইকি। বাস্ তো ছিলো না।'

'তারপর—বাড়ি এসে?'

'তার কি কিছু ঠিক আছে নাকি? না কি প্রতিদিনের কথা কারো মনে থাকে?'

'হেঁটে বেড়াতে মাঝে-মাঝে?'

'তা যেতাম বইকি কখনো-কখনো দল বেঁধে।'

'দল বেঁধে ? অনেক বন্ধু ছিলো বুঝি তোমার ?'

'বন্ধু—তা ছিলো, আর বাড়িতে আমরা বোনেরাই তো ছ-জন। তুমি তো দেখেছো তাদের।'

'তা দেখেছি। তোমার—বোন তারা ? কিন্তু তোমার তো আর ভাই-বোন নেই। তুমি তো একা।'

'কী বোকার মতো কথা! জ্যাঠতুতো ভাই-বোন আছে না ?'

'তাও বটে। তা তোমার নিজের যে আর ভাই-বোন নেই তাতে আমার খুব ভালো লাগছে।...জ্যোছনা-রাতে বেড়াতে ?'

'তাও বেড়িয়েছি দু-একদিন।'

'কী সুন্দর, না ? জ্যোছনা-রাতে ছ-টি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ছ-জনের ছয় রঙের শাড়ি, কিন্তু জ্যোছনায় কোনো রংই ঠিক চেনা যাচ্ছে না, কারো মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না—শুধু চলার ভঙ্গি দিয়ে বোঝা যাচ্ছে কে কোন জন। ...ওদের ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়নি তোমার ?'

'তা হয়নি!'

'তবে আসতে রাজি হ'লে কেন ?'

'যাঁরা আমার জন্য সব সময় ভাবেন তাঁরা যা ঠিক করেন, আমি জানি তা-ই আমার পক্ষে ভালো।'

'তা-ই তোমার পক্ষে ভালো ? তুমি জানো ? কী ক'রে জানো ?'

'এখানে এসে আমার কত লাভ হ'লো, দ্যাখো! মিলির সঙ্গে চেনা হ'লো, তোমার সঙ্গে চেনা হ'লো—তোমার মা-র কথা কিছু না-ই বললাম।'

'আচ্ছা তাপসী, এমন তো কখনো-কখনো হ'তো যে তোমার বোনেরা কাছাকাছি কেউ নেই, কাজও কিছু নেই হাতে, একা ব'সে আছো ঘরের মধ্যে, কলেজের পড়ায় মন লাগছে না—এ-রকম কি হ'তো না মাঝে-মাঝে ?'

'ও-রকম কার বা না হয়।'

'তখন তুমি কী ভাবতে? কী ভাবো তুমি এখন, যখন কাছাকাছি লোক থাকে না, সব কাজ শেষ হ'য়ে গেছে? আজ বিকেলে ঐ বারান্দায় যখন তোমাকে দেখলাম, কী ভাবছিলে?'

'আজ বিকেলে মিলির কথা ভাবছিলাম। একটু তাড়াতাড়ি চলো—আমি আবার বেশিক্ষণ বসতে পারবো না।...এই লাল বাড়িটাই মিলিদের? "গগন-কুটির" লেখা দেখছি।'

দোতলা থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে মিলি দৌড়ে নিচে নেমে এলো। আমরা বাড়ির মধ্যে পা দেবার আগেই ধ'রে ফেললো আমাদের, তাপসীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে, গালে চুমু খেয়ে, তার কাঁধে মাথা রেখে বললে, 'তপুদি! এতদিনে! ভীষণ রাগ করেছি। আর ভীষণ খুশি হয়েছি। কথা বলবো না—কিন্তু অনেক কথা আছে। চলো, উপরে চলো, সোজা উপরে! আমার সর্দি সেরে গেছে, জানো—কিন্তু আজ রাত্রেও খিচুড়ি খাবো। খিচুড়ি আমি খুব ভালোবাসি—তোমাকেও খেয়ে যেতে হবে আমার সঙ্গে। না—আগে চা খাও। কাল শুয়ে-শুয়ে খুব মজার একটা বই পড়লাম—মার্ক টোয়েনের। উঃ—হাসতে-হাসতে সর্দিই সেরে গেলো। নীলুর উপরেও খুব রাগ করেছিলাম আজ সকালে আসেনি ব'লে—রোজ দু-বেলাই তো আসা উচিত অসুখ করলে, উচিত না?—কিন্তু এখন আর রাগ নেই, মনোতোষবাবু দুপুরে বললেন নীলাঞ্জনবাবু খুব পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত, তোমার এক ঝুড়ি প্রশংসা করলেন মনোতোষবাবু—তা বাপু পড়াশুনোটাই কি জীবনের সব—কিন্তু এখন নীলু তপুদিকে নিয়ে এসেছে—তাই এখন আর রাগ নেই। তা দ্যাখো কাণ্ড, তোমাদের বসতেও বলছি না এখনো—না, না, এখানে নয়, চলো, উপরে চলো—আমার ঘরে গিয়ে বসবে—এই যে, এদিকে সিঁড়ি!' হেসে, হাঁপিয়ে, হাত নেড়ে, ঘাড় দুলিয়ে, হালকা শরীরটিকে নানাদিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, এক দমকে এতগুলো কথা ব'লে ফেললো মিলি। অতি সুন্দর একটি সজীব ছবির মতো তাকে দেখলাম আমি, ছিপছিপে, করুণ, সুকুমার, লম্বা গ্রীবার উপর ছোটো মাথাটি

কী মধুর ক'রে বসানো, ঠোঁটের রেখাটি কী স্পষ্ট, ভেজা-ভেজা, কমনীয়—সব মিলিয়ে এমন কিছু যা চোখে দেখলেই ভালোবাসতে হয়। তাপসী তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—'পাগলি মেয়ে! কেমন আছিস বল তো!'

'বাঃ, বললাম যে সর্দি সেরে গেছে!' সিঁড়ি দিয়ে আগে উঠতে-উঠতে, অথচ ঐ ভাবেই তাপসীর এক হাত ধ'রে রেখে সে বলতে লাগলো—'মা গরম সর্ষের তেল মালিশ ক'রে দিলেন পায়ে, বাবা ডাক্তারখানা থেকে একটা ওষুধও এনে দিলেন—নাকে টানার ওষুধ—বিশ্রী!—কিন্তু মার্ক টোয়েনের গল্পটা চমৎকার। বইটা আমাদের কলেজের লাইব্রেরিতেই ছিলো, কাজেই নীলু যে বলো ইডেন কলেজে শুধু বাজে বই থাকে, তা কিন্তু ঠিক না।···মা, ও মা, কোথায় তুমি? এই ছাখো কে এসেছে!'

আমার হিশেবে ভুল হয়নি; মণ্টু বা মনোতোষ কেউই তখন বাড়ি ছিলো না। গিরিজাবাবু তাঁর আপিশ-ঘরে ব'সে রায় লিখছিলেন, সারা দোতলা মিলির অধিকারে; প্রথমে সে আমাদের এনে বারান্দায় বসালে, তারপর তার ঘরে এনে তার বিছানার উপর, তারপর মেঝেতে পাটি পেতে আমাদের নিয়ে লুডো খেলতে ব'সে গেলো; তার মা মোটা মানুষ, মেয়ের তালে-তালে ছুটোছুটি ক'রে হাঁপিয়ে পড়লেন। চা এলো, সঙ্গে হাণ্টলি-পামারের বিস্কুট আর কলকাতা থেকে আনানো পাঁপর-ভাজা; মিলি দু-দান লুডো খেলার পর ক্লান্ত হ'য়ে তাপসীর কোলে মাথা রেখে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লো, ঝরনার মতো তার কথা আর ফুরোয় না। সারাটা দিন বিশ্রী কাটিয়ে অবশেষে কিছুক্ষণ আমার আনন্দে কাটলো। মিলিকে আর তাপসীকে একসঙ্গে দেখে, আর তাদের মধ্যে এই ভালোবাসার প্রবাহ দেখে, এক আশ্চর্য শান্তি অনুভব করলাম মনের মধ্যে—আর যেন আমার কোনো ভাবনা নেই সব বিপদের বাইরে চ'লে এসেছি।

তারপর এমন একটা সময় এলো যখন তাপসীকে যাওয়ার কথা তুলতে হ'লো।

—'সে কী! এখনই যাবে? আমার সঙ্গে খিচুড়ি খাবে না, তপুদি? মা-কে ব'লে দিলাম যে! বড়ো-বড়ো পেঁয়াজ, গরম আলুভাজা, ডিমের বড়া—ভালোবাসো না তুমি?'

'আজ একটু তাড়া আছে, মিলি। আর-একদিন এসে খাবো।'

'আবার কবে আসবে! আর যদি বা আসো, আমার তো সর্দি হবে না শিগগির। আর সর্দি না-হ'লে খিচুড়ি কি আর তত ভালো লাগবে!'

'লাগবে না কেন? এই তো বর্ষা আসছে—বাদলার রাতে খিচুড়ি খেতে যা মজা! আর চাইকি আমি হয়তো সর্দি বাধিয়ে আসবো সেই সময়ে।'

'এই খ্যাখো—ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমারই সর্দি হয়েছে, আর কারো তা হয়নি। সর্দির মুখে আমার যা ভালো লাগবে অন্যেরও যে তা-ই লাগবে তার তো মানে নেই। এইজন্যেই তো মা বলেন আমার বুদ্ধি কম। সত্যি নাকি তপুদি, বুদ্ধি কি অন্যদের চেয়ে কম আমার?—কিন্তু কেন জিগেস করছি, তুমি আমাকে ভালোবাসো, তুমি তো আমার কোনো দোষই দেখবে না। কেন আমাকে এত ভালোবাসো, তপুদি?' মিলি আবার দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো তাপসীকে। 'তাহ'লে যাবেই? কত কাজ করো তুমি বাড়িতে, তোমাকে আটকাবো না। কিন্তু নীলু—তুমি থাকো, এখনই যেয়ো না।'

'তাপসী একা যাবে কী ক'রে—'

'না, না, একা যাবে কেন—আমি রামহরিকে দিয়ে দিচ্ছি সঙ্গে। মা, ও মা—'

'না, না, কিচ্ছু দরকার নেই। আমিই যাচ্ছি।'

'কেন, তুমি থাকো না,' তাপসী আমার দিকে তাকালো।

ঘড়িতে দেখলাম পৌনে আটটা, যে-কোনো মুহূর্তে মণ্টু বা মনোতোষ ফিরে আসতে পারে। এ-মুহূর্তে ওদের কারো সঙ্গেই দেখা করতে চাই না আমি। আমার মুখ দিয়ে বেরোলো—'আমাকে যেতেই হবে।'

'যেতেই হবে কেন?'

মিলির এই প্রশ্নের সামনে আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। 'যেতেই হবে—মানে, কাজ আছে, জরুরি কাজ। কাল আমি আবার আসবো—এখন যাই, মিলি? মার্ক টোয়েনের আরো বই নিয়ে আসবো তোমার জন্য।'

এর পরে মিলি আর পিড়াপিড়ি করলে না, কিন্তু হঠাৎ একটু ম্লান দেখালো তাকে, একটু অসুস্থ। তার মা তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে নিচে এলেন। ঠিক তখনই ফটক খুলে মণ্টু আর মনোতোষ বাড়িতে ঢুকলো।

'এই যে—'

'এই যে—'

'কখন এসেছিলে?'

'এই তো খানিকক্ষণ।'

'যাচ্ছো?'

'চলি আজ।'

'আপনি এলেন—আমাদের সঙ্গে দেখা হ'লো না,' মণ্টু ভদ্রতা ক'রে তাপসীর সামনে দাঁড়ালো একটু। মনোতোষ একটিও কথা বললো না, কিন্তু অন্ধকারে তার জ্বলজ্বলে দৃষ্টি আমি অনুভব করলাম।

রাস্তায় বেরিয়ে আমি বললাম, 'ওদের সঙ্গে দেখা হোক তা আমি একেবারেই চাইনি।'

'কিন্তু তবু তোমার থাকা উচিত ছিলো।'

তারপর সারা পথ তাপসী আর একটিও কথা বললে না। আমি দু-একবার চেষ্টা ক'রে নিরাশ হলাম। গভীর কোনো ভাবনায় যেন ডুবে আছে সে, যেন কাছে থেকেও অনেক দূরে চ'লে গেছে। যতক্ষণ রাস্তায় আলো ছিলো আমি আড়চোখে তার মুখের ভাবটি প'ড়ে নেবার চেষ্টা করলাম —কিন্তু কিছুই বোঝা গেলো না। তারপর অন্ধকার রাস্তা, গৌর বসাকের আমবাগানের পাশে নিবিড় অন্ধকার, মধুবাবুর মাঠে আলেয়ার মতো জোনাকি জ্বলছে। স্তব্ধতায়, অন্ধকারে, প্রতি মুহূর্তে তাপসীর অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন

থেকে, পথটুকু পার হ'য়ে বাড়ি এলাম। একটি কথাও আর বলা হ'লো না। অথচ দু-একটা জরুরি কথা আছে তার সঙ্গে আমার, খুবই জরুরি, কিন্তু এর পর দিনের পর দিন আমি যেন আর দেখাই পেলাম না তাপসীর। সে বাড়ির মধ্যে কখন কোথায় থাকে, কী করে—কিছুই বুঝতে পারি না। তাকে দেখতে পাই শুধু মিলি এলে, মিলি যতক্ষণ থাকে শুধু ততক্ষণই তাকে দেখতে পাই।

আজ রবিবার, স্থন্দর রোদ্দুরের দিন ছিলো। শাদার উপর শাদা, বিস্তীর্ণ বরফের উপর ঠাণ্ডা আর ধবধবে রোদ, আশে-পাশে এক্‌ফোঁটা সবুজ নেই, তাকিয়ে থাকলে চোখ ঝলসে যায়, মনে হয় যেন বোদলেয়ারের স্বপ্নে-দেখা সেই প্যারিস, স্তব্ধ, কঠিন, উদ্ভিদহীন, ধাতু আর পাথরে গড়া এক মায়াপুরী। সকালে অনেকদিন পর 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' খুলে বসেছিলাম—ঐ একটি বই, যা সঙ্গে রাখতে কখনো ভুলি না—সেই আশ্চর্য কবিতাটি আবার পড়লাম, যাতে অতীতের বছরগুলি ফ্যাশন-হারা পোশাকে সারি-সারি দাঁড়িয়ে আছে, আর গভীর জল থেকে মাথা তুলছে মনস্তাপ—'দন্তময় মনস্তাপ'। এই প্যারিসেই ছিলেন তিনি, একশো বছর আগে, শস্তা হোটেল থেকে হোটেলে ফিরেছেন ফেরারি আসামির মতো, তাঁর সময়ে যে-সব নতুন রাস্তা খোলা হয়েছিলো তা-ই দিয়ে আজ আমার নিত্য চলাফেরা। আমি হঠাৎ এক অশান্তি অনুভব করলাম রক্তের মধ্যে, বেরিয়ে পড়লাম পথে—শুধু ঘুরে বেড়াতে, প্যারিসের স্বচ্ছ কনকনে হাওয়ায়, রৌদ্র আর বরফের অবিরল ধবলতার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে। মুহূর্তের জন্য আমার মনে হ'লো আমি নতুন প্যারিসে এসেছি।

ঘুরতে-ঘুরতে রদাঁ ম্যুজিয়মে গিয়েছিলাম। একেবারে যে দৈবাৎ আমার পা সেদিকে চলেছিলো তাও বলা যায় না ; বোদলেয়ার থেকে রদাঁর কাছে সহজেই পৌছনো যায়। একটা মূর্তি বিশেষভাবে দেখতে চেয়েছিলাম, শিল্পী যার নাম দিয়েছিলেন 'চিরন্তনী প্রতিমা'। এক যুগল আছে সেই মূর্তিতে, প্রেমের বাঁধনে বাঁধা-পড়া এক যুগল। কিন্তু মু[illegible] চার-পাঁচবার পরিক্রম ক'রেও সেই মূর্তিটিকে খুঁজে পেলাম না। আমার ভুল হ'য়ে থাকবে, অন্য কোথাও দেখেছিলাম হয়তো—কিন্তু এখন আবার দেখতে চাই, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে। অগত্যা তার একটা ছাপা ছবি কিনে বেরিয়ে এলাম।

এখন সন্ধে আটটা হবে—এক ঘণ্টা আগে একেবারে ডিনার সেরে বাড়ি ফিরেছি। শীতে আর স্মৃতিতে ভরা এক দীর্ঘ রাত্রি প'ড়ে আছে আমার সামনে। টেবিলে আছে কন্যাকের বোতল আর গ্লাশ, আর ঐ ছবিটাকে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। 'চিরন্তনী প্রতিমা'...

এই খাতায় যা লিখেছি এতক্ষণ ধ'রে তা পড়ছিলাম—প'ড়ে তৃপ্তি পেলাম না। যা হয়েছিলো সে-রকম লাগছে না মোটেও; মনে হচ্ছে যেন বানানো লেখা, প্রায় উপন্যাস, প্রায় বাংলা মাসিকপত্রে ছাপাবার যোগ্য। আর অত সব কথাবার্তা উদ্ভাবন করার মতো দুর্বুদ্ধি আমি কোথায় পেলাম? আমার কি মনে আছে তাপসীকে আমি কী বলেছিলাম আর সে কী জবাব দিয়েছিলো আমাকে? আর মিলির মুখের ঐ কথাগুলো—কেমন বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে, কিন্তু হয়তো সেদিন তার সর্দিই হয়নি আর খিচুড়ি দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতো না তা-ই বা কে জানে। মনোতোষ একদিন সকালে এসে হাজার বাজে কথা ব'লে আমাকে বিরক্ত করেছিলো এটুকু আমার মনে আছে, কিন্তু ঠিক কী বলেছিলো তা কে জানে। আর যেদিন সকালে সে এসেছিলো ঠিক সেদিনই সন্ধেবেলা কি তাপসীকে নিয়ে মিলির ওখানে গিয়েছিলাম?... কিন্তু কী এসে যায়, এই সব খুঁটিনাটি কৃপণ তথ্যে কী এসে যায়। এসো তাহ'লে, ইতিহাসকে ধ্বংস করা যাক, পাথরের স্তূপ থেকে রদাঁর মূর্তির মতো তথ্যের পাহাড় ভেঙে কবিতা উঠে আসুক—ক্ষীণ, অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, কিন্তু সত্যবাদী। কী ক'রে জানবো যে এই পঁচিশ বছর পরে, ঘটনাস্থল থেকে বহু দূরে ব'সে, আমি মনে-মনে যা রচনা ক'রে নিচ্ছি সেটাই সত্য নয়...অন্তত, আমার কাছে সত্য? পূর্ণ সত্য মানুষের জন্য নয়, তা ঈশ্বরের; মানুষ শুধু পারে এক-এক জনে এক-এক সত্যের অধিকারী হ'তে; ঠিক কী হয়েছিলো, তা ঈশ্বর ছাড়া কেউ জানে না; আমরা কে কী রকম বা কে কোনজন তাও শুধু ঈশ্বরই জানেন। আমরা যা পারি তা শুধু বানিয়ে তুলতে, নিজেকে নিজের মতো ক'রে বানিয়ে তুলতে, অন্যদের নিজের মতো ক'রে বানিয়ে তুলতে, যা সত্যি ঘটেছিলো তাকেও নিজের মতো ক'রে বানিয়ে তুলতে। যদি তাপসী এখনো বেঁচে থাকে

আর সেও এই কাহিনীটাকে লিখে ফ্যালে, তাহ'লে আমার লেখাটার সঙ্গে কতটুকু মিলবে তার ?

ছবিটির দিকে যতবার আমার চোখ পড়ছে ততবার নতুন ক'রে অবাক হচ্ছি। আমার বিস্ময় অসীমে পৌছয় যখন ভাবি পুরুষ তার বাহু দুটিকে পিছনে রেখেছে, আড়াল ক'রে, লুকিয়ে, সন্তর্পণে, যেন নিজেরই বাসনা থেকে লুকিয়ে, যৌবনের তাপে বলীয়ান তার বাহু দুটি অক্ষমভাবে ঝুলে আছে তার পিছনে, একটি আর-একটিকে স্পর্শ ক'রে…যে-ভাবে আমাদের দেশে কয়েদিকে পিঠমোড়া ক'রে হাত বেঁধে নিয়ে যায়, প্রায় সেই রকম অসহায় ভঙ্গিতে। তার 'প্রতিমা'কে বাহুবন্ধে বাঁধবার মতো সহজ আর-কিছুই ছিলো না তার পক্ষে—কিন্তু এই-যে আলিঙ্গন থেকে বিরত হওয়া, এটাই মহত্তম আলিঙ্গন। স্থূল আলিঙ্গনে ঐ পুরুষের কোনো প্রয়োজন নেই ; দয়িতার বুকের মধ্যে ঐ যে তার মাথাটি বিন্যস্ত, সেই মৃদুতম, লঘুতম সংস্পর্শেই দুই সত্তা এক হ'য়ে গেছে ; তার আত্মার সব গোপন রহস্য ঝ'রে পড়ছে প্রেয়সীর বুকে, প্রেয়সীর হৃৎস্পন্দন কান পেতে শুনছে সে—আর এমনি ক'রে তারা সঞ্চারিত হ'য়ে যাচ্ছে পরস্পরের মধ্যে—মনে নয়, জ্ঞানে নয়, মাংসে, পেশীতে, স্নায়ুতন্ত্রে, রক্তের অণুতে-অণুতে। দু-জন দু-জনকে বলছে : 'তুমি আছো, তোমার মধ্যে আমি আছি !' একই ভূমি, একই শিলাখণ্ড থেকে উদ্ভিন্ন হয়েছে দু-জনে—নিথর, বোবা জড়কে বিদীর্ণ ক'রে মন্দিরের মতো প্রাণের এই উত্থান !—কিন্তু নারীর আসন আরো উঁচুতে, সে যেন প্রাণলোকের ঊর্ধ্বতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত, প্রায় দেবীর মতো সে, দেবীপ্রতিমা ;—আর পুরুষটির একটি পা এখনো জড়ের মধ্যে প্রোথিত হ'য়ে আছে, যেন নাস্তি থেকে সদ্য জেগে উঠছে সে, তার কাঁধ, পিঠ, চুল আর গালের রেখায় লিপ্ত হ'য়ে আছে এক আধো-ঘুমন্ত শিথিলতা—তার করুণ মাথাটিতে এখনো জাগিতের ঔদ্ধত্য প্রবেশ করেনি। কী দুঃসহ বিনয় পুরুষটির সর্বাঙ্গে, স্বীকারোক্তির দারুণ আত্ম-সমর্পণ, ক্ষমাপ্রার্থনার শান্ত নিশ্বাসে তার প্রতি অঙ্গ কথা ক'য়ে উঠলো। 'আমাকে ক্ষমা করো !' আর নারীটি, আরো উঁচুতে, সে হাত দিয়ে নিজের

একটি চরণ স্পর্শ ক'রে আছে, দেহটি একটু পিছনে ঠেলে মাথাটিকে এগিয়ে দিয়েছে সামনে, প্রেমিকের মাথার উপরে তার মুখটিকে একটুখানি নিচু ক'রে যেন আশীর্বাদ করছে তাকে, যেন বলতে চায়: 'জেগে ওঠো, বাঁচো, ভয় পেয়ো না।' দু-জনেই নতজানু, দু-জনেই স্পর্শ ক'রে আছে নিজেকে, আর সেই সঙ্গে পরস্পরকে; এই দ্বিগুণ সংস্পর্শের মায়াবৃত্তের মধ্যে তারা পার হ'য়ে গেছে মরত্ব, অনিশ্চয়তা, ভ্রান্তি।...কিন্তু কিসের জন্য এই ক্ষমাপ্রার্থনা? কী অপরাধ করেছিলো পুরুষটি? নারীকে তার প্রেমের জন্য কতদূর পর্যন্ত জ্ঞানী হ'তে হ'লো?...তা আমরা জানি না; জানবার কোনো দরকারও নেই; শুধু এইটুকু জেনে নিলাম যে অপরাধের পরে অমনি ক'রে ক্ষমা চেয়ে নিতে যারা পারে তারাই ধন্য, তারাই ভাগ্যবান।

হঠাৎ যেন বুঝতে পারছি কেন, শুধু ভাস্কর্যে নয়, চিত্রকলাতেও প্রেমিক-প্রেমিকার নগ্ন দেহ দেখানো হ'য়ে থাকে। সামাজিক প্রথার উপর, বাস্তব অভ্যাসের উপর, মানুষের মনের বিজয়ের একটা পতাকা ওটা। এই দু-জন মানুষের—সারা পৃথিবীর মধ্যে এই দু-জন মানুষের—পরস্পরের কাছে কিছুই লুকোবার নেই, অর্থাৎ তারা পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ নগ্ন—নগ্ন আর পবিত্র আর বিপদের অতীত। যারা নিজের শেষ সত্তাসার অন্যজনকে দিতে পেরেছে, তাদের আমরা কেমন ক'রে কল্পনা করতে পারি দেশে-কালে সীমিত কোনো বেশবাসে?—তারা তো আর ফরাশি বা ভারতীয় বা গুপ্ত যুগের বা বিশ শতকের নেই, পরস্পরের কাছে মুহূর্তের চিরন্তনতা পেয়েছে তারা, যেমন ক'রে ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি তারা পরস্পরের কাছে। ছবিটার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমি অভিভূত হ'য়ে পড়ছি; ঐ দু-জন যে পরস্পরের বিষয়ে সব জেনেও পরস্পরকে ভালোবাসছে, এ-কথা ভেবে মাথা নত হ'য়ে আসছে আমার। এর চেয়ে ভক্তির যোগ্য, এর চেয়ে ঈর্ষার যোগ্য আর কী আছে?

আমার উপর মনোতোষের সেই আক্রমণের পর অনেকদিন কেটে গেছে। অনেক মানে—হয়তো দশ, হয়তো বা আটদিন মাত্র; কিন্তু দিনগুলিকে দীর্ঘ

মনে হচ্ছে আমার, কেননা এর মধ্যে একবারও তাপসীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইনি। মা-র মুখে কথাপ্রসঙ্গে জেনেছি যে মনোতোষ এর মধ্যে দু-দিন এসে গেছে ;—আমি বাড়ি ছিলাম না একদিনও, সময় কাটাবার জন্য প্রায়ই ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুলে ব'সে থাকি। বিকেলের দিকে মিলি আসে যথারীতি, আমিও যথারীতি সন্ধের পর তাকে বাড়ি পৌঁছে দিই—এক-একদিন সকালে গিয়েও কাটিয়ে আসি কিছুক্ষণ, বাইরে থেকে দেখতে গেলে সবই ঠিকমতো চলছে। এদিকে বর্ষাও এসে পড়লো—আমার প্রিয় ঋতু—কিন্তু আকাশে মেঘের আর মাঠে-মাঠে ঘাসের ঐশ্বর্য আমাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারছে না।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিলো সেদিন। বেলা দুটো হবে তখন ; ঘরে ব'সে ভাবছি বৃষ্টি থামার জন্য আরো কি অপেক্ষা করবো, না বৃষ্টিতেই বেরিয়ে পড়বো লাইব্রেরির দিকে। এমন সময়, হাতে ছাতা, গায়ে রঙিন রেনকোট, মিলি এসে আমার ঘরে এসে ঢুকলো।

আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। 'মিলি! তুমি! এই বৃষ্টিতে।'

দেহটি একটু পিছনে হেলিয়ে গা থেকে রেনকোট খুললো। ঠোঁট দুটি ঈষৎ খোলা, ঈষৎ অগোছালো চুলে জলের ফোঁটা চিকচিক করছে। অবর্ণনীয় তার ভঙ্গি, তার রূপ।

আমি আবার বললাম, 'হঠাৎ এই সময়ে? হাঁপিয়ে পড়েছো, মনে হচ্ছে। কী ব্যাপার?'

আমার খাটের উপর ব'সে প'ড়ে বললো, 'আমাকে আসতেই হ'লো, নীলু।'

'বাড়িতে না-ব'লে আসোনি তো?' হঠাৎ কী-রকম একটা সন্দেহ উঁকি দিলো আমার মনে।

'মা ঘুমোচ্ছেন ; ভজুয়াকে ব'লে এসেছি।'

'ভজুয়াকে ব'লে এসেছো? মণ্টু কোথায়?'

'জানি না কোথায়। মণ্টুর সঙ্গে আমি আর কথা বলবো না।

জীবনেও—জীবনেও না!' ভুরু কুঁচকে গেলো মিলির, মুখে ভারি হ'য়ে ছায়া নামলো; আমার মনে হ'লো এক্ষুনি কোনো বিস্ফোরণ ঘটবে তার বুকের মধ্যে।

'মিলি, তোমার শাড়ি ভিজে গেছে—অসুখ করে যদি?—'

'কিচ্ছু হবে না,' আমাকে বাধা দিলো হাত তুলে। 'শোনো—আমি বেশিক্ষণ বসতে পারবো না—সময় নেই আমার—'

'অন্তত জুতোটা খুলে ফ্যালো।' আমি নিচু হ'য়ে তার পা থেকে জুতো খুলে দিলাম, হাত দিয়ে দেখলাম পা ঠাণ্ডা। 'মিলি—তুমি খাটে পা তুলে বোসো, একটা কিছু চাপা দাও পায়ে, আমি এক ছুটে চাদর নিয়ে আসছি—'

আমার জামার খুঁট ধ'রে টেনে বললে, 'যেয়ো না—শোনো!'

আমি তার সামনে দাঁড়ালাম, সে ভরা চোখে আমার দিকে তাকালো।

'নীলু, দাদা আমাকে মনোতোষের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়!' একটা আর্তস্বর বেরোলো তার গলা দিয়ে। 'আমাকে বলে, "নীলুর সঙ্গে কক্ষনো তোমার বিয়ে হবে না!" এদিকে মনোতোষ আমাকে চুপি-চুপি ব'লে গেছে—"তোমার নিজের যা ইচ্ছে তা-ই হোক, মিলি—অন্তত আমি কখনো তাতে বাধা দেবো না। মণ্টুর সঙ্গে এ-বিষয়ে আমি একেবারেই একমত নই।"—ঘেন্না, ঐ দুটোকেই ঘেন্না লাগে আমার! নীলু, কি উপায় হবে আমার?'

খবরটা আমার কাছে নতুন নয়, অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু সে-মুহূর্তে মিলির মুখে এমন বেদনা ফুটে উঠলো, এমন অসহায় কারুণ্য, যে আমি অস্থির হ'য়ে একবার তার বাঁ দিকে, আর-একবার তার ডান দিকে ব'সে প'ড়ে, তক্ষুনি আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—'মিলি, কিচ্ছু ভেবো না।...এ কিছু না, এ-সব বাজে।...মণ্টুর সাধ্য কী যে—আর মনোতোষ নিজে তো বলেছে—কোনো ভাবনা নেই, আমি মণ্টুর সঙ্গে কথা বলবো—তোমার মা-র সঙ্গে, তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলবো—সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

'মনোতোষের কথায় বিশ্বাস কী। ও তো আমাদের মতো নয়—ও ধূর্ত,

প্যাঁচালো—আমার মনে হয় ও সব পারে, ওর চোখের দৃষ্টিটা বিশ্রী, ও কাছে এলে আমার বমি পায়।'

'যত আজে-বাজে কথা ভাবতে পারো তুমি! চোখের দৃষ্টি বিশ্রী হবে কেন—কেমন ভদ্রলোক, চমৎকার ব্যবহার জানে।'

'না, না, বিশ্রী—ওর মুখ যে-কথা বলে ওর চোখ সে-কথা বলে না। ও যেন একসঙ্গে চার-পাঁচটা মানুষ—ওকে আমার ভয় করে। নীলু—'

'আঃ, মিলি—অমন অস্থির হোয়ো না। একটু শান্ত হও, আমার কথা শোনো—এই তো, আর ক-দিন পরেই কলেজ-টলেজ সব খুলে যাবে, তখন তো ওরা ফিরে যাবে কলকাতায়—আর তখন দেখবে এ-সব কিছুই মনে থাকবে না।'

'না—না—তুমি বুঝছো না—দাদা চেষ্টা করছে এই ক-দিনের মধ্যেই কিছু-একটা ঘনিয়ে তুলতে—কাল সকালে আপিশ-ঘরে ব'সে বাবাকে কী-সব বলছিলো অনেকক্ষণ ধ'রে। বাবা আবার ওর কথায় বড্ড কান দেন। ছেলেবেলায় হুতোমগঞ্জের কথা মনে আছে তোমার?—বাড়িতে আমার আদর বেশি ছিলো ব'লে ও কী-রকম হিংসে করতো আমাকে; এখন বড়ো হ'য়ে, বাবার কথামতো এঞ্জিনিয়ারিং প'ড়ে বাবাকে খুশি ক'রে, বাবার কথামতো ছোটো ক'রে চুল ছেঁটে, সিগারেট না-খেয়ে (আসলে লুকিয়ে-লুকিয়ে খায়), এখন তার শোধ তুলছে আমার উপর। বাড়িতে আমাকে কী-রকম নির্যাতন করে, জানো না।'

'নির্যাতন করে? তোমাকে?'

'হ্যাঁ—আমাকে একা পেলেই ঠাট্টা করে তোমাকে নিয়ে, টিটকিরি দেয়—তুমি নাকি মদ খাও, রাত একটায় বাড়ি ফেরো, ইউনিভার্সিটির মেয়েরা তোমার সঙ্গে কেউ কথা বলে না—পরীক্ষার খাতায় কী-একটা কুৎসিত কথা লিখেছিলে ব'লে তোমাকে নাকি এক্সপেল করার কথা হয়েছিলো—আমাকে কুৎসিত বই পড়তে দাও, আমি তোমার সঙ্গে মিশে-মিশে খারাপ হ'য়ে যাচ্ছি—আর এও বলে যে একদিন তোমাকে এমন মার দেবে যে ছ-মাস বিছানা ছেড়ে

উঠতে পারবে না। আমি রেগে যাই, আমি কেঁদে ফেলি, তাতে আরো মজা পায় শয়তানটা ; আমি মা-র কাছে নালিশ করলে তক্ষুনি এক গাল হেসে বলে—"বা রে! আমি ঠাট্টা করেছি ওকে—ঠাট্টাও বোঝে না, ছেলেমানুষ!" —এতদিন তোমাকে বলিনি কিছু—কিন্তু—কিন্তু—আর সহ্য হয় না আমার, ও আমার দাদা হোক বা যা-ই হোক, একদিন পায়ের জুতো খুলে মারবো ওকে—ফের যদি তোমার নিন্দে করতে আসে, যে-মুখ দিয়ে কথা বলবে সেই মুখে আমি জুতোর বাড়ি মারবোই—এই তোমাকে ব'লে দিলাম!'

জোরে-জোরে নিশ্বাস নিলো মিলি, মুখটি লাল হ'য়ে উঠলো, শাদা গলার উপরে একটি নীল শিরা স্পন্দিত হ'লো। তার মুখ থেকে চোখ না-সরিয়ে বললাম, 'এ-সব কী ভয়ানক কথা বলছো তুমি—জুতো খুলে মারবে কেন মণ্টুকে—না, কক্ষনো মারবে না—প্রতিজ্ঞা করো আমার কাছে—ও তোমার ভাই—তোমাকে ভালোবাসে—না, মিলি, এ-সব কিছু না, কিছুই না! মণ্টু যা বলে বলুক, ও-সব মুখের কথাই, কিছুই করতে পারবে না তোমাকে। তুমি আর আমি যদি নিজেদের মনে ঠিক থাকি তাহ'লে কেউ কিছু করতে পারবে না আমাদের। তা বোঝো তো?'

'নিশ্চয়ই!—কিন্তু তুমি ভুল করছো, নীলু; মণ্টু আমাকে একটুও ভালোবাসে না—তাহ'লে কি অমন ক'রে কষ্ট দিতো আমাকে—আর তোমার এ-কথাও ঠিক নয় যে ও-সব শুধু ওর মুখের কথাই। ও পারে—অনেক-কিছু পারে—ওর গায়েও খুব জোর—নীলু, সাবধানে থেকো, আমাকে বাঁচাও, আমাকে ভালোবাসো, তোমার কাছে এলে কেউ আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। তাই তো আজ এসেছি তোমার কাছে। কিন্তু—কিন্তু—'

'কিন্তু? কী ভাবছো তুমি, মিলি?'

'—আবার তো আমাকে সেই বাড়িতেই ফিরতে হবে? মণ্টু আর মনোতোষ যে-বাড়িতে আছে সেই বাড়িতেই?'

হঠাৎ কেমন একটা ভয়ে আমি কেঁপে উঠলাম।—'মিলি, ঐ বাড়ি মনোতোষের নয়, আর মণ্টুর যতখানি তোমারও ততখানি।'

'না, মণ্টু ছেলে, তারই বাড়ি, আর তাই তো সে আমার উপর কর্তামি করার সাহস পায়! আমার বিয়ে হ'লেই আমি তো অন্য বাড়ির—আমার নিজের কোনো বাড়ি তো এখন নেই।'

তার মুখে এই সাংসারিক বুদ্ধির কথা শুনে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। 'আর জানো—' তক্ষুনি আবার কথা বললো সে—'বিয়ে হওয়া আর না-হওয়ায় অনেক তফাৎ। তুমি খুব আপন হ'তে পারো, রোজই আসো যাও, মা তোমাকে "ঘরের ছেলে" বলেন, "আমাদের নীলু" বলেন—কিন্তু ও-সব শুধু কথাই! আসলে তুমি ও-বাড়ির কেউ নও, দাদার বন্ধু ব'লে মনোতোষও বেশি হ'তে পারে সেখানে। কিন্তু বিয়ে হ'য়ে যাক—তক্ষুনি সব বদলে যাবে। শুধু মা-বাবার কাছেই নয়—তোমার আমার মধ্যেই বদলে যাবে, নীলু, তুমি আর আমিও সত্যি এক হবো তখন—কেউ আর আমাদের ছাড়াতে পারবে না।'

মিলির এই কথাটা কোথায় যেন আঘাত করলো আমাকে। এখন ভেবে আমার মনে হচ্ছে—মিলি তখনই হয়তো সত্যটাকে অনুমান করেছিলো, হয়তো দেখতে পেয়েছিলো আমার প্রতারণা, তাকে যতটা ছেলেমানুষ ব'লে ভেবেছি তা হয়তো ছিলো না সে। আমার মুখের ভাবান্তর লক্ষ ক'রে বললে, 'তুমি কিছু বলছো না?'

'ঠিক—সবই তুমি ঠিক বলছো, মিলি। আর তুমি যা বলছো তা-ই তো হবে—বেশি দেরিও নেই তার—আর একটা বছর, কয়েকটা মাস।'

'না,' শান্ত গলায় মিলি বললে, 'তুমি আর দেরি কোরো না, তুমি এখনই বিয়ে করো।'

'এখনই? তা কী ক'রে হয়—মিলি—আমি তো প্রস্তুত হইনি এখনো—আমি এখনো ছাত্র—নিজে উপার্জন করি না—'

'উপার্জন করো না তো কী এসে যায়? তোমরা তো সবাই আছো এ-বাড়িতে—আমার জন্যে খুব কি বেশি খরচ হবে?'

'মিলি, আমাকে সত্যি ক'রে বলো—তুমি কি ভয় পাচ্ছো? ওরা জোর

ক'রে তোমাকে কিছু করতে পারে, এই কি তোমার ভয়? তোমার কি নিজের উপরে আস্থা নেই?'

'আমার নিজের উপরে আস্থা নেই? হা ঈশ্বর!' দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো মিলি।

তার কান্নার সামনে আমার শরীরের হাড়গুলো যেন গ'লে গেলো, কী করবো কিছুই ভেবে পেলাম না—মাথার চুল টানতে-টানতে ঘরের মধ্যে পাইচারি ক'রে বললাম, 'মিলি—তুমি কেঁদো না; তোমার পায়ে পড়ি, কেঁদো না। তুমি যা বলছো তা-ই হবে, তুমি যা বলবে তা-ই করবো আমি—আমার মণি, আমার সোনা—মিলি—'

আমি হাত বাড়িয়ে তার দিকে ছুটে গেলাম, কিন্তু সে মুখ থেকে হাত সরালো না, ফুলে-ফুলে আরো বেশি কাঁদতে লাগলো। তার অনেকদিনের জমিয়ে-রাখা কোনো কান্না এই সুযোগে বেরিয়ে এলো যেন।

'মিলি—আমাকে ক্ষমা করো—আমি কী বলতে চেয়েছি তুমি বোঝোনি—শোনো আমার কথা—তাকাও—আমিও মনে-মনে ভাবছিলাম—' কিন্তু কথা শেষ না-ক'রে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। একেবারে কোণের দিকের ছোটো একটা ঘরে তাপসীকে পাওয়া গেলো। মা-র ঠাকুর-ঘরের সমান সেই ঘরটা, তাপসী থাকে সেটাতে, কিন্তু অতিথির ভিড় হ'লে তাকে ছেড়ে দিতে হয়।

মেঝেতে মাদুর পেতে ব'সে পাড়ার একটি ছোটো ছেলেকে সুর ক'রে রামায়ণ প'ড়ে শোনাচ্ছিলো। আমার পায়ের শব্দে চমকে তাকিয়ে বললে, 'নীলু, কী হয়েছে?'

'শিগগির এসো একবার!'

'কী—কী হয়েছে?'

'মিলি—ভীষণ কাঁদছে। তুমি এসো।'

তাপসী নিঃশব্দে আমার দিকে তাকালো; সেই তার একটি দৃষ্টি ভুলতে পারিনি। আমার ঘরে এসে দেখলাম, মিলি সেই একই ভাবে ব'সে আছে।

'নীলু, তুমি চ'লে যাও, আমি দেখছি।' ব'লে তাপসী মিলির পাশে ব'সে তার পিঠে হাত রাখলো। আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম, সোজা চ'লে গেলাম লাইব্রেরিতে, কিন্তু বই জিনিশটাকে এমন নির্বোধ মনে হ'লো যে তক্ষুনি ছিটকে বেরিয়ে পড়লাম আবার, রমনার মাঠে-মাঠে অনর্থক ঘুরে বেড়ালাম যতক্ষণ-না সন্ধে হ'লো।

রাত ক'রে, ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ি এলাম। চোরের মতো পা টিপে-টিপে, যেন কোনো অপরাধ করেছি, কিংবা বাড়িতে কঠিন রোগী কেউ আছে। মা-র ঘরের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে কুঞ্জবাবুর তেল-চুপচুপে মাথাটা আমার চোখে পড়লো। আমাকে দেখে মা উঠে এলেন, আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘরে এসে বললেন, 'মনোতোষ এসে তোর জন্য অনেকক্ষণ ব'সে ছিলো।'

'কে?'

'মণ্টুর বন্ধু মনোতোষ।'

'আমার কাছে এসেছিলো?'

'তোর জন্যে ব'সে ছিলো অনেকক্ষণ। কাল সকাল ন-টায় আবার আসবে। তোকে বাড়ি থাকতে ব'লে গেছে।'

'কখন এসেছিলো মনোতোষ?'

'তপু গিয়েছিলো মিলিকে পৌঁছে দিতে, আবার তপুকে পৌঁছে দিতে মনোতোষ এলো। তুই তখন মিলিকে ফেলে বেরিয়ে গিয়েছিলি যে?'

'ওকে একা ফেলে যাইনি, তাপসী ওর কাছে ছিলো।—আর তাপসীকেই ওর বেশি দরকার ছিলো তখন।'

মা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'মিলি কাঁদছিলো কেন?'

'মা, আমি সব কথা বলবো তোমাকে,' আমি আবেগভরে ব'লে উঠলাম, 'কিন্তু এখন না। আর কয়েকটা দিন যেতে দাও। কিন্তু তুমি—তুমি একটা কথা বলো আমাকে : ঐ কুঞ্জবাবুটা বার-বার আসে কেন?'

'কুঞ্জবাবু? উনি তো এমনিই আসেন সব সময়—আর একজন গুরুজন-স্থানীয় ভদ্রলোক বিষয়ে ও-রকমভাবে কথা বলা কি তোর উচিত?'

'মা, আমি কিছু-কিছু কথা শুনেছি,' মা-র শেষের কথাটা উপেক্ষা ক'রে গেলাম আমি। 'সত্যি কি ঐ নারানগঞ্জের উকিলের সঙ্গে তোমরা বিয়ে দেবে তাপসীর ?'

মা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এমনি চেষ্টা করতে-করতেই হ'য়ে যাবে একদিন। বিয়ে তো দিতেই হবে।'

'উকিল নাকি মেয়ে দেখতে চায় ?'

'তোর অমত তাতে ?'

'আমার মতামতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু যার বিয়ে দিতে চলেছো তাকে তো জিগেস করবে একবার ?'

'তার অমত নেই।'

'অমত নেই! কিন্তু তার মনের কথা জানবার কোনো চেষ্টা করেছো কি তোমরা ? সে তো একটা মানুষ—না কী ?'

আমার উত্তেজনা দেখে মা একটু অবাক হলেন, মনে হ'লো। আমার কথার জবাব না-দিয়ে বললেন, 'এদিকে আমার মিলির জন্যে ভাবনা হচ্ছে। নীলু, তুই বড়ো হয়েছিস, তুই বুদ্ধিমান ছেলে, আমি আর কী বলবো।'

'তুমি বলছো কী, মা ? তুমি কি ভাবছো মিলিকে আমি কাঁদিয়েছি ?'

'তা ভাবছি না, তবে—' হঠাৎ থেমে গিয়ে মা বললেন, 'মনোতোষ কেমন ছেলে রে ?'

'আমি কী ক'রে জানবো!'

'ওর সঙ্গে মেলামেশা ক'রে কেমন মনে হয় তোর ?'

'প্রথম কথা, আমি ওর সঙ্গে মিশি না; আর তারপর, অল্পদিন মিশে কতটুকুই বা বোঝা যায়।'

'হুঁ,' মা গম্ভীর হলেন। 'আমি যাই, তোর চা পাঠিয়ে দিই। কী কাদা মাখিয়েছিস কাপড়ে—ইশ্!'

পাঁচ মিনিট পরে তাপসী ঘরে এলো চা আর কিছু খাবার নিয়ে। চায়ের

জন্য তৃষিত ছিলাম, কিন্তু পেয়ালায় চুমুক দেবার আগে তাপসীর দিকে একবার তাকালাম আমি।

'তুমি কি এখনই চ'লে যাবে, না একটু বসবে?'

'কেন বলো তো?'

'কেন, বোঝো না? আমার খুব ইচ্ছে তুমি একটু বোসো এখানে। কিছু বলতে চাই তোমাকে। কিছু শুনতে চাই। অনেক, অনেক দিন ধ'রে বলার চেষ্টা করছি। কিন্তু তুমি আমাকে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াও আজকাল।'

'চা খাও। তারপর কাপড়-জামা বদলে ফেলো। আমি তোমাকে তখন বেরোতে বলেছিলাম ব'লে কি সারাদিন বাইরে ভিজতে বলেছিলাম?'

'তাপসী, বাজে কথার সময় নেই। তুমি কি কয়েক মিনিট সময় দিতে পারবে আমাকে—সত্যি মন দিয়ে শুনবে দু-একটা কথা? আগে বলো—মিলি শান্ত হয়েছিলো? বিশ্বাস করেছে তোমার কথায়?'

'মিলিকে শান্ত করার ভার নিতে হয় আমাকে, এটা কি একটু অদ্ভুত মনে হয় না তোমার?' তাপসীর চোখে নতুন একটা আলো ঝলক দিলো। 'তার বিশ্বাস—অবিশ্বাস—সবই তোমার কাছে। তা-ই নয়?'

'কিন্তু—আমি অক্ষম,' আমার গলা ভেঙে গেলো কথাটা বলতে।

'ভুল! ভুল তোমার, নীলু। অক্ষম নও তুমি, তুমি রিক্ত নও, মিলির যা-কিছু প্রয়োজন সব তোমার আছে। শুধু জেগে ওঠো, শুধু মনোযোগ দাও—অমন ক'রে গা এলিয়ে দিয়ো না।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না, তাপসী,' এই মিথ্যে কথাটা ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করলাম।

'মিলি ঠিক বলেছে—আমিও তা-ই বলি! বিয়েতে আর দেরি কোরো না। আসলে কোনো বাধা নেই, দুই বাড়ি প্রস্তুত হ'য়ে আছে, তুমি যদি এখনই মুখ দিয়ে কথাটা বের করো তাহ'লে মণ্টুর সাধ্য নেই কিছু করতে পারে। কেন মিছিমিছি ওদের সুযোগ দিচ্ছো মিলিকে কষ্ট দেবার?'

'পড়াশুনো শেষ না-ক'রেই বিয়ে?'

'না-ই বা শেষ করলে পড়াশুনো। এম. এ. ডিগ্রিটা কি এতই বড়ো জিনিশ? যে-কোনো চাকরি নিয়ে নাও না এখনই, না-হয় কিছুদিন কষ্টেই চলবে—জীবনের চেয়ে বড়ো কি আর-কিছু?'

'জীবন…?' আমি আবছা ক'রে হাসলাম। 'নিজেকে একজন বিবাহিত পুরুষ ব'লে ঠিক কল্পনা করতে পারছি না এখনো।'

'কাপুরুষ!'

তাপসীর কথাটা বিঁধলো আমাকে। কেমন কোণ-ঠাসা মরীয়া হ'য়ে ব'লে উঠলাম, 'কিন্তু তুমিই বা এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছো কেন আমাকে হাত থেকে ঝেড়ে ফেলতে?'

'কী বললে? হাত থেকে ঝেড়ে ফেলতে?' বিস্ময় ও বেদনা একসঙ্গে এমনভাবে ফুটে উঠলো তাপসীর মুখে যে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করলাম আমি কী বলেছি। খানিকক্ষণ আমার মুখে কোনো কথা সরলো না; হাত বাড়িয়ে ঠাণ্ডা-হওয়া চায়ের পেয়ালাটা তিন চুমুকে শেষ ক'রে ফেললাম।

কয়েক মিনিট স্তব্ধতায় কেটে গেলো। আমার খাটের উপর দুপুরে যেখানে মিলি বসেছিলো, সেখানেই তাপসী বসেছে এখন, তার দুটি বাহু কোমরের কাছে ভাঁজ-করা, মাথাটি একটু সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, পিঠের রেখায় একটি স্থির সংকল্পের ভঙ্গি যেন। কিন্তু আমি তার দিকে তাকাচ্ছি না; তাকে পেরিয়ে বাইরে অন্ধকারে চোখ মেলে দিয়েছি, কানে শুনছি গাছের পাতায় টপটপ বৃষ্টির শব্দ।

তারপর খুব নিচু গলায় আমি আরম্ভ করলাম, 'কিন্তু, তাপসী, আমি তোমাকে অন্য একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম। মিলির কথা, মানে, আমার নিজের কথা এখন থাক—সে পরে হবে। দুটো বিষয় একসঙ্গে ভাবা যায় না।'

'আর-একটা বিষয় কী?'

'তোমার কথাই বলতে চেয়েছিলাম তোমাকে। তুমি নিশ্চয়ই জানো এ-বাড়িতে তোমার বিয়ের চেষ্টা চলছে?'

'জানি।'

'তোমার কিছু বলবার নেই এ-বিষয়ে?'

'আমার মত তোমাকে বলেছি তো।'

'যাঁরা তোমার জন্য সব সময় ভাবেন তাঁদের সিদ্ধান্তই মেনে নেবে তুমি?'

'এর উত্তর শুনতে চাও? হ্যাঁ, মেনে নেবো।'

'যদি নারানগঞ্জের উকিল হয়, যার বয়স চল্লিশ, মাথায় টাক, আর দুটি-মাত্র খোকাখুকু, তাহ'লে—'

'হ্যাঁ, তাহ'লেও মেনে নেবো।'

'আর তোমার ঐ ভাবী স্বামীটি যদি তোমাকে "দেখতে" আসেন,' তার অবিচলতায় আমি হিংস্র হ'য়ে উঠলাম, 'তাহ'লেও বোধহয় খোঁপা বেঁধে শাড়ি-গয়না প'রে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় এসে দাঁড়াবে—আর মাথা নিচু ক'রে, নখ খুঁটে, অতি নরম গলায় জবাব দেবে তার কথার?'

'হ্যাঁ, তা-ই করবো।'

'আর যদি—দোকানে জিনিশ কিনতে গিয়ে আমরা যেমন করি—তেমনি ক'রে সে যদি তোমাকে নেড়ে-চেড়ে উল্টে-পাল্টে ন্যাখে, আর দেখার পর এক থালা লুচি আর পটোলের দোলমা আর রসগোল্লা পান্তুয়ার সদগতি ক'রে ঢেঁকুর তুলে দাঁত খুঁচিয়ে পান চিবোতে-চিবোতে বাড়ি ফিরে যায়, আর ফিরে গিয়ে ব'লে পাঠায়—"নাঃ, পছন্দ হ'লো না—" তাহ'লেও বোধহয় মেনে নেবে তুমি?'

মুহূর্তের জন্য ঈষৎ পাংশু দেখালো তাপসীর মুখ, কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম যে আমার আক্রমণে ভীত হ'তে সে দেবে না নিজেকে, সমান-সমান লড়াই চালাবার মতো ক্ষমতা আছে তার।

'সবচেয়ে খারাপ যেটা হ'তে পারে সেটাই তুমি ছবি আঁকলে। কিন্তু ধ'রে নিচ্ছো কেন যে ঐ রকমই হবে। স্ত্রী হবার কোনো যোগ্যতাই কি আমার নেই?'

তার কথা শুনে আমার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো। ক্ষিপ্ত

হ'য়ে বললাম, 'ও! তাহ'লে ঐ উকিল ভদ্রলোকটি দয়া ক'রে রাজি হ'লেই তুমি ব'র্তে যাও? তুমি পা বাড়িয়েই আছো, উনি এখন কড়ে আঙুলটি নাড়লেই হয়!'

একটু লাল হ'য়ে উঠলো তাপসী, তক্ষুনি মুখে হাত ঘ'ষে সেই দুর্বলতাকে যেন মুছে ফেলার চেষ্টা করলো। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কোনটাতে তোমার আপত্তি? মুরারিবাবু আমাকে "দেখতে" আসতে চান, তাতে—না, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ায়?'

'তাপসী, তুমি জানো—না-জানলেও বুঝতে পারো যে আমাদের দেশের এই "মেয়ে দেখা"র প্রথাটাকে মনে-প্রাণে আমি ঘৃণা করি। নির্বোধ এটা, কুৎসিত এটা, সকলের পক্ষেই অসম্মানকর। বাল্যবিবাহের যুগে যা ঠিক ছিলো এখন তা কী-রকম কদর্য হ'য়ে গেছে এটা কেন বুঝতে পারে না কেউ? একজন উনিশ-কুড়ি বছরের মহিলাকে একজন ভদ্রলোক সেজে-গুজে বন্ধুবান্ধব নিয়ে "দেখতে" আসবেন—উঃ, কথাটা ভাবলেই আমার ইচ্ছে হয় বমি ক'রে ফেলি!'

'আমারও ভালো লাগে না ওটা। আগে বাড়ির মেয়েরা [illegible], বা প্রবীণ বাপ-জ্যাঠারা—সেটা ভালো ছিলো।'

'ও! তাহ'লে এই "মেয়ে দেখা" প্রথাটায় তোমার আপত্তি নেই? তুমি শুধু চাও ভাবী স্বামীটি নিজে আসবেন না?'

'তাতে অনেক তফাৎ হয় বইকি। আর জানো তো, হিন্দু বিয়েতে শুভদৃষ্টির আগে পরস্পরের মুখ দেখা বারণ? সেইজন্যেও, যিনি বিয়ে করতে চাচ্ছেন তাঁর নিজের আসা উচিত নয়। আর তাছাড়া, এই প্রথাটাই যদি তুলে দিতে চাও তাহ'লে দেশের মধ্যে বিয়েই বা হবে কেমন ক'রে?'

'অন্ত [illegible] উপায় খুঁজে বের করতে হবে।'

'কী উপায়? ব'লে দাও।'

'এই ধরো—মেয়েদের স্বাধীনতা আর কলেজে পড়াশুনো যত বাড়বে, ততই—'

'ও-সব নির্বিঘ্নে বেড়ে চলুক, কিন্তু তাতে তো কিছু সময় লাগবে? পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশো বছর? ততদিন কেউ বিয়ে না-করলে একশো বছর পর বিয়ে করবার মতো কেউ থাকবে না যে!'

ভীষণ রাগ হ'লো তাপসীর উপর; তার যুক্তির কোনো উত্তর আমার জোগালো না ব'লে আরো বেশি কুপিত হলাম। মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে ব'লে উঠলাম, 'যাক গে, মরুক গে এ-সব—সারা দেশের কথা ভাববার অনেক লোক আছে—আমার ভাবনা শুধু তোমাকে নিয়ে। শোনো, তাপসী—আমি চাই না যে কেউ তোমাকে "দেখতে" চাইলে তুমি রাজি হও, আমি চাই না যে নারানগঞ্জের ঐ লিকলিকে হাড়গিলের মতো উকিলকে তুমি বিয়ে করো।'

নিচু, নরম গলার একটা হাসির ঢেউ তাপসীর গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো। 'মা গো! কী রেগে আছো তুমি! কিন্তু তোমার রাগের যোগ্য পাত্র কি ঐ নারানগঞ্জের উকিল বেচারা, যাকে তুমি চোখে পর্যন্ত দ্যাখোনি, যে দেখতে "হাড়গিলের মতো" না কন্দর্পকান্তি তার তুমি কিছুই জানো না—না কি, কিছু না-জেনেও ও-রকম ক'রে বলা তোমার উচিত হচ্ছে? হয়তো তিনি লক্ষ-লক্ষ বাঙালির মতো একজন নিরীহ ভদ্রলোক মাত্র, হয়তো রীতিমতো ভালোমানুষ, হয়তো ছেলেমেয়ে দুটিকে প্রাণতুল্য ভালোবাসেন—'

'থামো, তাপসী—তোমার ও-সব বানানো কথা আমি শুনতে চাই না—উকিলটি তুমি যেমন বলছো তেমনি হ'তে পারেন—আরো অনেক কিছু হ'তে পারেন—কিন্তু আমি জানি তিনি তোমার পায়ের কড়ে আঙুলটির যোগ্য নন।'

'যোগ্য নন? বলছো কী তুমি!' আবার নিচু গলায় হেসে উঠলো তাপসী, মাথাটি পিছন দিকে হেলিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে হাসলো—যেন একটি চেপে-রাখা হাসির ঝড় ব'য়ে গেলো তার উপর দিয়ে। হাসি থামার পরেও তার মুখ থেকে কৌতুকের আভা মুছে গেলো না, আবার সামনের দিকে ঝুঁকে বললে, 'আমাকে তুমি ভাবো কী, বলো তো? কোনো

রাজকন্যা? কোনো উপন্যাসের নায়িকা? আমার যোগ্য পাত্রের সন্ধানে বুঝি দেশে-দেশে দূত পাঠাতে হবে?'

আমি গোমড়ামুখে জবাব দিলাম, 'তা তুমি যতই ঠাট্টা করো, আমার যা বিশ্বাস আমি তা-ই বলেছি—বলবোও!'

'তা এই উকিলটি না হোন,' যেন অনেকটা আপন মনে তাপসী বললে, 'তাঁরই কাছাকাছি অন্য কেউ হবেন। উনিশ-বিশের তফাতে কিছু এসে যায় না।'

'তা কেন?' আমি উৎসাহিত হ'য়ে উঠলাম, 'কত ভালো-ভালো ছেলে চেনা আছে আমার! যুবক, দেখতে ভালো, বিস্তর পড়াশুনো করেছে—'

'এতই? তা তারা রাজি হবে কেন আমাকে বিয়ে করতে?'

'কেন হবে না? আমি বুঝিয়ে বলবো—অন্য ধরনের ছেলে তারা—মানে, সত্যিকার আধুনিক—' ঐ বিশেষণটার দ্বারা কী বোঝাতে চাচ্ছিলাম কে জানে, কিন্তু বলতে-বলতে আমার চেনাশোনা অনেকের কথা মনে পড়লো আমার, কেউ সদ্য এম. এ. পাশ ক'রে চাকরি পেয়েছে, কেউ সরকারি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে—মনে হ'লো আমি বললেই তারা রাজি হবে, কী-ভাবে কথাটা উত্থাপন করবো তাও মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে ঝলসে গেলো—মনে হ'লো এর চেয়ে সহজ আর কিছুই নয়, এতদিন কথাটা কেন মনে হয়নি তা ভেবে নিজেকে ধিক্কার দিলাম।

বেশ সবিস্তারে আরো কিছু বলার জন্য তৈরি হচ্ছি এমন সময় তাপসী ধীরে-ধীরে বললে, 'মনে হচ্ছে একজন আধুনিক-ভাবাপন্ন যুবক তোমার সাহায্য ছাড়াই বেশ অগ্রসর হয়েছে?'

আমি চমকে উঠলাম কথা শুনে। অজান্তে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—'তাপসী! তুমিও বুঝেছো সন্তোষ এ-বাড়িতে আসে কেন?'

'সেটা বোঝা খুব শক্ত ব্যাপার নাকি?'

'আজ তার সঙ্গে মিলিদের বাড়ি থেকে ফিরলে তুমি?'

'হ্যাঁ—পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলো।'

'ভালো করোনি—ওর সঙ্গে আসা তোমার উচিত হয়নি। কী বললো তোমাকে পথে আসতে-আসতে? আগে কোনোদিন কিছু বলেছে কি? বলো—সব বলো আমাকে। ভাগ্যিশ—ভাগ্যিশ তোমাকে আজ কাছে পেলাম—তাই তো জানলাম সব—আমি যে কত কিছু এখনো জানি না তা-ই ভেবে অবাক লাগছে আমার।'

'আমার কিন্তু মনে হয় যে আমি যা জেনেছি সবই তোমার জানা কথা।'

'তাহ'লে তোমাকেও বলেছে! এত আস্পর্ধা মনোতোষের!'

'এর মধ্যে আস্পর্ধা কী দেখলে? সে যা বলতে চায় তাতে অশোভন বা অভদ্র কিছু নেই তো। তুমিই ওর ব্যবহারের প্রশংসা করো, আবার এইটুকু পথ ওর সঙ্গে এসেছি ব'লে রেগে যাচ্ছো। কেন বলো তো? আর কথাটা যখন উঠলোই তখন বলি—নিজেকে আমার অভিভাবকের পদে কবে থেকে তুমি প্রতিষ্ঠিত করলে? "এটা ভালো করোনি," "অমুক কাজ করতে পারবে না," "আমি চাই না অমুককে তুমি বিয়ে করো—" আমাকে এ-রকম ক'রে কথা বলার মতো অধিকার তোমার আসে কোত্থেকে? যদি জানতে চাও তাহ'লে বলি যে আমার অভিভাবকের অভাব নেই, আমার উপর যথাযোগ্য দৃষ্টি রেখেছেন তাঁরা, আমার ভালোর জন্য অনবরত চেষ্টাও করছেন।—আর ঐ মনোতোষ, যতবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে একেবারে আদর্শ ভদ্র ব্যবহার করেছে, তার বড়ো দুঃখ যে আমি তার কাছে হাত দেখাতে রাজি হইনি—আজও আবার বলছিলো—কিন্তু তুমি যদি ও-রকম মাথার চুল টানতে-টানতে সারা ঘরে পাইচারি করো তাহ'লে আমি কথা বলি কেমন ক'রে? আর ঐ জুতো দুটো ছেড়ে ফেললে কি খুব কষ্ট হবে তোমার—মেঝেটা নোংরা ক'রে লাভ আছে কিছু?'

আমি বুঝিনি কখন চেয়ার ছেড়ে পাইচারি শুরু করেছিলাম—এমন অস্থির লাগছিলো আমার, অসহায়, যেন বিরাট কোনো অজানা শহরে পথ হারিয়েছি, যেন সর্বহারা হ'তে আর আমার দেরি নেই। তাপসীকে ও-রকম ক'রে কথা বলতে আর কখনো শুনিনি, ও-রকম কথা সে বলতে

পারে তাও আমি [illegible] না। তার মুখের দিকে না-তাকিয়ে কথাগুলো শুনে যাচ্ছি, কষ্ট পাচ্ছি প্রত্যেকটি কথায়—কিন্তু সে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, আমাকে জেনে-শুনে আঘাত দেবার জন্যই বলছে ও-সব, এ-কথা ভাবতে অদ্ভুত একটা সুখও পাচ্ছি মনের তলায়, যেন প্রায় বিজয়ী হবার গৌরব—এই রকম নানা বিপরীত ভাবের সমন্বয়ে একটা তোলপাড় চলছে আমার মনের মধ্যে। তার কথা শেষ হওয়ামাত্র আমি সোজা হ'য়ে তার সামনে দাঁড়ালাম।

'শোনো তাপসী, তোমার প্রত্যেকটি কথার আমি উত্তর দেবো। তোমার অভিভাবক হবার একফোঁটা ইচ্ছে নেই আমার—কারোরই "অভিভাবক" আমি হ'তে চাই না : আমি যা বলি তা নেহাৎই অনুভূতি থেকে। অনুভূতি : বোঝো তুমি কথাটা ? তুমি জিগেস করলে তোমাকে ও-রকম শাসনের সুরে কথা বলার কী-অধিকার আছে আমার ? কিন্তু এই এক্ষুনি তুমি যখন আমাকে বললে, "তোমার বিয়েতে আর দেরি কোরো না"—তখন আমি "অধিকারে"র কোনো কথা তুলিনি। "অধিকার"—ওটা আইনের ভাষা, জোচ্চোরির ভাষা, মিথ্যার ভাষা—তোমার মুখে ওটা শুনতে আমি আশা করিনি তা তোমাকে খুলেই বলছি। যেমন সহজে তুমি আমাকে বলেছিলে, "কালই তুমি মিলিকে বিয়ে করো," তেমনি সহজে আমি বলছি : "অমুকের সঙ্গে কিছুতেই তোমার বিয়ে হ'তে পারে না।" আসল কথাটা কী জানো—যতদিন তোমার বিয়ে না হয় ততদিন আমার পক্ষে বিয়ে করা অসম্ভব।'

'অসম্ভব !' ঠোঁটে হাত-চাপা দিয়ে অস্ফুট গলায় তাপসী ব'লে উঠলো, 'অসম্ভব কেন ?'

'তা জানি না। কিন্তু এই আমার শর্ত।' আমি ঝুঁকে পড়লাম তার দিকে, সে একটু পিছনে স'রে গেলো।

'তোমার চুল বড্ড বড়ো হয়েছে, নীলু—কেমন বুনোমতো দেখাচ্ছে। আর কারো কাছে না করো, মাঝে-মাঝে নাপিতের কাছে ঐ মূল্যবান মাথাটি নিচু করলে কী হয় ?···কী দেখছো অমন ক'রে তাকিয়ে ? বোসো।'

আমি একই ভাবে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বুঝেছো, এই আমার শর্ত !'

‘বেশি কঠিন শর্ত নয়, হয়তো আষাঢ় মাসেই তা পূরণ হ’য়ে যাবে।’

হঠাৎ আমি বললাম, ‘মনোতোষ বুঝি আবার ধন্না দিয়েছে তোমার হাত দেখার জন্য? রাজি হয়েছো?’

‘ঠিক ধন্না দেয়নি—অত্যন্ত সবিনয়ে বলেছে যে আমার হাতের রেখাগুলোর বিষয়ে তার কৌতূহল গভীর, তা নিরসনের সুযোগ পেলে নিজেকে সে ধন্য মনে করবে।’

‘আর তুমি কী বলেছো?’

‘কী আবার বলবো। যার-তার হাতে কি হাত তুলে দেয়া যায়।’

কথাটা শোনামাত্র এক বিরাট ভার আমার মন থেকে নেমে গেলো। কিন্তু নিজের কাছে তা স্বীকার না-ক’রে অন্ধভাবে বললাম, ‘এ তুমি কী বললে? হাত “তুলে দেবার” কথা ওঠে কিসে? যে-সব দেশে সকলেই সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে—’

‘সে-সব দেশে যদি কখনো যাই তখন দেখা যাবে, কিন্তু আমাদের দেশে হাত জিনিশটার অন্য মানে।’

‘সেই অর্থেও মনোতোষ রাজি,’ আমি আমার চোখ দিয়ে বিঁধলাম তাপসীকে।

চোখ সরিয়ে না-নিয়ে সে জবাব দিলে, ‘সে রাজি হ’লেই তো হ’লো না।’

‘তার মানে—তুমি রাজি নও?’ অশোভন উল্লাসে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। ‘তার মানে—তোমার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা ব’লে কিছু আছে?’

‘তা নেই!’ তাপসী যেন হাঁপিয়ে পড়লো ঐ ছোট্ট কথাটি উচ্চারণ করতে।

‘কিন্তু যদি পারিবারিকভাবেই মনোতোষের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হয়? মা আজ তার বিষয়ে খবর নিচ্ছিলেন, জানো?’

‘বেঁচে থাকুন নারানগঞ্জের উ[illegible]াই, তিনি যেন তার আগেই আমাকে উদ্ধার করেন।’

‘তুমি কি বলতে চাও ঐ উকিলটিও মনোতোষের চেয়ে ভালো?’

'কে কী-রকম জীবন চায় তারই উপর ভালো-মন্দ নির্ভর করে। আমি কারো পোষা পায়রা হবো না, আমি নিজের জায়গাটি উপার্জন ক'রে নেবো। জানো, ঐ উকিলটির কথা ভাবতে আমার ভালোই লাগে। দুটি ছেলেমেয়ে আছে, সুন্দর কাজ হবে আমার, প্রথম থেকেই তাদের ভালোবাসতে পারবো—হঠাৎ একেবারে ফাঁকা হ'য়ে যাবো না। ঐ বাড়িতে আমার যেটুকু মূল্য তা আমার নিজের জন্য হবে না—হবে, অন্যের সন্তানের মা হ'তে পেরেছি ব'লে, সংসারের হাল ধরতে পেরেছি ব'লে। সেই আচ্ছাদনে আমি নিজে বেশ লুকিয়ে থাকতে পারবো—তারপর আস্তে-আস্তে ঐ দুই এক হ'য়ে যাবে।'

আমি বিদ্রূপের সুরে ব'লে উঠলাম, 'তাহ'লে জীবন বলতে তুমি সবচেয়ে উঁচু যা বোঝো, তা এই ?'

'না, না, সবচেয়ে উঁচু হবে কেন, কিন্তু সবচেয়ে সম্ভব, সবচেয়ে সহনীয়। তুমি একটু আগে জিগেস করছিলে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে কিনা। তা আছে বইকি—তোমাকে দু-কথায় তা বুঝিয়েও দিতে পারি। আমি চাই এমন কারো সঙ্গে আমার বিয়ে হোক যাকে আমি কখনো চোখে দেখিনি। তিনি কেমন দেখতে, কী করেন, তাঁর বয়স কত—এ-সব আগে থেকে জানবার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই আমার; ও-সব বিষয়ে গুরুজনদের উপর নিঃসংশয়ে নির্ভর করতে রাজি আছি। অন্য প্রায় যে-কোনো রকমের চাইতে এই রকম বিয়ে ভালো মনে হয় আমার। নিজের তৃপ্তির কোনো কথাই যেখানে ওঠে না সেখানে কত শান্তি, ভেবে ছাখো।'

'তাপসী, তুমি আত্মত্যাগ করতে চলেছো—কিন্তু তার মতো মূর্খতা আর কিছু নেই!'

'আত্মত্যাগ তো নয়, বলতে পারো অজ্ঞাতবাস,' তাপসী আবছা ক'রে হাসলো। 'তোমার মতে আমি মূর্খ হ'তে পারি, কিন্তু এত বোকা আমি নই যে সবচেয়ে যা ভালো তা পেলাম না ব'লে পৃথিবীর সকলকে জিভের মনোভাবের খপ্পরে পড়বো।'

'জানি না তুমি কাকে বলো সবচেয়ে ভালো,' কিসের একটা উগ্র ঝোঁকে আমি বলতে লাগলাম, 'জানি না কেন মনোতোষকে তোমার এত অযোগ্য মনে হয়। আরো কিছুদিন মেলামেশা করলে হয়তো দেখবে যে স্বামীজনোচিত অনেকগুলো গুণই তার আছে: আছে সুবুদ্ধি, দায়িত্ববোধ, অধ্যবসায়, কর্তব্য-জ্ঞান; হয়তো দেখবে যে যাকে তুমি "সবচেয়ে ভালো" ভাবছো তা তোমার কল্পনামাত্র, যে, শেষ পর্যন্ত, একজন মফস্বলের অর্ধশিক্ষিত প্রৌঢ় উকিলের সঙ্গে ভদ্রবেশী দারিদ্র্যে জীবন কাটাবার চাইতে অনেক ভালো কলকাতার একজন সপ্রতিভ ও সচ্ছল অবস্থার যুবকের সঙ্গে—'

কিন্তু আমার কথা শেষ হ'তে পারলো না। বলতে-বলতে আমার মনে হচ্ছিলো, তাপসীর মুখে এক অদ্ভুত রূপান্তর ঘটছে; তা যেন একসঙ্গে লাল আর কালো হ'য়ে উঠছে, তার চোখ আরো, আরো বড়ো হ'য়ে খুলে যাচ্ছে আমার দিকে, তার নিশ্বাসের গরম হলকা আমাকে ঝলসে দিচ্ছে যেন—আর হঠাৎ, আমার কথার মধ্যিখানে, তার একটি বাহু ঝকঝকে খড়্গের মতো উঠে এলো শূন্যে, একটি হাত সবেগে এসে নামলো আমার গালের উপর। আমার সব কথা ম'রে গেলো জিহ্বার উপর, মুখের চামড়ায় অসংখ্য আলপিন ফুটলো, কানের মধ্যে [illegible] রক্তের গর্জন যেন শুনতে পেলাম।

আর পরমুহূর্তেই আমার মাথাটা টেনে নামিয়ে আনলো তার কাঁধের উপর। তীব্র চাপা গলায় বললে—'ইতর! ছোটোলোক! আমাকে মারতে চাও মারো, কিন্তু নিজেকে কি এমনি ক'রে অপমান করতে হয়! লজ্জা করে না তোমার?'

সেই মুহূর্তে এক পাগল আবেগ ঝড়ের মতো মুচড়ে দিলো আমাকে; আমি দুই হাতে তাকে টেনে নিলাম বুকের মধ্যে, চুমোয়-চুমোয় ছেয়ে দিলাম তার মুখ। প্রথমে সে এমন ভঙ্গি করলে যেন আমাকে বাধা দেবে, তারপর এলিয়ে দিলে নিজেকে, তার বিস্ফারিত দীপ্ত চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য বুজে এলো, তার দেহটি ভারি হ'য়ে উঠলো আমার বাহুর মধ্যে—কিন্তু তারপরেই এক ঝটকায় সোজা হ'য়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ন'ড়ে উঠলো।

কিন্তু ততক্ষণে আমি অবশ হ'য়ে মেঝেতে তার পায়ের কাছে প'ড়ে গিয়েছি।

'এ কী সর্বনাশ করলে তুমি!' আমার দিকে এই কথাটাকে ছুঁড়ে দিয়ে তাপসী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সে-রাত্রে সহজে আমার ঘুম এলো না। আমি যেন একটা মূর্ছার মধ্যে শুয়ে আছি; ঘুম নয়, জাগরণও নয়, ঘুম না-আসার কষ্টও নেই, একটা ভারি, সুগন্ধি ঘোর যেন লেগেছে আমার চারদিকে, মনে হচ্ছে এমনি শুয়ে-শুয়ে অনন্তকাল কাটিয়ে দিতে পারি। কখনো মনে হচ্ছে আমার দেহ এমন হালকা হ'য়ে গেছে যে আমি পাখা মেলে উড়ে যেতে পারি আকাশে; আবার কখনো যেন শরীরে-মনে জোয়ারের মতো ফুলে-ফুলে উঠছে সাহস, ক্ষমতা, উৎসাহ, কোনো-এক মুহূর্তের আশ্চর্য স্বচ্ছতায় আমি অনুভব করছি যে এই পৃথিবী এখন আমার, ইচ্ছে করলেই সারা জগৎ জয় করতে পারি, দেশে-দেশে যুদ্ধের ভয় আমার মুখের একটি কথায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে, ট্রটস্কিকে ফিরিয়ে নেবে রাশিয়া, জর্মানিকে আর যুদ্ধের 'ক্ষতিপূরণ' দিতে হবে না; ইংরেজরা ভালো-ভালো বাঙালি ছেলেদের বোকার মতো বন্দী ক'রে না-রেখে ভদ্রভাবে ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দেশে ফিরে যাবে। আমি যেন এক মারাত্মক নেশা করেছি যে-নেশা কখনো আর ছুটবে না; জ্বরের ঘোরে প্রলাপের মতো বিড়বিড় করছি আপন মনে, হঠাৎ 'তাপসী' নামটা নিজের গলায় কানে শুনতে পেয়ে চমকে উঠছি। আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ব'লে যে-যন্ত্রটি আছে তা কখনো এমন ক'রে জাহির করেনি নিজেকে: তার বর্বর আক্রমণে আমি এক স্পন্দনময় পদার্থে পরিণত হ'য়ে গিয়েছি; চোখের পাতা, আঙুলের ডগা, হাতের তেলো, এমনকি পায়ের পাতার মতো নির্বোধ অঙ্গ—সব যেন দপদপ ক'রে জ্বলছে, আমার মাথার চুলগুলি হঠাৎ একটা মশালের মতো জ্ব'লে উঠলেও আমি অবাক হতাম না। 'এখন ম'রে গেলেই তো হয়,' কথাটা আমার মগজের মধ্যে খেলে গেলো, 'মরবার পক্ষে এর চেয়ে ভালো সময় আর কখন পাবো!' কিন্তু না—বাঁচবার আদেশ হয়েছে আমার উপর, আজ থেকে এক নতুন জীবন আরম্ভ আমার, আজ থেকে যতদিন

বাঁচবো প্রতিটি দিন ঠিক এই রকমই হবে, কেননা সে আমার সঙ্গে থাকবে—সে! এখনো জ্বালা করছে আমার মুখ, তাপসী যেখানে চড় মেরেছিলো সেখানে আর হাত রাখিনি তার পরে—ঠিক অমনি থাক, কোনো-এক অজানা জন্ম নিচ্ছে সেই আঘাতটিকে ঘিরে-ঘিরে, তাকে আমি বিরক্ত করবো না। তার কোমল চুল আমার মুখের উপর, তার গ্রীবার গন্ধ আমার মুখের উপর—ত্থাখো, কেমন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছি আমি, আমার গা থেকে যেন তারা ফুটে-ফুটে বেরোচ্ছে। কাল—কি পরশু—এই তু-এক দিনের মধ্যেই আমি তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবো। রাত বারোটায় ভৈরবের ট্রেন ছাড়ে, সেই গাড়িতে। ঐ দিক দিয়ে আসামে যায়, চাটগাঁতে যায়—চাটগাঁ থেকে রেঙ্গুনের জাহাজ ধরবো। ঠিক বলেছে সে: বি. এ.-টা তো পাশ করেছি, একটা কেরানিগিরি নিশ্চয়ই জুটবে। রেঙ্গুনে গেলে জুটবেই—ওখানে বাঙালির চাকরি হয়নি এমন শুনিনি। তাকে ছাড়া অসম্ভব আমার বাঁচা। তাকে আমার চাই। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, অনবরত, অবিচ্ছিন্নভাবে চাই। সেই মুহূর্তে আমার সন্দেহ থাকলো না যে তাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না, সন্দেহ থাকলো না যে এর পরে আমার প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত তাকে নিয়েই কাটবে

এমনি ক'রে—জ্বরে কেঁপে, নেশায় গ'লে, পাগলামিতে ভেসে গিয়ে, আবোলতাবোল হাজার অনুভূতির ঘূর্ণিতে ঘুরে-ঘুরে—কত রাত অবধি কাটলো কে জানে। এক সময়ে মাতা-প্রকৃতি দয়া করলেন: ঘুমিয়ে পড়লাম। চোখ মেলে দেখি ঘর রোদ্দুরে ভেসে গেছে।

জেগে উঠে আমার প্রথম অনুভূতি হ'লো: খিদে পেয়েছে। কাল রাত্রে কিছুই খাইনি বোধহয়—কিন্তু রাত্রির কথা মনে পড়ামাত্র আমার মনে হ'লো না-খেয়ে আরো অনেকক্ষণ থাকতে পারি। তার পরেই মনে পড়লো ন-টার সময় মনোতোষ আসবে।

লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলাম, টেবিলে টাইমপীসে ন-টা বাজতে দশ। এত বেলা হয়েছে! আর এক মুহূর্ত দেরি করলাম না; কোনোরকমে হাত-মুখ

ধুয়ে গায়ে একটা জামা চাপিয়ে বেরিয়ে গেলাম মধুবাবুর মাঠে; তেঁতুলগাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালাম।

দু-মিনিট বাদেই মনোতোষকে আসতে দেখা গেলো।

একটু দূর থেকে সে বললে, 'নীলাঞ্জনবাবু, আপনি এখানে!'

সে কাছে এলে পর আমি জবাব দিলাম, 'আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'এখানে কেন?'

'এখানেই কথা বলার সুবিধে।'

চোখ বড়ো ক'রে আমার দিকে তাকালো মনোতোষ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমাকে একবার দেখে নিলো সে, তারপর সিল্কের ছাতাটি মুড়ে ছাতার বাঁটে ভর দিয়ে একটু কাৎ হ'য়ে দাঁড়ালো।

'এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলেন, মনে হচ্ছে? রাত্রে ভালো ঘুমোননি বুঝি?'

'ও-সব বাদ দিন। আসল কথায় আসুন।'

'বেশ, তা-ই আসছি,' মনোতোষের মসৃণ মুখে—যা সর্বদাই মৃদু হাসিতে ন্যস্ত হ'য়ে থাকে—ঠোঁটের কোণ দুটি ভারি হ'য়ে চেপে বসলো। 'অনুমান করছি ও-বাড়িতে নতুন যে-কথাটা উঠেছে আপনি তার খবর পেয়েছেন?'

'"ও-বাড়ি"? "নতুন কথা"?...একটু বুঝিয়ে বললে বাধিত হবো, মনোতোষবাবু।'

মনোতোষ ভুরু কুঁচকে বললে, 'কেন, মিলি আপনাকে কিছু বলেনি?'

মিলি!—আমি যেন বজ্রাহত হলাম ঐ নাম শুনে। আমার মনে পড়লো যে কাল সারারাত—সারারাত—মিলিকে আমার একবার মনে পড়েনি। সারারাত ধ'রে কত কিছু ভেবেছি—ঠিক ভাবিনি, মনের উপর দিয়ে কত কিছু ভেসে গেছে—কিন্তু একবারও মিলি আসেনি তার মধ্যে। কিন্তু আর-কেউ, আর-কিছু কি এসেছে? আমার মা, আমার পড়াশুনো, আমার জীবনের উচ্চাশা—কিছুই না! কিছুই না! কিন্তু অন্য সব যা-ই হোক—মিলি! কয়েক ঘণ্টা আগেকার মিলি—তার কান্না! আমার প্রতিশ্রুতি! পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম নাকি?

কালকের বৃষ্টির পরে ঝকঝকে রোদ উঠেছে, চিকচিক করছে তেঁতুল-গাছের পাতাগুলি, আর তা থেকে হীরের মতো বৃষ্টির ফোঁটা মাঝে-মাঝে ঝ'রে পড়ছে এখনো, বাংলার গ্রীষ্ম ঋতুর পাখিরা দূরে-কাছে ডেকে-ডেকে উঠছে। সুন্দর সকাল—এমন একটি সকাল যখন বেঁচে আছি ব'লেই কৃতজ্ঞ বোধ করতে হয়। কিন্তু আমার চোখে সব ধূসর, গাছপালা ঘাস বিবর্ণ, নীল আকাশ নিরাশায় পাণ্ডুর। আর আমার যে-হৃৎপিণ্ড কাল উন্মাদের মতো ধ্বকধ্বক করছিলো এখন তা স্তব্ধ, স্তব্ধ, এক হিম কঠিন করাল স্পর্শ তাকে নিঃসাড় ক'রে দিয়েছে।

মনোতোষ বললে, 'আপনার মুখ দেখেই সব বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি ও-রকম হতাশ হবেন না, হতাশার কোনো কারণ নেই।'

আমি মরা গলায় জবাব দিলাম, 'আপনার কী বক্তব্য, বলুন।'

'সংক্ষেপে বলছি, স্পষ্ট ক'রে বলছি, দয়া ক'রে শুনুন। নীলাঞ্জনবাবু, আপনি আমাকে পছন্দ করেন না জানি, কিন্তু আমি এখনো আপনার বন্ধুতাপ্রার্থী। শুধু প্রার্থী নই··· আমিও আপনার জন্য কিছু করতে না পারি তা নয়। এই সংকটে আমি হয়তো কিছু কাজে লাগতে পারি আপনার—কাজে লাগতেও চাই।'

'সংকট?···' আমার মনে হচ্ছিলো আমার কিছুই বলবার নেই, শুধু কলের মতো দু-একটা শব্দ আউড়ে যাচ্ছি।

'তা সংকট বইকি। ও-বাড়ির হাওয়া বেশ থমথমে হ'য়ে আছে ক-দিন ধ'রে—তার উপর কাল মিলি শুধু ভজুয়াকে ব'লে অসময়ে বৃষ্টি মাথায় ক'রে আপনার কাছে চ'লে গিয়েছিলো, এটাও খুব সুনজরে গ্যাখেননি ওঁরা, আপনার বাল্যবন্ধু মণ্টু তো একটা চ্যাচামেচিই বাধিয়ে দিচ্ছিলো—আমি যা ক'রে তাকে থামিয়েছি! রোগা মেয়ে—বেশি উত্তেজনা হ'লে আবার অসুখে না পড়ে—এদিকে মণ্টুর গোঁয়াতুমিও সত্যি অসহ্য—তাকে হাজার কথা ব'লে বোঝাবার চেষ্টা করছি আমি—অতএব দেখছেন আমি ভিতরে-ভিতরে আপনাকে সাহায্য ক'রেই চলেছি। গিরিজাবাবু আর তাঁর স্ত্রীর মধ্যে অনেক

নিয়ে পরামর্শ চলছে—কাল রাত্রে খাবার সময় ভদ্রমহিলার চোখও ফোলা-ফোলা দেখলাম—তাঁর হয়েছে দু-দিকেই জ্বালা, নিজের দুই সন্তানের মধ্যে বিরোধ বাধলে মা-র কী অবস্থা হয় ভেবে দেখুন। এ-সব ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে ব'সে থাকতে আমার আর ভালো লাগছে না, মশাই—আমি আজকের ট্রেনেই কলকাতা চ'লে যেতাম—কিন্তু নিজেম একটা ছোট্ট ব্যাপারে আটকে আছি। সেই ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হ'য়ে গেলেই আমি আর এক দণ্ড আপনাকে বিরক্ত করবো না।'

'শুনুন, মনোতোষবাবু,' অনেক চেষ্টা ক'রে কিছু বলার মতো সজীব আমি ক'রে তুললাম নিজেকে, 'আমার মনে হয় আপনার সাহায্যে আমার কোনো দরকার নেই, আর আমিও আপনার জন্য কিছুই করতে পারি না।'

'পারেন না—না, চান না?'

'দু-ই। ও-দুই একই আসলে।'

আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে মনোতোষ হঠাৎ বললে, 'আপনি কি মনে করেন আমার কোনো হৃদয় নেই?'

'সে-রকম কিছুই ভাবিনি তো আমি।' একটু থেমে, রূঢ়ভাবে বললাম, 'আপনার বিষয়ে চিন্তা না-ক'রেও আমার সময় কেটে যায়।'

'তা তো বটেই,' মনোতোষ হাসির মতো একটা মুখভঙ্গি করলে, 'তবু কী আশ্চর্য দেখুন, আমি মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাচ্ছি না, তবু আপনাকে জ্বালাতন করছি। সেদিন অনেক কথা বানিয়ে বলেছিলাম আপনাকে, ইচ্ছে ক'রে ভুল বলেছিলাম। ঐ গরিবের মেয়ে বিয়ে করার কথা—গরিবের মেয়ে বশে থাকবে—ভালো, বাধ্য বৌ হবে—ও-সব আমার স্রেফ চালিয়াতি—এক-এক সময়ে নিজেকে খারাপ ক'রে আঁকতে ইচ্ছে করে জানেন তো, বা মনের কথাটি খুলে বলতে মন চায় না। আসলে হয়েছে কী—আসলে আমার খুব ভালো লেগে গেছে তাপসীকে—একেই বোধহয় "প্রেমে পড়া" বলে।' কথা শেষ ক'রে মনোতোষ যেন চেষ্টা ক'রে একবার হেসে উঠলো।

আমি পাথরের মতো স্তব্ধ হ'য়ে থাকলাম।

'ভাববেন না এটা আমার একটা খেয়াল—কোনো ছুটির দিনের রংদার আমোদ। আমিও প্রথম-প্রথম তা-ই ব'লে বোঝাবার চেষ্টা করেছি নিজেকে—অমন কত হয়, কত মেয়ে ক্ষণিকের জন্য চোখে ধরে—ভুলে যেতেও দেরি হয় না। কিন্তু এই ভাবনাটা কিছুতেই ছেড়ে যাচ্ছে না আমাকে, বরং আরো জোরালো হ'য়ে উঠছে দিন-দিন। কলকাতায় অনেক মেয়ে দেখেছি—মিশতেও কম মিশিনি—কত ভালো সাজতে জানে তারা, কত যোগ্যতা তাদের—কিন্তু এ-রকম বিপাকে আর কখনো পড়িনি। নয়তো—আপনি বিরক্ত হচ্ছেন বুঝেও কি বার-বার আসি আপনার কাছে?'

'কিন্তু আপনি ভুল ঠিকানায় এসেছেন, মনোতোষবাবু। আমি তার অভিভাবক নই, সাংসারিক ব্যাপারে কোনোই হাত নেই আমার। কার কাছে কেমন ক'রে কথাটা তুলতে হবে, তা নিশ্চয়ই আমার আপনাকে ব'লে দিতে হবে না? সোজা তাকেই—তাপসীকেই—বলতে পারেন।'

'ভাবছি,' মনোতোষ গম্ভীর হ'লো, মুহূর্তের জন্য এমনকি বিষণ্ণ দেখালো তাকে, যেটা তার পক্ষে অস্বাভাবিক।

আমি কুটিলভাবে বললাম, 'স্বামী হবার প্রায় সব যোগ্যতাই আপনার আছে—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ, প্রতিপত্তি—পাত্র হিশেবে আপনি তো লোভনীয়। অত ভাববার কী আছে?'

'ও-সব তো আপনি বাইরের দিক থেকে বলছেন।'

'কেন, আপনার ভিতরটা কি ভালো নয়?'

'কিন্তু ভিতরটা তো দেখা যায় না, নীলাঞ্জনবাবু। আমি দেখতে-শুনতে "কলকাতার বাবু", স্মার্ট যুবক, ঢাকায় বেড়াতে এসেও বাবার ব্যবসার দালালি করছি—সেটাই চোখে পড়ে লোকেদের, আর তাইতে তাদের মন বিগড়ে যায়। আপনার মতো আধ-ময়লা কাপড়ে একমাথা উশকোখুশকো চুল নিয়ে আমি বেরোতেই পারবো না—আর তা করতে গেলেও মানাবে না আমাকে; কিন্তু অন্য সব বৃত্তিগুলো আমার নেই তা তো নয়।...এই আরকি কথাটা। আর শুধু এই কথাটুকু তাপসীর কাছে কোনোরকমে পৌঁছিয়ে দেয়া কি

আপনার পক্ষে সম্ভব হবে? শুধু এই কথা : মনোতোষের হৃদয় আছে, আর তার হৃদয়ের আদেশমতোই এই দিকে সে পা বাড়িয়েছে—আর-কোনো কারণে নয়। এইটুকু আপনি যদি তাকে বিশ্বাস করিয়ে দেন তাহ'লে বাকি কাজের ভার আমি নিজেই নিতে পারবো।'

— 'কিন্তু আমাকে কেন বিশ্বাস করাতে হবে? আপনার নিজের মধ্যে সত্য থাকলে তা জ্যোতির মতো ফেটে বেরোবে, মনোতোষবাবু, তা প্রমাণ করার জন্য উকিল লাগবে না।'

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমার কথা সত্য নয়?···কিন্তু আমি যে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি তা তো সত্য? কথাগুলো যে বলছি তা তো সত্য?। কেন দাঁড়িয়ে আছি? কেন বলছি? কোন স্বার্থের খাতিরে? জানেন, আমি বিয়ে ক'রে কলকাতায় বাড়ি আর মোটর-গাড়ি পর্যন্ত পেতে পারি, নয়তো এক ধাক্কায় ফাঁপিয়ে তুলতে পারি বাবার ব্যবসা—আমি যদি শুধু স্বার্থান্বেষী হতুম তাহ'লে কি তা-ই করতুম না? বলুন, বুঝিয়ে দিন আমাকে, ও-সব সুযোগ ছেড়ে দিচ্ছি কেন?'

হঠাৎ আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম।

মনোতোষের ফর্শা মুখ টুকটুকে লাল হ'য়ে উঠলো; তার চোখের কোণ থেকে ফুলকি ছুটে এলো যেন। গভীর নিশ্বাস নিয়ে বললে, 'এর মানে—আপনি মিলিকে ছেড়ে দিচ্ছেন?'

'সে-কথা ওঠে কিসে?'

'উঠবে না কেন? আমার মনের কি বদল হ'তে পারে না?'

হঠাৎ একটা মুক্তির উপায় দেখতে পেলাম চোখের সামনে, উল্লাসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার এক ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় অসাড় হ'য়ে গেলাম। মিলিকে এর হাতে তুলে দেবো? কিছুতেই না, কিছুতেই না। তার চেয়ে আমি ম'রে যাই সেও ভালো।

অবশ্য ঐ রোগা মেয়েকে বিয়ে করতে চাইনি আমি, এখনো চাই না—কিন্তু আপনার জন্যে তা-ই আমাকে করতে হবে, বলতে গেলে আপনিই

আমাকে বাধ্য করলেন তা-ই করতে। রোগা বৌ নিয়ে বড্ড যদি জ্বালাতন হয়, আমার সান্ত্বনাদাত্রীর অভাব হবে না, আর তাছাড়া—তেমন যদি অসহ্য হ'য়ে ওঠে—আমি কেমিস্ট্রি পড়েছি, এমন দাওয়াই বানিয়ে নিতে পারি যাতে বেচারার সব দুঃখের অবসান হবে।...ভাবছেন জাঁক করছি? ভাবছেন এটাও আমার চালিয়াতি? কিন্তু ওকে বিয়ে ক'রে—তারপর প্রতিদিন যন্ত্রণা দেবো, তিলে-তিলে দগ্ধ করবো ওকে—বলবো, "তুমি এখনো মনে-মনে নীলাঞ্জনকে ভালোবাসা, তুমি অসতী, একজনের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে প্রেম করার পর আর-একজনকে যে বিয়ে করতে পারে সে কেমন মেয়ে তা কে না বোঝে!"...বুঝেছেন, ঠিক তা-ই করবো আমি, হয়তো ওকে আত্মহত্যা করতে হবে আমার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য।...কিছু জবাব দেবার আছে আপনার?'

আমি তাকিয়ে দেখলাম, মনোতোষের মুখ হিংস্র হ'য়ে উঠেছে, রাগি বেড়ালের মতো ফুলে-ফুলে উঠছে তার শরীর, গালে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম আলপিনের মাথার মতো চিকচিক করছে। সেই মুহূর্তে সে যদি আমার টুঁটি চেপে ধরতো, যদি পকেট থেকে ছোরা বের ক'রে বসিয়ে দিতো আমার গলায়—আমি জানি আমি তাকে বাধা দিতাম না, আমার প্রাপ্য শাস্তি ব'লে নিঃশব্দে মেনে নিতাম। আমি এক পা এগিয়ে গেলাম তার দিকে, প্রায় নিজেকে স'পে দিলাম তার অসূয়ার কাছে, কিন্তু হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে হাতের ছাতাটা দ্রুত দোলাতে-দোলাতে সে চ'লে গেলো। ভারি, অবশ, একরাশি লজ্জা আর বিবেকের ভারে আনত হ'য়ে, আমি মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। কখন বাড়ি ফিরলাম জানি না।

* * *

বাড়ির পিছনকার পুকুরের ধারে বিকেলবেলা ব'সে ছিলাম। জায়গাটা বাড়ি থেকে চোখে পড়ে না, গাছপালার পর্দা পুকুরের দিক থেকেও আড়াল করেছে। একটা মরা গাছের গুঁড়ি বেঞ্চির কাজ করে, মিলি আর আমি অনেকদিন বসেছি এখানে, অনেক ঘণ্টা কাটিয়েছি। ব'সে-ব'সে দেখছি কাদায় মিশে আছে খড়কুটো ঝরা পাতা গাছের কঞ্চি, বুনো ঘাস লম্বা হ'য়ে

উঠেছে বর্ষায়, আর এই সব জঞ্জালের মধ্যে নিশ্চিন্তে ঘুরে-ঘুরে সংসার করছে লাল আর কালো পিঁপড়ের দঙ্গল। কী সুখী এই পিঁপড়েরা, কী অবাধ এই মাটির বুকে তাদের জীবন। আমি একবারের পায়ের চাপে অন্তত পঞ্চাশ-জনকে মেরে ফেলতে পারি, কিন্তু যতক্ষণ তারা বেঁচে আছে ততক্ষণ তাদের কোনো ভয় নেই, মৃত্যুরও অস্তিত্ব নেই তাদের কাছে।···আমিও কি সুখী ছিলাম না—কাল সকালেও, কয়েকদিন আগেও? কী হয়েছে এর মধ্যে? আমি কী করেছি? যদি কোনো অপরাধ ক'রে থাকি যেমন ক'রে পারি প্রায়শ্চিত্ত করবো তার, কিন্তু নিজেকে আমি বিশ্বাস করাতে পারছি না যে কোনো অপরাধ করেছি। আর সবচেয়ে ভয়ানক কথা সেটাই। আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলাম যে মানুষের তৈরি আইন জিনিশটা কী চমৎকার, তা মানুষকে ব'লে দেয় তার কী অপরাধ, জেলে গিয়ে বা জরিমানা দিয়ে তা 'শোধ ক'রে' দেবারও সুযোগ দেয় তাকে। কিন্তু মানুষ তো এমন অপরাধও করে যা কোনো আইনের মধ্যে পড়ে না—তার ব্যবস্থা কে ব'লে দেবে? সমাজ যতই শাসন করুক, ভগবান মানুষকে স্বাধীন ক'রে গড়েছেন—আর সেটাই সবচেয়ে ভয়ানক।

'নীলু!'

চোখ তুলে দেখি, তাপসী সামনে দাঁড়িয়ে। আমি নড়লাম না, কিছু বললাম না।

'একটি লোক দুটো চিঠি দিয়ে গেলো এইমাত্র। একটা তোমার।'

খাম খুলে দেখি, মণ্টু লিখেছে। ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে আমাকে জানিয়েছে যে তার বোনের সঙ্গে আমার বিয়ে হবার নয়, আমি যেন আর কল্পনাও না করি সে-কথা, এবং, তা মনে রেখে, তাদের বাড়িতে যাওয়া-আসা থেকে বিরত হই। যদি আমি তার কথা অগ্রাহ্য ক'রে মিলির সঙ্গে আবার দেখা করার চেষ্টা করি, তাহ'লে—কেমন ক'রে আমাকে থামাতে হয়, তারও ব্যবস্থা মণ্টুর হাতে আছে। 'আশা করি তুমি নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে ব্যাপারটাকে অত দূর গড়াতে দেবে না।'

তাপসীর দিকে তাকানোমাত্র সে তার চিঠিটা আমাকে দিয়ে আ[illegible] নিজের হাতে নিলে।

তাপসীকে লিখেছে মনোতোষ। কয়েক লাইনের পরিচ্ছন্ন চিঠি :

'শ্রীমতী তাপসী দত্ত

করকমলেষু—

আমি যে আপনাকে এই চিঠি লিখছি মণ্টু তা জানে না, কিন্তু মণ্টু নীলাঞ্জনবাবুকে কী লিখেছে তা আমি জানি। মণ্টু নির্বোধ; আমার কথা সে কিছুই জানে না—বরং নীলাঞ্জনবাবু জানেন। আমি আপনার পাণিপ্রার্থী। একেবারে বিবাহ ক'রে কলকাতায় ফিরতে চাই। আপনার সঙ্গে—না, আপনার অভিভাবকদের সঙ্গে একদিন দেখা করতে পারি কি? তাঁদের মত হ'লে আমার মা-বাবাকে লিখবো। কিন্তু প্রথম কথা : আপনার আনুকূল্য আছে কিনা। কিংবা, আপনি কোনোদিন আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন, এমন আশা করতে পারি কিনা। যদি আপনি একটুও আশা দেন, আমি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি। যদি আমার এমন সৌভাগ্য হয় যে আপনার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, তাহ'লে নিজের কথা সব বলতে পারি আপনাকে। আমাকে দেখে যা মনে হয় আমি ঠিক তা নই। নিজের বিষয়ে আমার কিছুই লুকোবার নেই—শুধু একটি কথা ছাড়া। আর সেই কথাটি শুধু আপনাকেই বলা যায়।

'এখন এই চিঠির কোনো-এক রকম উত্তরের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর-কিছুই করবার থাকবে না। ইতি

বিনীত

মনোতোষ মিত্র'

পড়া শেষ হ'তেই তাপসীর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হ'লো; দুটো চিঠিকে একত্র ক'রে সে কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেললে। কাগজের টুকরোগুলোকে হাওয়ায় ভেসে-ভেসে কাদায় মিশে যেতে দেখলাম আমি।

তারপর তাপসী বললো, 'আর দেরি না।'

'কিসের ?'

'তোমার বিয়ের। আমি কালই তোমার মা-কে নিয়ে ও-বাড়িতে যাবো ; এই আষাঢ় মাসেই হ'য়ে যাওয়া চাই।'

আমি বিহ্বলের মতো বললাম, 'বিয়ে !'

'নীলু, তুমি মিলিকে কত ভালোবাসো তা নিজে বোঝো না কেন ?'

'মিলি ?...তাকে কে না ভালোবাসে, বলো। তাকে চোখে দেখলে ভালো না-বাসা কি সম্ভব ?'

'কিন্তু চোখে না-দেখলেই তাকে স্বচ্ছন্দে ভুলে থাকা যায়—এই কি বলতে চাও তুমি ?'

আমি জবাব দিলাম না ; আমার মাথা নিচু হ'লো।

'ভুল তোমার, নীলু। চেষ্টা করো, যতদূর পারো চেষ্টা করো, তাহ'লেই আরো, আরো ভালোবাসতে পারবে।'

'চেষ্টা ক'রে ভালোবাসা !'

'নিশ্চয়ই! চেষ্টা ক'রে ক-খ শিখেছিলে, ইংরেজি, অঙ্ক, সংস্কৃত শিখেছিলে—এও তেমনি। ভালোবাসতেও শিখতে হয়। যে ভালোবাসে তারই মধ্যে থাকে ভালোবাসার কারণ, ভালোবাসার যে পাত্র তার মধ্যে তা থাকে না—থাকলেও তা আর কতটুকু! ভালোবাসাকে এত সহজ ভাবো কেন যে গাছ থেকে ফলের মতো তা মুঠোয় এসে পড়বে ?'

'কিন্তু...পড়েও তো মাঝে-মাঝে। তোমার সেই হিরণ্যকশিপুর গল্প মনে করো—স্ফটিকস্তম্ভ দীর্ণ ক'রে নৃসিংহমুরারি বেরিয়ে এসেছিলেন। তেমনি—আকাশ থেকে বজ্রের মতো কি নামে না ? ফাটিয়ে দেয় না বুকের পাঁজর ?... তাপসী, আর এখানে দাঁড়িয়ো না, আমি ম'রে গেছি, আমাকে মরতে দাও।'

'তোমাকে ফেলে এখন আমি যাবো না। শোনো : ভাবো তো, কত কষ্ট পাচ্ছো আজ সারাদিন! দিনের পর দিন এমনি কি তুমি কষ্ট পেতে চাও ? কেন এই কষ্ট ? ভালোবাসতে পারছো না ব'লে।'

আমার গলা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো : 'আমি ভালোবাসতে পারি না!'

'পারছো কোথায়? তাহ'লে কি অত কষ্ট পেতে? নীলু, ভালোবাসার মতো আনন্দ আর-কিছু নেই।'

তার গলার স্বরে আমার সারা দেহে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। আমার ইচ্ছে করলো মাটিতে লুটিয়ে তার পায়ে চুমু খাই। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম কতক্ষণ জানি না, তাপসী আস্তে আমার কাঁধ ছুঁয়ে আমাকে জাগিয়ে তুললো।

'তাহ'লে এই ঠিক?'

আমি অস্ফুটে উচ্চারণ করলাম, 'আর তুমি?'

'হ্যাঁ—সে-কথাও বলতে এসেছিলাম তোমাকে। মুরারিবাবু আমাকে না-দেখেই মনস্থির ক'রে ফেলেছেন—শনিবার তাঁর মা আসবেন আমাকে আশীর্বাদ করতে।'

আমার গলা চিরে আবার বেরোলো : 'আর তুমি?'

'আমি ভালোই থাকবো। আমার কিছু অভাব হবে না কখনো। না—বিদায় নেবো না তোমার কাছে। আরো দেখা হবে। আর—যদি এমন দিন আসে যখন আর দেখা হবে না—তখনও তোমাকে ভালোবাসবো।'

মুহূর্তের জন্য মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা নামলো। তারপর হঠাৎ আমার পিছনে একটা শব্দ শুনে আমি চমকে লাফিয়ে উঠলাম।

ঝোপের পিছনে একটা বুটি-বসানো আঁচল ঝলক দিলো। আমি ছুটে গিয়ে সেটা চেপে ধরলাম।

'মিলি!'

মিলির মুখ মৃতের মতো শাদা; আমাকে দেখে তার চোখের তারা দুটি নিস্পন্দ হ'য়ে গেলো।

'মিলি! মিলি!···শোনো!'

ডুবন্ত মানুষের মতো আমার মাথার চুল আঁকড়ে ধরলো মিলি, কিন্তু তার মুঠো খ'সে পড়লো চুল থেকে কাঁধে, শিথিল হ'য়ে ঝুলে পড়লো হাতটি, আমার গায়ের উপর শরীরের সমস্ত ভার সে ছেড়ে দিলে।

'অজ্ঞান হ'য়ে গেছে! ওকে ধরো, টেনে তোলো!' তাপসী ছুটে এসে দুই হাতে মিলিকে জড়িয়ে ধরলো।

'তপুদি! মা গো!' মিলির সেই আর্তস্বর এখনো আমি কানে শুনতে পাই।

দু-জনে ধরাধরি ক'রে তাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলাম। জলের ছিটে, পাখার হাওয়া দিতে-দিতে মিনিট দশেক পরে সে চোখ খুললো। একবার আমার দিকে, একবার তাপসীর দিকে তাকালো, তারপর চোখ বুজলো আবার। ঘণ্টাখানেক পরে যখন তাকে গাড়ি ক'রে বাড়ি নিয়ে গেলাম তখন তার রীতিমতো জ্বর। পরের দিন মুরারিবাবুকে খবর পাঠাতে হ'লো, উনি যেন অন্য পাত্রীর খোঁজ করেন। কিছুতেই তাপসীকে রাজি করানো গেলো না বিয়েতে।

সেই অসুখ থেকে মিলি আর উঠলো না। দিন দশেক পরে মনোতোষ আর মণ্টু একসঙ্গে ফিরে গেলো কলকাতায়। এক মাস পরে ডাক্তার বললেন, মিলিকে মারাত্মক অ্যানেমিয়ায় ধরেছে।

আরো কি বলতে হবে আমাকে? দীর্ঘ নয় মাস ধ'রে সেই কষ্ট, ভাষাহীন, ভাষার অতীত ; আর অপেক্ষা, অবসানের জন্য অপেক্ষা :—আজ এতদিন পরে, দূর দেশে, একলা এক শীতের ঘরে আবদ্ধ হ'য়েও, সেই স্মৃতিকে দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছি আমি। চাই না মনে আনতে তাপসীকেও—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, রোগীর পাশে, ঘরে, শিয়রে—মনে পড়ে না কখনো তাকে খেতে দেখেছি কিনা, ভাবতে পারি না কখন সে ঘুমিয়েছে। স্বার্থপর এই পৃথিবী : কীর্তি ছাড়া কিছুই মনে রাখে না ; মিকেলাঞ্জেলো কেমন ক'রে সিস্টিন চ্যাপেলের ছবি এঁকেছিলেন, নেপোলিয়ন জয়ী হয়েছিলেন অস্টারলিট্‌স্‌-এ, গ্যেটে মৃত্যুশয্যা থেকে উঠে 'ফাউস্টে'র শেষ অঙ্ক লিখেছিলেন—এ-সব কথা ধ্বনির পর প্রতিধ্বনি তুলছে অবিরাম ; কিন্তু যেখানে একই রকম ত্যাগ, ধৈর্য, ক্ষমতা নিঃশব্দে কোনো ভালোর জন্য নিঃসৃত হয়, তার কোনো

চিহ্ন রাখে না ইতিহাস, সময়ের সমুদ্র নিঃশব্দ হ'য়ে থাকে। আমি চোখে দেখেছিলাম—আমি জানি—কিন্তু এই জগতে কে শুনবে আমার কথা, কে বিশ্বাস করবে যে জ্ঞান, মেধা, শক্তি, সৌন্দর্য, শিল্পকলা—এ-সব পারে মানুষকে শুধু অতিমানব ক'রে তুলতে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছাকাছি আমাদের নিয়ে যেতে পারে শুধু এক ক্ষুদ্র, দুর্বল, ভাগ্যহীন আবেগ, আমাদের অক্ষম ভাষায় আমরা যার নাম দিয়েছি ভালো—অথবা ভালোবাসা? আর কেনই বা বিশ্বাস করবে আমার কথায়—যে-আমি অনবরত পুজো পাঠিয়ে দিচ্ছি বই, ছবি, রঙ্গমঞ্চের দিকে—জগতের কোন অজ্ঞাত কোণে কোন অখ্যাত তাপসী দত্ত বাস করছে তাকে তো খুঁজে-খুঁজে বেড়াচ্ছি না।

মাতৃগর্ভ থেকে মানব-শিশুর বেরিয়ে আসতে যতদিন লাগে, ঠিক ততদিনেই মিলির দেহের নিহিত মৃত্যু আবির্ভূত হ'লো। আমি এম. এ. পরীক্ষা না-দিয়ে মা-র শেষ কপর্দক কুড়িয়ে অক্সফোর্ডে চ'লে এলাম। জানলাম না, কবে তাপসী আমাদের বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেলো।

একটু আগে উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম: পর্দা তুলে দেখি, কুচকুচে কালো আর মস্ত আকাশে হাজার তারা দপদপ ক'রে জ্বলছে। আজ বরফ পড়ছে না, কুয়াশাও নেই; কিন্তু উত্তুরে হাওয়ায় গাছগুলো দুলছে দেখতে পাচ্ছি, আর সেই আন্দোলনের অনেক, অনেক ঊর্ধ্বে—শান্ত, স্থির, চিরন্তন, ঐ নক্ষত্রেরা! কিন্তু এ কী বলছি, এ তো ভুল কথা, আধুনিক বিজ্ঞান অন্য রকম শিখিয়েছে আমাদের: ঐ অগ্নিপিণ্ডগুলোর মধ্যে অবিরাম ভাঙা-গড়া চলছে, তাদেরও আছে জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, মৃত্যু, কোথাও স্থিরতা নেই, শান্তি নেই, ধ্রুব নেই। তবু—ঐ তারাদের দিকে তাকিয়ে আজ আমার বলতে ইচ্ছে করছে: সবই বুঝলাম—তবু একটা কথা শুধু জানতে চাই, ওদেরই কেন বলি হ'তে হ'লো, তরুণ, মধুর, নিরপরাধ মিলিকে, আর শুদ্ধ হৃদয়ের তাপসীকে, কেন বলি হ'তে হ'লো ওদের, আর আমি, নীলাঞ্জন দে, আমি কেন কৃতী পুরুষ হলাম, উন্নতির সোপান থেকে সোপানে আরোহণ ক'রে আজ কেন আমি পরের ব্যাপারে ফোঁপরদালালি করার জন্য মাসে-মাসে

হাজার ডলার মাইনে পাচ্ছি? যাকে মানবতা বলা হয় তার পক্ষে অনেক বেশি ভালো কি হ'তো না যদি আমাকে সরিয়ে দেয়া হ'তো জীবন থেকে, কি দিন কাটাতে হ'তো তিনশো টাকা মাইনেতে স্ত্রী আর বিধবা মা আর চারটি ছেলেমেয়ের প্রতিপালন ক'রে—আর জীবনের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হ'তো ঐ দু-জনকে, ঐ দুই সত্যনিষ্ঠ হৃদয়বত্তাকে? এ-সব ব্যাপারের কে ব্যবস্থাপক? কার কাছে জীবনের সব পরম আবেদন পৌঁছয়? কী হিশেবে সে-সব আবেদন তিনি মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করেন?···কিছুই জানি না, কোনো আসল প্রশ্নের কোথাও কোনো উত্তর নেই, শুধু ভেজাল নিয়েই আমাদের জীবন কেটে যায়।

আজ প্রথম নিজেকে আমার বুড়ো মনে হচ্ছে। ক্লান্ত হয়েছি, শরীর ভালো নেই। কাল যেতে হচ্ছে জেনেভায়, সেটা মস্ত বাঁচোয়া।

প্রায় এক নিশ্বাসে খাতাটা প'ড়ে উঠলেন নীলাঞ্জন। চোখ তুলে দেখলেন, ঘর প্রায় অন্ধকার। কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? কোথায় আছেন? কম আলোয় মিটিমিটি তাকিয়ে নিজের বর্তমানকে চিনে নিলেন, তারপর বেল ছুঁলেন।

তাঁর বেয়ারা-বাবুর্চি ঘরে এসে জানলাগুলির পরদা সরিয়ে দিলে। পড়ন্ত রোদ এলিয়ে গেলো মেঝেতে, ভেজা ঘাসের গন্ধ নিয়ে এলো বাতাস।

'টী, স্যর?'

ঈষৎ মাথা নেড়ে নীলাঞ্জন সিগারেট ধরালেন, তাঁর দেহের অভ্যন্তরকে সুখী ক'রে-ক'রে ফুশফুশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ধোঁয়া পৌঁছলো। আশ্চর্য, এতক্ষণ কি একটাও সিগারেট খাইনি? আর এই খাতাটা যে লিখেছিলো, সে কি আমি? আর যার কথা লেখা হয়েছে—ঐ নীলু ব'লে ছেলেটা—সেও আমি? আশ্চর্য।

বেয়ারা চা নিয়ে এলো।

'ক্যাগুন, আমি চ'লে যাচ্ছি।'

'স্যর?'

'আমি কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।'

সাহেবি কেতার ভারতীয় ভৃত্যেরা মনিবকে কোনো প্রশ্ন করে না, ক্যাগুন চা ঢেলে দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলো।

'মানে—একেবারেই চ'লে যাচ্ছি। খুব সম্ভব কালই ছাড়বো। তোমাকে এ-মাসের পুরো মাইনে দিয়ে যাবো, আরো এক মাসের আগাম। অসুবিধে হবে?'

'থ্যাঙ্কিউ, স্যর।' ক্যাগুনের মুখে কোনো রেখা পড়লো না; নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো। চা শেষ করতে একটু সময় নিলেন নীলাঞ্জন, সূর্যাস্তের

লালচে আলোয় দৃষ্টি ভাসিয়ে নিজেকে একটু এলিয়ে দিলেন সোফায়। কাল চ'লে যাবেন—মনে-মনে এটা স্থির করামাত্র এক মুক্তির স্বাদে ভ'রে গেছে তাঁর মন ; সুখী মনে হচ্ছে নিজেকে, ছোট্ট পাখির মতো হালকা—কী ভালো কোথাও কোনো ভার না-থাকা, বাঁধন না-থাকা, এক সমুদ্র পেরিয়ে এসে আবার বন্দর থেকে নোঙর তোলার চেষ্টাটুকুর আগে কী ভালো এই কয়েক মিনিটের অবসর, বিশ্রাম। পরশু পৌঁছবেন লণ্ডনে বা প্যারিসে, কিন্তু এখনো যাত্রার আয়োজন শুরু করেননি, অথচ এ-দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক চুকে গেছে : এই একটুখানি সময় যেন অপার্থিব, অলৌকিক, সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি বাংলাদেশকে ভালোবাসলেন।

চা শেষ ক'রে টেলিফোন করলেন নন্দিনীতে, ভাগ্যক্রমে উপাচার্যকে পাওয়া গেলো ; তিনি তখনও আপিশ থেকে বেরোননি। কথা হ'লো অনেকক্ষণ ধ'রে, ওদিক থেকে বিস্ময় ও বিক্ষোভ প্রকাশের পরে অনেক রকম যুক্তি দেয়া হ'লো, কিন্তু নীলাঞ্জন বারে-বারেই দুঃখ জানিয়ে ক্ষমা চাইলেন। উপায় নেই, তাঁকে যেতেই হবে।

তারপর অনেকগুলো এয়ার-লাইনের আপিশে টেলিফোন। একেবারে শেষ মুহূর্তে হ'লেও, শেষ পর্যন্ত জায়গা পাওয়া গেলো একটাতে, কাল সন্ধে সাড়ে-সাতটায় দমদম থেকে ছাড়বে, পরশু দুপুর-নাগাদ লণ্ডন—আর সেখানে একবার পৌঁছলে আর ভাবনা কী, উপ্‌সালার অনেক পথ খোলা আছে। বাড়িউলি এক বৃদ্ধা ইংরেজ বিধবা, ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিন মাসের ভাড়া চেয়ে বসলে, নীলাঞ্জন দ্বিরুক্তি করলেন না। আমার কী বা হবে টাকা দিয়ে—যদি কারো কাজে লাগে তো লাগুক।

কাছেই ডাকঘর ; কয়েক পা হেঁটে গিয়ে টেলিগ্রাম করলেন উপ্‌সালায়, আর লণ্ডনের এক বন্ধুকে। তখনকার মতো আর-কিছুই করবার থাকলো না। এতটা সময়—সারা সন্ধ্যা, সারা রাত্রি—কিছুই করবার নেই। কোনো বন্ধু নেই কলকাতায়, দু-চারজন সরকারি কেজো লোক ছাড়া কারো মুখ

পর্যন্ত চিনি না। কাজের সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলামাত্র কলকাতায় অবান্তর হ'য়ে গিয়েছি।

ওল্ড বালিগঞ্জ রোড রাস্তাটি নিরিবিলি, নীলাঞ্জন সিগারেট ধরিয়ে আস্তে-আস্তে পাইচারি শুরু করলেন। চ'লে যাবো সেখানে? নৈহাটি, নেতাজী-নগর; গাড়িতে দু-ঘণ্টা বড়ো জোর; বেশি রাত হবে না তখনও। কিন্তু খুঁজে পাবো কেমন ক'রে? সারি-সারি রেফিউজী-কলোনির ভিড়ের মধ্যে কোন বাড়িটা কে ব'লে দেবে? বাড়িতে আর কে থাকে—আরো কেউ থাকে নিশ্চয়ই—কারা? কিছুই জিগেস করিনি কেন তখন—কত কথা জানার ছিলো! এতগুলি বছর…এত সব বছর…কী হ'লো সেই বছরগুলির? কেমন ক'রে কেটে গেলো কিছুই যেন বোঝা গেলো না।…যাই না চ'লে, খুঁজে না পাই ফিরে আসবো, সময়টা তো কেটে যাবে।

আশ্চর্য, বিয়ে না-ক'রে সারা জীবন কাটিয়ে দিলে। কিন্তু করেনি তা কেমন ক'রে জানলাম? ঠিক, 'মিস' ছিলো অ্যাপ্লিকেশন-ফর্মে। না কি ভুল দেখেছি? না কি বিধবা? হয়তো স্বামী রুগ্ন, কি পূর্ববঙ্গ থেকে এসে আর কাজকর্ম জোটাতে পারেনি—সে-ই সংসার চালায়। ছেলেমেয়ে? থাকে তো ভালো, কিছু আছে তাহ'লে ওর জীবনে। কেমন দেখতে হয়েছে? ওর মুখের দিকে কি তাকিয়েছিলাম? শুধু চোখে দেখতে চাই একবার, চ'লে যাবার আগে শুধু দেখতে চাই একবার।…কিন্তু, ধরো, খুঁজে-খুঁজে এমন সময়ে পৌঁছলাম যখন বাড়ির লোকেরা শুতে যাচ্ছে। কী ভাববে সবাই?

কী মনে ক'রে ঐ খাতাটা লিখেছিলাম কে জানে। নিজের বিরুদ্ধে সারি-সারি সাক্ষী সাজাবার জন্য? নিজের অপরাধ স্বীকার করার জন্য? নিজের জীবনের ব্যর্থতা প্রমাণ করার জন্য? কিন্তু সবই নিজের কাছে। জগতের কাছে এর কোনো মানেই নেই। যদি আজ চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে বলি আমি নষ্ট মানুষ, তাহ'লেও কেউ কান দেবে না, আমাকে পাগল ভেবে মুখ টিপে হেসে চ'লে যাবে।…আর হঠাৎ তাপসী উঠে এলো,

যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো, আমাকে আবার সব কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য। ভাগ্যিশ উপ্‌সালায় আমার নিমন্ত্রণ ছিলো, ভাগ্যিশ আমার উপায় আছে চ'লে যাবার।

সময়ের ভার অসহ্য হ'য়ে উঠলো নীলাঞ্জনের। ট্যাক্সি নিয়ে চৌরঙ্গিতে এসে সেই ধরনের একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন, যেখানে নকল, দাগ-ধরা, মলিন ও বামন য়োরোপ য়োরোপকে লজ্জা দেয়, যেখানে টম কলিন্স বা ড্রাই মার্টিনি নিয়ে 'জীবন উপভোগ' করে চকচকে জামা-জুতো-পরা পাঞ্জাবি আর মারোয়াড়ি যৌবন, টাটকা বিলেতফেরৎ বাঙালি ছেলেরা, আর তাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য ভূতের মতো মুখোশ প'রে কাঁসার আওয়াজের সঙ্গে পা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে কতিপয় স্ত্রীজাতীয় জীব লম্ফঝম্প করে। আকাশের তলায় একটা অন্ধকার কোণে ব'সে-ব'সে দশটা রাত বাজিয়ে দিলেন, কিন্তু যে-মানুষ তার সারা জীবন নষ্ট করেছে ঘণ্টা দুয়েকে তার কী এসে যায়।

ফ্ল্যাটে ফিরে দেখলেন, রান্নাঘরের টুলে ব'সে ক্যাগুন ঝিমোচ্ছে। চাবি ঘোরাবার আওয়াজে চমকে, অন্ধ হাতে মাথায় টুপি চড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো সে, কোটের বোতাম বন্ধ ক'রে কাছে এসে জিগেস করলে, 'ডিনার, স্যর?'

মুহূর্তের জন্য একটা কালো মাথা আর গলার রেখা দেখতে পেলেন নীলাঞ্জন; একেবারে কাঁচা বয়স ক্যাগুনের, সে এত ছেলেমানুষ আগে বোঝেননি। গলাবন্ধ কোট আর কালো, গোল টুপিতে সে একেবারে অন্য মানুষ, কিংবা আর মানুষই নয়, একটি সংকেতমাত্র। রাজার পোশাক, সেনাপতির পোশাক, সন্ন্যাসীর আলখাল্লা, বিচারকের পরচুলা, কয়েদির ন্যাড়া মুণ্ড—সবই এক ব্যাপার, মানুষকে মানুষের বাইরে চালান ক'রে দেয়, হয় উপরে কিংবা নিচে, কিন্তু মানুষ আর থাকতে দেয় না। ভাবলে অবাক হ'তে হয়, সভ্যতার কত বড়ো একটি অংশ শুধু এই পোশাকের উপর নির্ভর ক'রেই টিকে আছে। পাজামা-পরা নেপোলিয়নকে কি কল্পনা করা যায় কখনো, না কি আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা বিবেকানন্দকে?

'আমি খেয়ে এসেছি, ক্যাগুন। তুমি যেতে পারো। শোনো, আমি

কাল সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে যাবো, তুমি সন্ধে সাড়ে-ছ'টার মধ্যে আমার মালপত্র নিয়ে দমদমে হাজির থাকবে।'

'অল রাইট, স্যর। গুড-নাইট, স্যর।'

দরজায় চাবি দিয়ে নীলাঞ্জন এলেন শোবার ঘরে। ছড়ানো কিছু জিনিশপত্র স্যুটকেসে তুললেন, পাসপোর্ট ইত্যাদি কাগজপত্রের সঙ্গে ব্রিফ-কেসে একটা বই নিতে ভুললেন না, বহুদিনের অভ্যেসের ফলে তৈরি হ'তে কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগলো না। তারপর বাথরুমে মুখ ধুতে গিয়ে উজ্জ্বল আলোর তলায় আয়নার সামনে থমকে দাঁড়ালেন।

এক কৃশ, ধূসর মুখ দেখতে পেলেন তিনি, মাথার চুল ফাঁকে-ফাঁকে রুপোলি, মুখের চামড়া বিবর্ণ, চোখে জ্যোতি নেই। নীলচে ডোরাকাটা পাজামা-পরা তাঁর চেহারাটা কেমন করুণ, কেমন অসহায় দেখালো। পোশাক, মুখোশ, আচ্ছাদন—তারই জোরে চ'লে-ফিরে বেড়াচ্ছি। পোশাকহীন ক্লাউন, পোশাকহীন জজ-সাহেব, পোশাকহীন ক্যাপ্তেন আর আমি—সব একই রকম অক্ষম ও করুণার পাত্র। মেক-আপহীন অভিনেতার মূল্য কী, কবিতাকে বাদ দিয়ে কবির অস্তিত্ব কোথায়? এই মুহূর্তে সুবেশ হ'য়ে একটি চেয়ারে বসলেই আমি আর অক্ষম থাকবো না, থাকবো না ক্লান্ত ও হতাশ্বাস, যে-পার্টটি শিখে নিয়েছি নিপুণভাবে তা আউড়ে যেতে পারবো, হ'য়ে উঠবো একজন কর্মিষ্ঠ ও আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন গুণীজন, তথ্যে নির্ভুল, বিতর্কে শত্রুপক্ষের কাছে ভয়াবহ, রিপোর্ট-লেখায় বিদ্যুৎগতির জন্য বহু সহকর্মীর শ্রদ্ধা- ও ঈর্ষাভাজন। হ্যাঁ—যা একেবারেই বিশ্বাস করি না তার সপক্ষেও অকাট্য যুক্তি আমি দিতে পারি, এতই চতুর আমি হয়েছি এখন।

কে যেন তাঁর মনের মধ্যে ব'লে উঠলো: 'নীলু, তুমি অবশেষে এই হ'লে!' অনেক, অনেকক্ষণ আয়নার মধ্যে তিনি তাকিয়ে থাকলেন, অন্য কিছু খুঁজে বেড়ালেন নিজের মুখে, সেই তাঁর অন্য মুখ, যা তিরিশ বছর ধ'রে কোনো-এক নেপথ্যে তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিলো। কিন্তু যা তিনি চোখে দেখলেন তা এক মৃতপ্রায় পাংশু মুখ ছাড়া আর-কিছুই নয়, যেন এক ভিখিরি, কোনো

মহানগরীর উৎসবমুখর রাজপথে দাঁড়িয়ে, বিনা ঈর্ষায়, বিনা আক্ষেপে, বিনা উদ্যমে, শীর্ণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। না—আর না—অন্ধকার হোক, আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো!

*　　　　*　　　　*

তিনটে বাজার মিনিট দশেক আগে নন্দিনীতে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে এসে বসলেন। সকাল থেকে অনেক ঘুরতে হ'লো : ব্যাঙ্ক, ইনকাম-ট্যাক্সের আপিশ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগ—সব শেষ ক'রে এরোপ্লেনের টিকিট যখন পাওয়া গেলো তখন বেলা একটা বেজে গেছে। এ-দেশে যার যা কাজ সে তা করতে চায় না, বা যথাসম্ভব দেরি ক'রে করে, কেউ কিছু জিগেস করলে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে, লোককে দাঁড় করিয়ে রেখে নিশ্চিন্তে গল্প করে টেবিলে-টেবিলে। ওর মধ্যে ঠেলে-ঠুলে চার ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলো ব্যাপার সমাধা করতে হ'লো। প্লেন-কোম্পানির মালের আপিশে গিয়ে গাড়িটা বুক্ ক'রে দিলেন (কিছুদিন ধ'রে সঙ্গে-সঙ্গেই রাখছেন এটাকে), তারপর ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলেন নন্দিনীর দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের হাতে পদত্যাগপত্রটি সমর্পণ ক'রে এইমাত্র নিরালা হ'তে পারলেন। ব'সেই মনে হ'লো—এসে ফিরে যায়নি তো, ভুলে যায়নি তো, আসবে তো আজ?

টেবিলে একটা ঘণ্টা ছিলো, সেটাতে দু-তিনবার আঘাত ক'রেও কোনো ফল হ'লো না, উঠে বেরিয়ে এলেন। দূরে একজন বেয়ারাকে দেখে, হাত নেড়ে ডাকলেন তাকে।

'আমার কাছে কেউ এসেছিলো?'

'না, স্যর।'

'কেউ এলে এ-ঘরে আসতে বোলো,' ব'লে নীলাঞ্জন আবার এসে বসলেন।

তাকে আসতেই হবে। আর মাত্র ঘণ্টা চারেক আছি এখানে—এই দেশে। কিন্তু আর-একবার তাকে না-দেখে, একবার তার সঙ্গে কথা না-ব'লে,

আমি যেতে পারি না। অথচ আমাকে যেতেই হবে। অতএব সে আসবে না তা হ'তেই পারে না।

তিনটে বাজলো, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কেটে গেলো। খাঁচায়-পোরা বাঘের মতো ছোট্ট ঘরে পাইচারি শুরু করলেন নীলাঞ্জন; একবার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় তাপসী ঢুকলো।

নীলাঞ্জন কিছু বললেন না; একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত ক'রে নিজে এসে বসলেন।

'আপনাকে জানাতে এলাম আমি অ্যাডমিশন পেয়েছি।'

'বোসো।'

'আসতে বোধহয় একটু দেরি হ'য়ে গেলো আমার, কিন্তু—'

'হ্যাঁ, দেরি তো হ'লোই। বোসো।'

চেয়ারের অর্ধেকেরও কম জায়গা দখল ক'রে তাপসী বসলো।— 'ক্লাশ কবে থেকে আরম্ভ হবে?'

'ক্লাশ? তোমাকে জানানো দরকার আমি চ'লে যাচ্ছি।'

'আজ্ঞে?'

তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক কড়া গলায় নীলাঞ্জন বললেন, 'আমি চ'লে যাচ্ছি। এখানে আর থাকছি না।'

'আপনি—চ'লে যাচ্ছেন?'

' "আপনি" বলছো কেন? আমাকে চিনতে পারছো না?'

তাপসী মাথা নিচু করলো। নীলাঞ্জন সূক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে দেখলেন: তার সিঁথিতে সিঁদুরের কোনো চিহ্ন নেই। মাথার চুল একটু পাৎলা, আগের চাইতে রোগা হয়েছে মনে হয়, নাকের দুই পাশে গাঢ় দুটি রেখা নেমেছে। পরনে সাধারণ একটি মিলের শাড়ি, শাদা জামা। এক হাতে সরু একটি সোনার রুলি আঁচলের তলায় অর্ধেক ঢাকা প'ড়ে আছে। কিন্তু মুখটি শেষ পর্যন্ত সেই তাপসীরই, লাবণ্যের স্বাক্ষর কখনো মুছে যায় না।

—ভাগ্যিশ নন্দিনীতে এসেছিলাম, কখনো রাস্তায় দেখলে তো চিনতে পারতাম না।

'তুমি বিয়ে করোনি?' বেখাপ্পা শোনালো কথাটা, প্রায় রূঢ়, হঠাৎ উচ্চারিত হ'য়ে ঘরের হাওয়ায় যেন ঝুলে রইলো একটুক্ষণ।

তাপসী অস্ফুটে জবাব দিলো, 'না।'

'কখনো করোনি?'

এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না তাপসী। একটু পরে বললে, 'আমি যাই তাহ'লে?'

'যাবে? কোথায় যাবে?' হঠাৎ যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠলেন নীলাঞ্জন। 'না, যেয়ো না। আমার কথা আছে। চলো, আমিও যাই তোমার সঙ্গে। কোথায় থাকো, কী-রকম আছো, দেখতে চাই। কেমন আছো, তাপসী? কী করলে তারপর? কবে ঢাকা থেকে চ'লে গেলে? কবে এলে এই—এই নৈহাটিতে? সব বলো আমাকে। তোমার সব কথা বলো!'

কেমন একটা ভীত দৃষ্টি ফুটে উঠলো তাপসীর চোখে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমাকে সাড়ে-তিনটের ট্রেনটা ধরতে হবে।'

'কেন?'

'আমার কাজ আছে ওদিকে—আমি যাই।'

'না—না—কাজ আবার কী—কিছু কাজ নেই—কী এমন জরুরি কাজ বলো তো?'

তাপসী মরীয়া হ'য়ে জবাব দিলে, 'ট্যুশনি আছে। সেটা সেরে বাড়ি ফিরবো।'

'না, ট্যুশনি আজ করতে হবে না—আর ট্রেনটাও ছেড়ে দাও। আমার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে—চলো!'

'সত্যি কি আপনি—যাবেন আমাদের ওখানে?'

'"তুমি", তাপসী—"তুমি"!' তাপসীকে প্রায় জোর ক'রে সামনে ঠেলে নীলাঞ্জন তাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলেন।

'জানো, আমি প্রায় কিছুই করিনি, বলার মতো কিছুই করিনি সারা জীবন,' ট্যাক্সি চলার সঙ্গে-সঙ্গে নীলাঞ্জনের কথাও শুরু হ'লো—কথার ধরন, গলার আওয়াজ থেকে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির মনে হ'তে পারতো যে বহুক্ষণ ধ'রে এই প্রসঙ্গেই আলোচনা চলছিলো। '—কিছুই করিনি। নানা দেশে ঘুরেছি, পাঁচমিশেলি খুচরো কাজ করেছি মাঝে-মাঝে, উপার্জন করেছি বিস্তর—য-ত্তো বাজে কাজের জন্য বিরাট টাকা দেয়, জানো, আজকাল—সে-সব উড়িয়ে দিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে আমাকে! নতুন পৃথিবী গড়া হবে, গড়া হচ্ছে শুনতে পাই: তার জন্য প্ল্যান, ড্রাফট, রিপোর্ট, রিসার্চ, মেমোরাণ্ডাম, কমিটি, সাব-কমিটি, স্পেশাল কমিটি, সেমিনার, কনফারেন্স, কংগ্রেস—সে যে কী এক রাজসূয় যজ্ঞ তা তুমি ভাবতেও পারবে না, তাপসী। আর ঐ যজ্ঞে কাঠবিড়ালির কাজটুকুও যে করবে—ভুল হ'লো, জানি, কাঠবিড়ালিটা সেতুবন্ধের, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না—বলছিলাম যে কাঠবিড়ালিটিরও বাজার-দর বেশ চড়া, আর আমি তো প্রায় সুগ্রীবের মাত্র দশ ধাপ নিচে পর্যন্ত পৌঁচেছি। আচ্ছা, বলো তো, ও-সব মস্ত-মস্ত আপিশ থেকে নাকি মানুষের ভালো করা যায়—মানুষ কি আলপিন না মোটরগাড়ি না নাইলন-শার্ট যে কারখানা থেকে লক্ষ-লক্ষ নতুন মডেল ঝকঝকে হ'য়ে বেরোবে! তা আমার জীবনটা তো ঐ সব গোলেমালেই সিকি-দুয়ানি হ'য়ে বেরিয়ে গেলো। ওরই মধ্যে দৈবাৎ দু-একটা ভালো মুহূর্ত এসেছে: প্রথম যখন নেপলস দেখেছিলাম, কি দাঁড়িয়েছিলাম ক্যালিফর্নিয়ায় প্যাসিফিকের তীরে—বিগ স্যুর-এ গিয়েছিলাম, জানো, আমেরিকার সেই একটা অংশ বন্য আছে এখনো—টেলিফোন পর্যন্ত নেই, অন্তত তখন ছিলো না—একেবারে প্যাসিফিক ঘেঁষে সারি-সারি পাহাড়ের উপর কাঠের বাড়ি, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা শস্তায় থাকেন—বিরাট রেড-উড গাছের অরণ্য চারদিকে, বনের মধ্যে পূর্ববাংলার খালের মতো নদী ব'য়ে চলেছে, আর সমুদ্রটা এক জায়গায় আধো-চাঁদের মতো বেঁকে গিয়ে গন্ধক-ভরা গরম জল উথলে তুলছে। সেখানে হঠাৎ এক বন্ধু

পেয়েছিলাম—অনেকটা তোমার মতো মানুষ, তাপসী—হাত ধ'রে যখন ঝাঁকুনি দেয় তার হৃদয় যেন ধ্বকধ্বক করে তার মধ্যে। দু-দিন ছিলাম তার কাছে, তার ছবির বিক্রি নেই, স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কষ্টে থাকে—কিন্তু আমাকে সে রাজার হালে রেখেছিলো, দু-দিন পরে চ'লে আসার সময় আমি যখন তার দুটো ছবি কিনতে চাইলাম সে আমাকে চারটে ছবি উপহার দিয়ে গালে চুমু খেয়ে বিদায় দিলে। শুধু এটুকুই, আর হয়তো দেখা হবে না তার সঙ্গে—কিন্তু এ কতখানি তা ভেবে ত্যাখো! আর হঠাৎ কোনো বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অচেনা কোনো কবির এক কবিতা—কী আশ্চর্য মনে হয় তখন, ভাগ্যিশ বেঁচে আছি, ভাগ্যিশ বেঁচে আছি—তাই তো এই কবিতাটিকে পেলাম। তাপসী, এত আছে এই জীবনে, ভগবান কৃপণ নন, এত দিয়েছেন তিনি! আর জানো—বন্-এ আমার পা ভেঙে গেলো একবার, দু-মাস থাকতে হ'লো হাসপাতালে—একটি নার্স—কী সুন্দর দেখতে, নীল চোখ, ভোরবেলার প্রথম রোদের মতো সোনালি চুল—সে আমার এমন ক'রে সেবা করেছিলো যা তুমি ছাড়া আর-কেউ পারতো না। নামটা মনে আছে আমার—উল্‌রিকে—ওদের রূপকথার নাম, সুন্দর না?—স্বামী যুদ্ধে মারা গিয়েছে—আমাকে এমন ভালোবেসেছিলো যে ওর চোখ দেখে বুঝেছিলাম আমাকে বিয়ে করতে চায়। মজা না?—আমাকেও কেউ বিয়ে করতে চায়, আর ও-রকম প্ল্যাটিনাম-ব্লণ্ড নর্ডিক এক রূপসী! আমি তাকে বলেছিলাম, "এত রূপ তোমার, উল্‌রিকে, তুমি কেন এই নার্সের কাজ করছো? যুবকরা কি বিয়ে করার জন্য ছেঁকে ধরে না তোমাকে?" "আমাদের দেশের অর্ধেক পুরুষ ম'রে গিয়েছে, বাকি অর্ধেক নৈতিক অর্থে ম'রে আছে—আমার প্রতিজ্ঞা, মনের মতো না-পেলে আর বিয়ে করবো না।" "নিশ্চয়ই তোমার দেশের পুরুষদের উপর অবিচার করছো তুমি?" "আর তুমিও কি বিয়ে না-ক'রে অবিচার করছো না—নিজের উপর আর অন্যদের উপর?" তার কথা শুনে আমি হেসেছিলাম—কিন্তু ভিতরে-ভিতরে খুব কষ্ট হয়েছিলো

তার জন্য। আমাকে এত ভালোবেসেছিলো—তার সেবা ভুলতে পারবো না কোনোদিন—সম্ভব হ'লে নিশ্চয়ই তাকে বিয়ে করতাম। কিন্তু আমার তো আর বিয়ে হবার নয়—তাহ'লে তো কত আগেই হ'য়ে যেতো।'

'বাঁ দিকে—বাঁ দিকে এবার,' নীলাঞ্জনের কথার মধ্যে ছোট্ট বাধা দিলো তাপসী।

'বাঁ দিকে—না? তুমি রাস্তা ব'লে দাও, আমি কিছু চিনি না। হ্যাঁ—এমনি দু-একটা ভালো জিনিশও পেয়ে গেছি জীবনে। এত ভালো পাবার মতো যোগ্যতা কিছু নেই আমার, কিন্তু ভাগ্য ব'লে কিছু-একটা তো আছেই। তা শোনো, তাই ব'লে ভেবো না যে একেবারে সাধু হ'য়ে জীবন কাটিয়েছি। এখানে-ওখানে মেয়েদের সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগ ঘ'টে গেছে, তারা আমাকে সাহায্য করেছে সময় কাটাতে, টাকা ওড়াতে—ভেবো না তারা খারাপ মেয়ে, কেউ-কেউ স্বামীপুত্র নিয়ে রীতিমতো ঘরকন্না করে—কিন্তু কী আর হবে, ও-রকম অস্থায়ী সম্বন্ধ ওরা কেউ-কেউ প্রায় নিয়ম ব'লেই মেনে নিয়েছে—ওতে যেন কারোরই কিছু এসে যায় না। খারাপ লাগছে তোমার এ-কথাগুলো? আমার উপর রাগ করলে এর জন্য? তাপসী!'

নীলাঞ্জন প্রথম যখন কথা বলতে আরম্ভ করেছিলো তাপসী তাকিয়ে ছিলো সামনের রাস্তাটার দিকে, কিন্তু খানিক পরে বাধ্য হয়েছিলো তার মুখের দিকে তাকাতে, তারপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো এতক্ষণ। সে দেখছিলো নীলাঞ্জনের মুখ ক্রমশ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে, ঝকঝক করছে চোখ; তার পাৎলা ঠোঁট দুটি ন'ড়ে-ন'ড়ে অনর্গল বের ক'রে দিচ্ছে কথাগুলিকে, স্রোতের মতো, ঝরনার মতো, যেন কী বলছে নিজেই জানে না—যেন এই বিদ্বান ও প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি হঠাৎ ছেলেমানুষ হ'য়ে গেছেন, প্রথম মা-কে ছেড়ে দেশভ্রমণে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফিরে-আসা কোনো বালক—কিংবা যেন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছেন। তাপসী শুনছিলো যতটুকু, দেখছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি; তাকিয়ে-তাকিয়ে তিরিশ বছর পরে আবার তার মনে হ'লো যে অত সুন্দর কোনো মুখ সে জীবনে আর ভাখেনি।

'নীলু!' আত্মবিস্মৃত হ'য়ে ডেকে উঠলো তাপসী।

ঐ ডাক শুনে রোমাঞ্চ হ'লো নীলাঞ্জনের। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'সব বাজে বকলাম এতক্ষণ ধ'রে। বলো—তোমার কথা বলো। শিগগির—আমার সময় নেই।'

'কী শুনতে চাও?'

'তুমি যা বলবে তা-ই শুনবো।'

'আমি ভাবছি ওরা তোমাকে দেখে কী-রকম অবাক হ'য়ে যাবে।'

'ওরা—কারা?'

'আমার মা। আমার বোন। আমার দুই ছেলেমেয়ে।'

'তোমার ছেলেমেয়ে!'

'আমার বাবার নাতি-নাৎনি তো। হ'লো কী জানো—পার্টিশনের আগেই বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁর মদের দোকানের বড়ো-বড়ো খদ্দের—চা-বাগানের দিশি-বিলিতি সাহেবদের সঙ্গে বন্ধুতা জ'মে উঠেছিলো তাঁর; মদ খাওয়ার প্রতিযোগিতায় সকলকে হারিয়ে দিতে লাগলেন—কখনো স্টীমার ভাড়া নিয়ে নদীতে, কখনো জঙ্গলের মধ্যে বাংলোয়, এমন সব পার্টি দিতে লাগলেন যা চা-বাগানের ইতিহাসেও অভূতপূর্ব। তখন তাঁর ঝমঝমে অবস্থা, কিন্তু সেটাই যেন অসহ্য হ'য়ে উঠলো তাঁর, নিজেকে দেউলে করার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগলেন। হ'তে-হ'তে এমন হ'লো যে সকাল থেকেই আরম্ভ করেন—দোকানের পিছন দিককার ঘরে বোতল খুলে ব'সে থাকেন, এদিকে কর্মচারীরা দুই হাতে চুরি করে—আবার রাত্রে একলা ঘরে ব'সে-ব'সে গেলেন ও-সব, আর মাঝে-মাঝে আমার মৃত মায়ের নাম নিয়ে বিড়বিড় ক'রে কী যে বলেন কেউ বুঝতে পারে না। আমাকেও নাকি ডাকতেন এক-এক সময়, কিন্তু আমার নাম ভুলে গিয়েছিলেন—"পুতুল, তোর মা-কে ধ'রে রাখ!" "পুতুল, তোর মা কোথায় রে?" এইরকম হঠাৎ চীৎকারে বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙে যায়। এক চা-বাগানের ক্লাব থেকে অনেক রাত্রে ফিরছিলেন একদিন—গাছে ধাক্কা লেগে গাড়ি উল্টে গেলো, পাঁচশো ফুট গভীর খাদে

পড়তে-পড়তে দৈবাৎ ছুটো পাথরের মধ্যে আটকে ছিলেন, তাই কোনোরকমে দেহ উদ্ধার হ'লো।'

'তারপর ?'

'তারপর আরকি। পার্টিশনের পরের বছর ওঁরা আমার কাছে চ'লে এলেন।'

'তোমার কাছে কেন ?'

'কিসের ভরসায় থাকবেন ওখানে ? বাবা তো কিছু রেখে যাননি, তিনি মারা যাবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দোকান-পাট দেনার দায়ে নিলেমে উঠলো, ছুই ছেলে তাদের বৌ আর ছেলেপুলে নিয়ে নিজেদেরটাই চালাতে পারে না তো বিধবা বোনকে খাওয়াবে কোথেকে ? ছুটি ছেলেমেয়েও আছে সেই বোনের। বোন আর বাচ্চা ছুটিকে বড়ো ভাই একদিন রাস্তায় বের ক'রে দিলে। এর পরেই মা—আমার বিমাতার কথা বলছি—আমাকে সব কথা লিখলেন, আমি ওঁদের লিখে দিলাম আমার কাছে চ'লে আসতে। শেষ ছু-চারখানা গয়না যা ছিলো তা-ই ভাঙিয়ে অতি কষ্টে এসে পৌঁছলেন।'

'আশ্চর্য !'

'আশ্চর্যের কী আছে এতে।'

'তোমাকে ওঁরা তো চিনতেনও না বোধহয় ?'

'তাতে কিছু এসে যায় না—আমাকেই তো মনে পড়লো ওঁদের। আমি অনেক আগেই পূর্ব-বাংলা ছেড়েছিলাম, যুদ্ধের মধ্যে চাকরি করতাম র‍্যাশন-আপিশে, কিছু জমিয়েওছিলাম সে-কয় বছরে, ওঁরা আসার পরে তা-ই দিয়ে নেতাজীনগরে একটা ঘর তুলেছি।'

'আর ছেলেরা ?'

'তারা পাকিস্তানেই থেকে গেছে। নিজের ভাবনার অন্ত নেই তাদের—চিঠিপত্র বড়ো-একটা লেখে না। সতীর ছেলেমেয়ে ছুটি—আমার বোনের নাম সতী—ভারি ভালো সে, তার মেয়েটি এই ষোলোয় পা দিলে, ওর বিয়ের কথা ভাবতে হচ্ছে। আমার মা-ও খুব ভালো। সতী ম্যাট্রিক পাশ করেছিলো—

ওকে প্রাইভেট আই. এ. দিতে বলেছি এবার, আমার কাছেই পড়ে, পরিষ্কার মাথা ওর, একবার যা শোনে তা ভোলে না। ওরা আসাতে একটা জীবন হয়েছে আমার। এবার বাঁয়ে যাবে—তারপর ডাইনে গিয়ে আবার বাঁয়ে—না, এটা না, পরেরটা।'

দু-দিকে ছোটো-ছোটো বাড়ি—দরমা, টিন, টালি, খোলা; কয়েকবার মোড় নেবার পর গাড়ি থামলো। কঞ্চির বেড়া, চাল টিনের, সামনের বেড়ায় লতা তুলে দেয়া হয়েছে, আঙিনায় কয়েকটা ফুলগাছ। বারান্দায় খান দুই বেতের চেয়ার পাতা আছে, তার একটাতে নীলাঞ্জনকে বসিয়ে তাপসী ভিতরে গেলো।

নীলাঞ্জন তাকিয়ে-তাকিয়ে চারদিকে দেখতে লাগলো। ফাঁকা জমিতে ফুটবল খেলছে ছেলেরা—মাঠ বলা যায় না, কেননা মানুষের পায়ে-পায়ে ঘাস উঠে গেছে—তাদের চ্যাঁচামেচির শব্দ একঝাঁক পাখির মতো মাঝে-মাঝে উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। মোটা-শাঁখা-পরা একটি মেয়ে টিউব-ওয়েল থেকে কলসি ভ'রে জল নিয়ে যাচ্ছে, অন্য এক বাড়ির বারান্দায় শোভা পাচ্ছে গণেশের ছবিওলা ক্যালেণ্ডার, এক বুড়োমতো ভদ্রলোক খালি গায়ে তক্তাপোশে ব'সে খবর-কাগজ পড়ছেন। বিকেল, রোদের রং গাঢ় হ'য়ে এলো। এতদিনের জীবনে সে যা-কিছু দেখেছে, এ তার কিছুরই মতো নয়। বাংলাদেশের গ্রাম একে বলা যায় না, আধুনিক কোনো শহরও এটা নয়। গ্রামের দূরত্ব, শহরের সুবিধে—দু-ই থেকে বঞ্চিত হ'য়ে পাড়াটা যেন অপ্রতিভ ও অব্যবস্থিত, অতিথিকে কোনো বলবার কথা খুঁজে পাচ্ছে না। আর তবু, এরও একটা আকর্ষণ আছে—অনেকগুলো মানুষ বাস করছে এখানে, কাজ করছে, ঝগড়া করছে, ভালোবাসছে, তার আকর্ষণ। আর এখানেই আছে তাপসী। নীলাঞ্জন যেন অচেতন-ভাবেই মনে-মনে এই ছবিটাকে এঁকে নিতে চাইলো, ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ির ফাঁকে-ফাঁকে যেদিকে চোখ যায় সরল বিস্ময়ে সেদিকেই চোখ মেলে দিলে।

'এই যে আমার দুই রত্ন—পার্থ আর প্রতিমা।'

তাপসীর দুই ছেলেমেয়ে, তার মা, তার বোন—সকলের সঙ্গেই আলাপ হ'লো। থান-পরা বিধবা মহিলা ঘোমটায় আধখানা মুখ ঢেকে চৌকাঠের ধারে ব'সে রইলেন, আর ছুটে-ছুটে নিঃশব্দে কাজ করলো তাপসী: জল এনে দিলো নীলাঞ্জনকে, পাশে তালপাখা রাখলো, রং-চটা টীপয়টাকে ফুল-তোলা কাপড়ে ঢেকে দিলে, একটা পায়ার তলায় গুঁজে দিলে ভাঁজ-করা পোস্টকার্ড, নয়তো টীপয়টা ন'ড়ে-ন'ড়ে ওঠে। সতীকে কিছুক্ষণ দেখা গেলো না, তার কারণ বোঝা গেলো যখন সে টীপয়টাতে এনে রাখলে এক থালা লুচি আর আলুর তরকারি, আর চা। খেতে-খেতে নীলাঞ্জন গল্প করলে পার্থ আর প্রতিমার সঙ্গে—খেতে বেশ লাগছিলো তার, হঠাৎ মনে পড়লো আজ দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি, কালোজিরের আলুর তরকারি চেয়েও নিলে আর-একটু। তারপর হঠাৎ বললে, 'বাড়িটা ঘুরে দেখি একটু?'

'দেখার আর কী আছে—'

'তবু—দেখি না!'

দেখবার কিছু ছিলো না, সত্যি। পাশাপাশি দুটো ঘরে গোটা চারেক তক্তাপোশের বিছানা, অতি শস্তা একটা টেবিল আর চেয়ার, টেবিলে কিছু বইখাতা আর একটি টাইমপীস, এক পাশে পুরোনো দুটো স্টীল-ট্রাঙ্ক, বেঁটে আলনায় অল্প কিছু জামা-কাপড়। পিছনের দিকে এক চিলতে রান্নাঘর, বেড়া-দেয়া স্নানের জায়গা, ছোট্ট উঠোনে কাপড় শুকোবার তার। সেই তারে ঝুলতে-থাকা একটা হলুদ রঙের শাড়ির দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো নীলাঞ্জন, হঠাৎ ঘরে ফিরে টেবিলের উপরকার একটা খাতার পাতা ওল্টালো—স্কুলের কোনো ছাত্রীর খাতা—তাপসী সবুজ কালিতে ভুল শুধরে দিয়েছে। কী মনে ক'রে খোলা খাতাটাকে চোখের খুব কাছে নিয়ে এলো, মুখের উপর আলগোছে ছোঁয়ালো একবার। তারপর বাইরে এসে একটু [illegible] করলে পার্থর সঙ্গে, হঠাৎ দেখলো ঘড়িতে প্রায়

সাড়ে-পাঁচটা। একটু পরে তাকে বিদায় দিতে সবাই ট্যাক্সির কাছে এসে দাঁড়ালো।

'চলি তাহ'লে, কেমন?' সন্ধ্যার মেঘের দিকে একবার তাকালো নীলাঞ্জন, একবার সকলের দিকে তাকালো।

হঠাৎ তাপসী বললে, 'মা, আমিও একটু যাই, এঁকে তুলে দিয়ে আসি দমদমে। আমার ফিরতে দেরি হ'লে ভেবো না।'

চলতি গাড়িতে নিঃশব্দে দু-জনে ব'সে রইলো; বড়ো রাস্তায় দ্রুত ছুটলো ট্যাক্সি, আস্তে-আস্তে মেঘের সোনা মিলিয়ে গিয়ে ধূসর হ'য়ে সন্ধ্যা নামলো। একটা অদ্ভুত কথা উঁকি দিলো নীলাঞ্জনের মনে। শুধু অদ্ভুত নয়, হাস্যকর, অবিশ্বাস্য, অপরূপ···কিন্তু তাও কি সম্ভব? কেন সম্ভব নয়, কোনো বাধা নেই তো কোথাও। কোনো সংসার ভেঙে দিতে হচ্ছে না, কোনো মা-কে ছিনিয়ে আনতে হচ্ছে না সন্তানের কাছ থেকে। বরং কোনো কাজে লাগতে পারি— এদের সকলের।···এই বয়সে? কিন্তু কে জানে আরো কুড়ি বছর বাঁচবো না? আরো কু-ড়ি বছর! এমনি ঘুরে-ঘুরে—লক্ষ্যহীন, অর্থহীন জীবন! লণ্ডন—উপ্‌সালা—প্যারিস—তারপর কোথায় কে জানে, হয়তো জাপান, হয়তো আবার আমেরিকা, হয়তো জাপানের পথে আবার এক অলীক কলকাতায় এক রাত্রি—এর চেয়ে কত, কত ভালো পার্থ আর প্রতিমার জীবন, যা এখন দিনে-দিনে হ'য়ে উঠছে, তাদের মা-র সুখ, দিদিমার বুড়ো বয়সের শান্তি— আর এদের সকলের মধ্য দিয়ে অন্য একজনকে পূর্ণ ক'রে তোলা, আর সেই একজনের হৃদয়ের মধ্যে আমার অবলুপ্তি—আমার সার্থকতা।···স্বীকার করো, তাহ'লে, সত্যি বুড়ো হয়েছো এতদিনে, ক্লান্ত হয়েছো, দেহে-মনে তেজ নেই আর, নিজের উপর নির্ভর করতে পারছো না—এখন চাও সহায়, সঙ্গ, আশ্রয়। চাও দায়িত্ব নিতে, নয়তো অন্য কেউ দায়ী হবে না তোমার জন্য; চাও কেউ দাবি করুক তোমাকে, নয়তো তোমার দাবি কোনোখানে পৌঁছবে না। চাও অন্ত কারো মধ্য দিয়ে নিজেকে অনুভব করতে। অন্য একজন মানুষ, একজন মানুষের সঙ্গ: যাকে সব

বলা যায়, কিংবা যার কাছে এলে কিছু বলবারও প্রয়োজন থাকে না। মনে-মনে চাচ্ছো এই ক্লিষ্ট, মলিন, দরিদ্র, অপরিচ্ছন্ন, বিশৃঙ্খল বাংলাদেশকে। এমন কাউকে, যে তোমাকে ছেলেবেলায় দেখেছিলো—তুমি যখন নেপথ্যে ছিলে, অপ্রস্তুত ছিলে, মেক-আপ নিতে আরম্ভও করোনি, যখন তোমার চামড়ার উপরে আর-এক স্তর রঙের প্রলেপ আঁটো হ'য়ে বসেনি—তখন যে দেখেছিলো তোমাকে।...এই পরাজয়—কী প্রচণ্ড লোভনীয়, কী অসহ্য হাস্যকর এই পরাজয়!

পরাজয়?...'যৌবনের স্পর্ধায় জীবনকে আমরা ঠিকমতো মূল্য না-দিয়ে চ'লে যাই, কিন্তু পরে কি সেই অনুপাতেই আরো বেশি মূল্য দিই না তাকে?' এমনি কোনো কথা, নীলাঞ্জনের ঝাপসা মনে পড়লো, সেই খাতাটায় লিখেছিলো সে। তা-ই কি সত্যি? তার পরীক্ষা এখনই হ'য়ে যেতে পারে। এই মুহূর্তে আমার পাশে ব'সে আছে—কোনো তর্ক নয়, তত্ত্ব নয়, মতবাদ নয়, নয় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান—আমার পাশে ব'সে আছে ভালোবাসা। আমি কি হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি না? মিলির প্রেত কি এখনো ক্ষমা করবে না আমাকে? অনেক, অনেক ত্যাগ করেছি ব'লে কি সব-কিছুই ত্যাগ করতে হবে? আর তাপসী—জীবনের কোনো-এক মুহূর্তে সবচেয়ে তীব্রভাবে সে যা চেয়েছিলো, যা পায়নি ব'লে সারা জীবন সে অন্য কিছু চাইতেই পারলো না—আজ যদি তার হাতের কাছে তা এসে থাকে, যদি অবশেষে একটা মির‍্যাকল ঘটেই, দু-দিক থেকে দুই বঞ্চনা ছুটে এসে হঠাৎ পূর্ণ হ'য়ে ওঠে পরস্পরের মধ্যে—তাহ'লে স্বর্গের দেবতারা কি ক্ষুব্ধ হবেন?

নীলাঞ্জনের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো। তার ভয় করলো, রীতিমতো ভয় করলো তাঁর, যে হঠাৎ এমন কিছু ক'রে ফেলবে বা ব'লে ফেলবে যার পরে আর ফিরে যাওয়ার উপায় থাকবে না। তাপসীর দিক থেকে আরো একটু দূরে স'রে বসলো।

তার সেই ভঙ্গি তাপসীর দৃষ্টি এড়ালো না। আড়চোখে তাকিয়ে বললে, 'তুমি কি কয়েকদিনের জন্যই এসেছিলে?'

তার গলার আওয়াজে স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো নীলাঞ্জনের। বাইরে অন্ধকার তখন ; ঠিক মাথার উপর দিয়ে একটা লাল-সবুজ আলো-জ্বলা প্লেন আকাশ কাঁপিয়ে উড়ে চ'লে গেলো।

'না, থাকবার কথা ছিলো কিছুদিন। নন্দিনীতে চাকরি নিয়েছিলাম।'

'হঠাৎ মত-বদল হ'লো ?'

'হ্যাঁ। ভেবে দেখলাম চ'লে যাওয়াই ভালো।'

'ভালো লাগলো না এখানে ?'

'ঠিক তা নয়, তবে—জানো, তাপসী, আমি তোমার কাছে ভালোবাসার অর্থ শিখলাম।'

ছোট্ট নিশ্বাস পড়লো তাপসীর। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এখন কোথায় যাচ্ছো ?'

'সুইডেনে।'

'সেখানেই থাকবে ?'

'না, না, থাকবো না—দিন তিনেকের একটা ব্যাপার আছে সেখানে।'

'তারপর ?'

'তারপর এখনো ভাবিনি।'

'আর বোধহয় এদিকে আসবে না ?'

'কী ক'রে বলি। তোমার মনে আছে—অনেকদিন আগে আমাকে বলেছিলে : ভালোবাসতে শিখতে হয়। কথাটার অর্থ তখন বুঝিনি।'

'নীলু, তুমি কি এখনো সব মনে ক'রে রেখেছো ?'

'এতদিন ভাবতুম, যা আমার মনে আছে তা বুঝি অন্য কিছু। কিন্তু এখন দেখছি, তা-ই সত্য। কিন্তু একটা কথা বলো : তোমাকে তো ভালোবাসতে শিখতে হয়নি। কেমন ক'রে পারো—এত ভ'লোবাসতে ?'

'নীলু, চুপ করো। আর কয়েকটা মিনিট—কথা ব'লে নষ্ট কোরো না এই সময়টুকু।'

'না-ব'লে পারছি না। আমি সব বুঝতে পারছি, দেখতে পাছি : কষ্ট

তুমি পেয়েছো, জেনেছো কাকে বলে নিঃসঙ্গতা, রাত্রে অন্ধকারে জেগে-জেগে কাটিয়েছো, এক-এক সময় কান্নাকেও হয়তো ঠেকাতে পারোনি। কিন্তু পরের দিন সকালে উঠে নিজের নির্দিষ্ট কাজটুকু শুরু ক'রে দিয়েছো, স্কুলে গিয়েছো, খাতা দেখেছো, শাড়ি কেচে শুকোতে দিয়েছো, কোনো চিঠির জবাব লিখতেও দেরি করোনি। মফস্বলের স্কুলে টীচারি ক'রে-ক'রে জীবন কাটানো—ভাবতে কী ভীষণ মনে হয়, কিন্তু তোমার পক্ষে এও সুন্দর। কোথায় পেয়েছিলে এই বিশ্বাস, এই প্রেম, আর আমি কেন—কিন্তু আমার কথা আর না। জানো তাপসী, তোমার পার্থকে আমার বার-বার মনে পড়ছে। লাজুক—অথচ কেমন সহজভাবে কথা বললে আমার সঙ্গে। কতবার কত দেশ ছেড়ে গিয়েছি, কিন্তু—তাপসী, তুমি কিছু বলছো না?'

তাপসী হঠাৎ কেঁপে উঠলো, নীলাঞ্জন তা লক্ষ ক'রে একটু স'রে এলো তার দিকে। 'শোনো তাপসী, একটু আগে আমার মনে হচ্ছিলো তোমার জন্য কিছু করি—খুব ইচ্ছে করছিলো—কিন্তু এখন দেখছি কিছুই আমার করবার নেই। সব পেরেছো তুমি—সব পারবে; তোমার প্রতিমার ভালো বিয়ে হ'য়ে যাবে, পার্থ যোগ্য হ'য়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, নানা দিকে থেকে নিজেকে সার্থক ক'রে তুলবে তুমি—তুলেছো। আমি তোমাকে দেখলাম যার কোনো দীনতা নেই, নিজেকে যে দুর্বল ব'লে ভাবে না, ভয় করে না নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে। হেসো না—আমি ভেবেছিলাম তোমার কাছে কিছু টাকা রেখে যাবো—প্রতিমার বিয়ের জন্য, কিন্তু আমার কাছে এ-দেশের টাকা আর বেশি নেই—কিন্তু—কিন্তু—যদি আমি কখনো কিছু পাঠাই—রাগ করবে না? আ, তাপসী—যদি সেই বছরগুলিকে ফিরে পাওয়া যেতো, যদি আমি অন্ধ না-হতাম, দাম্ভিক না-হতাম, ভীরু না-হতাম! প্রথম যখন বিলেত থেকে ফিরলাম, মা বলেছিলেন তোমার কথা, কিছুদিন পর আর বলেননি। আমার প্রতিজ্ঞা ছিলো শাস্তি দেবো নিজেকে, ভাবিনি তোমাকেও শাস্তি দিচ্ছি সেই সঙ্গে—এতদূর স্বার্থপর ছিলাম। কিন্তু না—আমি জানি তুমি রাজি হ'তে না কিছুতেই, আমি জানি

মিলিকে তুমি কত ভালোবাসতে। কিন্তু এখন—এত বছর পরে—প্রায় আর-এক জন্মে—এখন যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাইতাম, কী বলতে তুমি? যদি বলতাম—"সুইডেনে যাবো না, কোথাও যাবো না, তোমার কাছেই থাকবো, তোমার কাছে, তাপসী!"—তাহ'লে কি মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে থাকতে, এখন যেমন আছো, তেমনি? ভাবছো, অসম্ভব? কিন্তু ইচ্ছে করলেই প্লেনটা ছেড়ে দিতে পারি, ইচ্ছে করলেই কলকাতায় বাড়ি ভাড়া ক'রে তোমাদের সকলকে নিয়ে উঠতে পারি কাল। কী?—কিছু বলো!'

তাপসী মুখ ফেরালো নীলাঞ্জনের দিকে, কিন্তু চোখের জলে তার দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে এলো। নীলাঞ্জনের একটি হাতের উপর হাত রেখে আস্তে বললে, 'ঐ ছাখো, উঁচু আকাশে দমদমের আলো। আর দেখেছো, মাত্র শ্রাবণ মাস, অথচ এখনই শরৎকালের মতো কুয়াশা হয়েছে।'

দমদমে যখন পৌঁছলো, প্লেনের সময় প্রায় হ'য়ে গেছে। নামনেই ক্যাপ্তন অপেক্ষা করছিলো, মালপত্র বুঝিয়ে দিয়ে সে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো; পকেটে হাত দিয়ে যে-ক'টা ভারতীয় টাকা উঠলো নীলাঞ্জন তাকে দিয়ে দেয়ামাত্র আর-একবার সেলাম ক'রে সে বিদায় নিলে। লোকজন ছুটে এসে মাল ওজন করালো, এঁটে দিলো লেবেল, কাঁধে নিয়ে মিলিয়ে গেলো একটা গলির মধ্যে। কয়েক মিনিট পরে মাইক্রোফোনে আওয়াজ হ'লো: 'প্যাসেঞ্জার্স টু করাচি, কাইরো, এথেন্স, রোম, লণ্ডন, বাই ফ্লাইট-নাম্বার বি-টু-থ্রী-ফোর—'

যাত্রীরা কলের মতো লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলো, সবার পিছনে নীলাঞ্জন, তার পাশে তাপসী। একটু-একটু ক'রে এগিয়ে গেলো তারা, এখনো দু-মিনিট, এখনো এক মিনিট সময় আছে; অবশেষে সেই সীমা এলো যার পরে অন্যেরা আর যেতে পারে না।

হঠাৎ নীলাঞ্জন ব্যাগ খুলে একটা জিনিশ বের করলে। 'এটা—এটা

তুমি রাখো, তাপসী—এই খাতাটা। এর মধ্যে অনেকখানি আমি আছি—কিছু দিতে ইচ্ছে করলো তোমাকে—এটা দিয়ে যাই।' ব'লে, আর-কোনো দিকে না-তাকিয়ে, সোজা কাস্টমস-এর ঘরে ঢুকে গেলো।

বাইরে যেখানে লোহার বেড়া দেয়া আছে, তাপসী সেই বেড়ায় বুক চেপে দাঁড়িয়ে রইলো। মস্ত বড়ো ঝাপসা এক আকাশ, তার এক কোণে মেঘের মধ্যে সূর্যাস্তের শেষ নিঃসঙ্গ একটি রশ্মি ছোরার মতো বিঁধে আছে ; আর-একদিকে দুটি-একটি তারা, ঠাণ্ডা নীল আকস্মিক স্বচ্ছতার হ্রদে ভাসমান : আর মস্ত বড়ো ঝাপসা এক প্রান্তর, শূন্য, হৃদয়হীন, দিগন্তে আর বাতাসে বিদীর্ণ :—এই সবের মধ্যে, বড়ো-বড়ো দাঁতের মতো আলো জেলে, দৈত্যের মতো এরোপ্লেন অপেক্ষা করছে। মুহূর্তের জন্য তাপসীর মনে হ'লো সে অন্ধ হ'য়ে গেছে, কিছুই ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছে না ; সন্দেহ হ'লো নেতাজীনগরে তার বাড়িটা এখনো আছে কিনা, পার্থ, প্রতিমার সত্যি কি অস্তিত্ব আছে ?—কেন সে এসেছে এখানে, এটা কোন জায়গা, কোথায় ফিরে যাবে এখান থেকে—কোথায় যাবে, কোথায় যাচ্ছে ঐ লোকগুলো ? অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো বেরিয়ে এলো ওরা—কেউ একা, কেউ বা দু-তিন জন পাশাপাশি, কাঁধে ক্যামেরা, হাতে ওভারকোট, ব্যাগ, বর্ষাতি, একে-একে প্লেনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। মনে হ'লো কেউ একজন মুখ ফিরিয়ে তাকালো একবার, মনে হ'লো সিঁড়িতে হঠাৎ মুহূর্তের জন্য তাকে দেখতে পেলে। দরজা বন্ধ হ'লো প্লেনের, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে গর্জন ক'রে উঠলো দৈত্যটা। গর্জন আরো প্রবল হ'য়ে উঠলো মিনিটে-মিনিটে, হঠাৎ অত বড়ো শরীর নিয়ে ঝড়ের বেগে দৌড় দিলে মাটির উপর দিয়ে; তারপর যেন অট্টহাসিতে আকাশ ফাটিয়ে কোন শূন্যে মিলিয়ে গেলো। দূরে, আরো দূরে, সব মায়া কাটিয়ে, পৃথিবীর বাইরে। তারা হ'য়ে মিলিয়ে গেলো প্লেন ; এক পরিত্যক্ত, অন্তহীন শূন্যের মধ্যে স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো তাপসী। হঠাৎ ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামলো ; নিচু, নরম, গোল হ'য়ে মেঘের ডাক গড়িয়ে-গড়িয়ে হাওয়ার

মধ্যে মিলিয়ে গেলো। তাপসী জেগে উঠলো, দেখতে পেলো হাতে একটা খাতা ধ'রে আছে। কিন্তু না—আমার সারা জীবন ব্যর্থ হয়েছে—ব্যর্থ, ব্যর্থ—তোমার সাধ্য ছিলো না সেই অন্ধকারে উঁকি দাও।

আর সেই মুহূর্তে এরোপ্লেনে ব'সে নীলাঞ্জন মনে-মনে বললে, 'স্বপ্নের মতো কেটে গেলো সময়টা—কিছুই বুঝলাম না।' তারপর বললে, 'যথেষ্ট—এই আমার যথেষ্ট।'